

# ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ଶୀକ୍ଷଣୀ

ମୁନ୍ଦାମୀର ମାଧ୍ୟମ



ভৱণ কাহিনীর ঢঙে লেখা হলেও প্রচলিত অর্থে এটি  
নিছক কোন ভৱণ কাহিনী নয়। এই ভৱণের উদ্দেশ্য  
ছিল ১৯৭১ সালের ঘটনা ও তাৎপর্য সম্পর্কে  
পাকিস্তানী মনোভঙ্গীর অব্বেষণ, যা অত্যন্ত  
সুচারূপে উপস্থাপিত হয়েছে এই বইটিতে।

একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল  
বাঙালীর বিজয়ের গৌরবে কিন্তু এজন্য তাকে দিতে  
হয়েছে চরম মূল্য। হত্যা, নির্যাতন, ধৰ্ষণ, লুঠন,  
অগ্নিসংযোগ— হালাকু খানের কৃত্ত তালিকায় এমন  
কোন নির্যাতন নেই, যার মুখোয়াখি বাঙালীকে হতে  
হয়নি। আর এসব ঘটিয়েছিল পাকিস্তান নামক  
রাষ্ট্রের রাষ্ট্র্যন্ত্র তার নিজস্ব জনগণের ওপর এবং ঐ  
রাষ্ট্র্যন্ত্রের কুশীলবরা ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি  
হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে, কিন্তু পাকিস্তান নামক  
রাষ্ট্র্যন্ত্রের তৎকালীন নীতি নির্ধারকগণ কি  
মনোভঙ্গীর কারণে ইতিহাসের এই জগন্যতম  
অপরাধটি বাঙালীদের ওপর সংঘটিত করল,  
তাদেরই জবানীতে তা জানতে এবং পাকিস্তান  
দ্বিষ্ণুত করে জনযুদ্ধের তেতর দিয়ে বাংলাদেশ  
গড়ে ওঠার বাস্তবতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের  
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে পাকিস্তানের বর্তমান  
এলিটশ্রেণী, রাজনীতিক, আমলা, সাংবাদিক, শিক্ষক  
ও গবেষকরা কি দৃষ্টিভঙ্গ পোষণ করেন— অত্যন্ত  
নিবিড় ও অনুপুর্জ্জৰূপে তা জানার চেষ্টা থেকে এই  
বইটি রচিত হয়েছে।

উপস্থিত প্রশ্নাওরের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ  
এই বইটির ভিত্তি। এই বইটিতে বাংলাদেশ অর্থাৎ  
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার জন্য যাঁকে  
সবচেয়ে বেশী দায়ী করা হয় সেই জুলফিকার আলী  
ভুট্টোর কিছু ঘনিষ্ঠ সহচর, পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যায়  
সরাসরি জড়িত করিপয় জেনারেল ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ  
সহকর্মী প্রাক্তন সিভিল অফিসার, বুদ্ধিজীবী,  
গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র, রাজনৈতিক  
কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিকদের  
সাক্ষাৎকারকে অত্যন্ত মনোজ্ঞ অথচ বিশ্বস্তভাবে  
উপস্থাপন করেছেন লেখক। সাক্ষাৎকারদানকারীদের

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

টাকা ২২০.০০

মধ্যে আছেন ভুট্টোর রাজনৈতিক সহচর রফি রাজা, রাজা কাজেম, মুবাশ্বির হাসান, কামার উল ইসলাম, মেরাজ মোহাম্মদ, সামরিক কর্মকর্তা মে. জে. গুলাম উমর, লে. জে. আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান, মে. জে. রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী; রাজনীতিক ও রাজনৈতিক কর্মী বেনজীর ভুট্টো, এয়ার মার্শাল আসগর খান, গফুর আহমেদ, ইউসুফ মাস্তে খান, আজহার জামি, ওসমান বালুচ; প্রাক্তন আমলা ড. আফতাব আহমেদ, আলতাফ গওহর, ফারূক আহমেদ লেঘারি, হাসান জহির, রোয়েদাদ খান, সৈয়দ আলমদার রাজা; সাংবাদিক এম বি নকভী, খালেদ আহমেদ, আই এ রহমান; এলিট বুদ্ধিজীবী সুহায়েল লারি, তালাত নাজারিয়াত, তাহেরা মাজহার আলী, খালেদ মাহমুদ, আহমেদ সেলিম, আখতার হামিদ খান, ড. তারিক রহিম প্রমুখ।

বইটির সাফল্য এখানেই যে, লেখক যে বিষয়টিকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছেন অসংখ্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে সেটি আড়াল হয়নি, তিনিও বিচ্ছুত হননি নিজ দায়িত্ব থেকে। আর তাই পাঠকও এই বইটি পাঠ করে ১৯৭১ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানী মনোভঙ্গীকে হৃদয়ঙ্গম করতে ন্যূনতম দ্বিধায় পড়বেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও গবেষক মুনতাসীর মামুন, পিএইচ.ডি. (জ. ১৯৫১) লেখালেখির জগতে সুপরিচিত তাঁর বিশ্লেষণাত্মক অর্থাত প্রাঞ্জল রচনার জন্য। সমাজ-গবেষণার যথন যে বিষয়টি তিনি সম্পাদন করেছেন, তাই পেয়েছে পৃথক ও ব্যতিক্রমী মাত্রা। যে কোন নিরস বিষয় তাঁর লেখার জন্য হয়ে ওঠে বাঞ্ছময়। একক ও যৌথভাবে প্রবন্ধ-গবেষণা বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও আছে পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থ। সংবাদপত্রে সাহসী কলাম লেখক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সমধিক। লেখক বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন (১৯৯২)।

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড  
রেড ক্রিসেন্ট হাউস  
৬১ মতিঝিল বা/এ (৬ষ্ঠ তলা)  
পোস্ট বক্স ২৬১১  
ঢাকা ১০০০  
ফ্যাক্স: (৮৮ ০২) ৯৫৬ ৫৪৪৩  
E-mail: upl@btcl.net.bd, upl@bangla.net  
Website: www.uplbooks.com

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯  
তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯

স্বত্ত্ব © দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদ

প্রশান্ত কর্মকার

প্রচ্ছদে হস্তলিপি  
আনওয়ার ফারুক

ISBN 984 70220 1019 5

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল  
বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ: ইলোরা আর্ট পাবলিশিংটি, ৬৩৫, উত্তর শাহজাহানপুর,  
ঢাকা।

*Shei Shab Pakistani* by Muntassir Mamoon, published in August, 1999,  
by The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C.A.,  
Dhaka 1000, Bangladesh.



liberationwarbangladesh.org

উৎসর্গ

মহিউদ্দিন আহমেদ  
শ্রদ্ধাস্পদেষু

**মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট**  
**Liberation War eArchive Trust**  
**মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত**

## ভূমিকা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা বিশেষ করে নীতি নির্ধারকরা কী ভেবেছিলেন বা এখন কী ভাবছেন সেই সব দিন সম্পর্কে— তা জানার ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ তিনটি— পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত। বাংলাদেশ সম্পর্কে তো লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। শাহরিয়ার কবির বিস্তারিত লিখেছেন ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের মতামত সম্পর্কে, তাঁদের দেয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অবশ্য গ্রস্তাকারে তা এখনো প্রকাশিত হয় নি। বাকি পাকিস্তান। পাকিস্তানীদের নিয়েও যে লেখা হতে পারে তা আমাদের মনে হয় নি। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড বা ইউপিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কয়েকবার আলাপ করেছিলাম। তিনিও উৎসাহিত হয়ে উঠেন।

বাংলাদেশে অনেকে আছেন যাদের ধারণা, এ ধরনের উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী। ইতিহাস রচনার সময় এ ধরনের শক্রমিত্ব বিচার করে অগ্রসর হওয়া কঠিন। তা ছাড়া, আর কিছুদিন পর পাকিস্তানে, ১৯৭১ সালের কুশীলবন্দের কেউ থাকবে না। ১৯৭১ সালের ব্যাপারে পাকিস্তানের আগ্রহ থাকতে না পারে কিন্তু আমাদের কি নেই?

অভিজ্ঞতা হলো, পথে নামলে পথ চলা সহজ হয়ে যায়। আমাদের কাছে অর্থের সমস্যা ছিল প্রধান। এ ক্ষেত্রে খানিকটা সহায়তা করলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের কর্ণধার অধ্যাপক রেহমান সোবহান। বাকীটার দায়িত্ব নিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ। পাকিস্তানীদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন করাচীর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের প্রধান আমেনা সাঈদ। মনে হয়েছিল, সে সময়ের পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকরা রাজি হবেন না সাক্ষাৎকারে, কিন্তু দেখা গেল তাঁরা রাজি। হয়ত মৃত্যুর আগে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাঁরা কিছু বলে যেতে চান। এসব কিছুর প্রক্রিয়া চলেছে প্রায় একবছর। তারপর প্রস্তুতি গ্রহণ। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা পাকিস্তান যাই। ফিরে আসি মার্চের মাঝামাঝি।

পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে মহিউদ্দিন ভাইকে বলি, পাকিস্তান নিয়ে আমি একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখতে চাই যার উপজীব্য হবে, কি পাকিস্তানে দেখেছি তা নয় বরং মানুষের সাক্ষাৎকার। নামও ঠিক করে ফেলি— সেই সব পাকিস্তানী। প্রচলিত অর্থে ভ্রমণ কাহিনী বলতে যা বুঝি সেই সব পাকিস্তানী সে অর্থে ভ্রমণ বৃত্তান্ত নয়। বরং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের

উপাদান হিসেবেই হয়ত তা বিবেচিত হতে পারে। দৈনিক জনকর্ত্ত্বে ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে সেই সব পাকিস্তানী প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকরা অনগ্রহ দেখান নি এবং সে কারণেই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। এন্টে ব্যবহৃত আলোকচিত্রসমূহ আমার এবং মহিউদ্দিন ভাইয়ের তোলা।

পাকিস্তান ভ্রমণের সময় আমরা অনেকের কাছ থেকে সাহায্য সহায়তা পেয়েছি। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও মহিউদ্দিন আহমেদকে, যাঁদের কারণে আমি এই বিরল অভিজ্ঞতার সুযোগ পেলাম।

ইতিহাস বিভাগ  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  
১৯৯৯

মুনতাসীর মামুন

॥ এক ॥

‘আমার ফর্মটা...’ একটি হাত পেছন থেকে এগিয়ে এল মুখের সামনে, আঙুলে ধরা ইমিগ্রেশন ফর্ম। পেছন ফিরি। সুবেশী এক যুবা। পাকিস্তানী নাকি বাঙালী, ধক্কে পড়ে যাই। চেহারা, পোষাক দেখে আবার মনে হয় না যে নিরক্ষর। পাশে বসা মহিউদ্দিন ভাই বলেন, ‘অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইনি বাঙালী, থাকেন পাকিস্তানে, পাকিস্তানের নাগরিক। ছুটি কাটাতে এসেছিলেন বাংলাদেশে, এখন ফিরছেন পাকিস্তানে। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন, হয়ত তিনি বলবেন তার বাড়ি নোয়াখালির ফুলগাজিতে।’

আমি যুবকের পাসপোর্ট আর ফর্মটি নিই। হ্যাঁ, পাসপোর্টটি পাকিস্তানের। ফর্ম পূরণ করে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার বাড়ি কি ফুলগাজি?’

‘জী।’

‘থাকেন পাকিস্তান? কবে এসেছেন?’

‘জী, আমি আসছি এগার-বার বছর। তখন ধরেন গিয়া আমার বয়স এগার-বার। বাসায় চাকরি-বাকরি করছি। এখন ফলের রসের দোকান দিছি।’

‘কেমন চলে?’

‘জী, আপনাগোর দোয়ায় ভালোই, এই, মাসে খরচা বাদ দিয়া দশ-বার হাজার টাকা তো থাকেই।’

বিস্মিত হই। বাংলাদেশ হওয়ার আগে এবং পরে ভাগ্যাবেষণে অনেকে গেছে পাকিস্তান, বিশেষ করে করাচীতে। এখন তারা পাকিস্তানের নাগরিক। মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসে মূল পরিবারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে।

‘করাচী নামলেই দেখতে পারবেন’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

আমরা তিনজন- আমি ছাড়া, মহিউদ্দিন আহমদ ও আফসান চৌধুরী যাচ্ছি পাকিস্তান। আমরা যাচ্ছি বিশেষ একটা কাজে, যা আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে কঠিন মনে হতে পারে। কাজটি হলো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী, বিশেষ করে নীতিনির্ধারকরা কী ভেবেছিলেন বা এখন কী ভাবছেন, তা জানা। চিন্তাটা মাথায় ঘুরছিল বেশ কিছুদিন। মুক্তিযুদ্ধে পক্ষ তিনটি- পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত। নানান জনের কাছ থেকে বাংলাদেশের বিবরণ আমরা পাচ্ছি। শাহরিয়ার কবির সম্প্রতি বিস্তারিত লিখেছেন ভারতীয় পক্ষের কথা সেদেশের তৎকালীন

নীতিনির্ধারকদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। শুধু বাকি থাকে পাকিস্তান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে এদের চিন্তা-ভাবনা কী ছিল তা নিয়ে লেখার ব্যাপারটি তেমন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা হয়নি। এর কয়েকটি কারণ আছে— পাকিস্তান ছিল শক্রপক্ষ, এখনও যে সে মিত্রপক্ষ তা অনেকেই স্বীকার করবেন না। তার উপর পাকিস্তান যাওয়ার ভিসা পাওয়া যাবে কিনা এবং পাওয়া গেলেও কাঙ্ক্ষিত ঐ পাকিস্তানীদের দেখা পাওয়া যাবে কিনা, সে সম্পর্কে আছে নিশ্চিত হওয়ার সমস্য। দেখা পাওয়া গেলেও তাঁরা সবাই কথা বলবেন কিনা তাও চিন্তার বিষয়!

নিজেদের দিক থেকেও সমস্যা আছে। প্রধান হলো, আবেগজাত। অনেক বাঙালীই নিয়াজী বা ফরমান আলীর মুখোমুখি হয়ে ক্রোধাপ্তি পড়তে পারেন। আবার ওই কাজ নিয়ে অনেকের মধ্যে ভুল বুবাবুঝিরও অবকাশ আছে। অনেকে আছেন, যাঁদের ধারণা, এ ধরনের কার্যকলাপ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী। যদিও আমরা জানি যে, ইতিহাস রচনার সময় এ ধরনের শক্রমিত্র বিচার করে অগ্রসর হওয়া কঠিন। ব্যক্তিগতভাবে, আমার মনে হয়েছে তথ্যের খাতিরে হলেও, পাকিস্তানীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তাদের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দলিল দস্তাবেজ যোগাড় করা উচিত। যুদ্ধকালীন পাকিস্তানী নীতিনির্ধারকদের অনেকের বয়স এখন সন্তরের ওপর, আশির কাছাকাছি, অনেকে এখন পরলোকগত। আমরা এঁদের সম্পর্কে এত কম জানি যে বলবার নয়। তা ছাড়া এঁদের অনেকে এখন বইপত্র লিখছেন। ফরমান আলী ও নিয়াজীর গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা কতটুকু বলেছেন যা সত্য? তা ছাড়া তারা তো ফ্রন্টম্যান। যাঁরা তাঁদের চালিয়েছে, তাঁদের অনেকেই আজ মৃত। তৎকালীন পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর হোতা জেনারেল ইয়াহিয়া, পীরজাদা, ভুট্টো এখন বেঁচে নেই। টিক্কা খান এখন স্থবির। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কিছুদিন পর ১৯৭১ সালের কুশীলবদের কেউ আর বেঁচে থাকবেন না। ১৯৭১ সালের ব্যাপারে পাকিস্তানের আগ্রহ থাকতে না পারে, কিন্তু আমাদের তো যথেষ্ট আছে।

পাকিস্তানীরা কী চোখে দেখেছিল মুক্তিযুদ্ধ— এ নিয়ে একটি বই করলে কেমন হয়? প্রস্তাব রেখেছিলাম প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমদের কাছে। তিনি দিধা না করেই রাজি হলেন। বললেন, ‘পাকিস্তান থেকেও এ ধরনের বই ছাপা হওয়া উচিত। পাকিস্তানের নতুন জেনারেশনের জানা উচিত পাকিস্তান কী করেছিল ১৯৭১ সালে।’ তিনি তখন পাকিস্তানের প্রকাশনা সংস্থা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এ ধরনের প্রকল্পে অক্সফোর্ডও আগ্রহ প্রকাশ করল। বাজেট সীমিত। প্রস্তুতি নিতে নিতেও লেগে গেল ছয় মাস।

এরি মধ্যে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিয়া নওয়াজ শরীফ ঢাকায় এসে মন্তব্য করলেন, ১৯৭০ সালে নির্বাচনের রায় মেনে নেয়া উচিত ছিল। আমরা মন্তব্যটিকে নানা রকমভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু এটি বিবেচনায় আনা দরকার যে,

নওয়াজ শরীফই প্রথম রাজনীতিবিদ ক্ষমতায় থেকে যিনি এ ধরনের মন্তব্য করলেন এবং ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটিও একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপার। জাপান বা জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে ক্ষমা চেয়েছে চার দশক পর, তাও বাধ্য হয়ে। নওয়াজ শরীফের মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে পাকিস্তানে। ১৯৭১ আবার বহুদিন পর খবর হয়ে এসেছে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া। এখন অনেকে কথা বলতে আগ্রহী। ফলে বর্তমান পরিস্থিতি এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের অনুকূল বলেও মনে হয়েছে। আমরা জোর প্রস্তুতি নিলাম এবং তারপর এক সকালে বিমানে করে করাচী যাত্রা।

ত্রিশ বছর আগে আমি গিয়েছি করাচী, পাকিস্তান। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখাই ছিল উদ্দেশ্য। আর কোন কিছু সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করিনি। পাকিস্তানে আমরা বড় হয়েছি, আমাদের সামনে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যাকে আমরা বলতাম কায়েদে আজম। কিন্তু (আমরা তরুণরা, যাদের বয়স তখন ১৭ থেকে ২০-এর কোঠায়) আমরা যারা সেই ১৯৬৭-৬৮ সালে পাকিস্তান গিয়েছিলাম কলেজ থেকে, তাদের কাছে এটি ছিল বিদেশ যাত্রার মতই। তারপর আর আগ্রহ বোধ করিনি পাকিস্তান সম্পর্কে, স্বাধীনতার পর তো নয়ই।

আজ ত্রিশ বছর পর আবার যাচ্ছি পাকিস্তান- আক্ষরিক অর্থেই বিদেশ যাত্রা। কিন্তু অজস্র বাঙালীর পাকিস্তানে থেকে যাওয়া, মানবেতর কাজ করা, বাঙালী মহিলাদের পতিতালয়ে অবস্থান মনে যে ডিপ্রেশনের সৃষ্টি করে না, তা নয়। করে, কিন্তু ভুলে থাকার চেষ্টা করি।

করাচীর কাছাকাছি চলে এসেছি। ওপর থেকে মরুভূমি নজরে পড়ছে। আসলে ওপর থেকে দেখলে একটি শহরের ভৌগোলিক চরিত্র নির্ধারণ করা যায়। করাচীর চারদিকে মরুভূমি। এখন সেই মরুভূমিতেই শহর বাঢ়ছে। কোথাও কোথাও বাবলা গাছ লাগিয়ে মরুভূমি ঠেকাবার চেষ্টা চলছে। প্লেন নামল করাচী বিমান বন্দরে।

আগের থেকে স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে করাচী বিমান বন্দরের পরিধি। আগের সেই মূল বিল্ডিংটি হারিয়ে গেছে। প্রতিটি দেশে ইমিগ্রেশনের লোকেরা যেমন হয় এখানেও তেমন। তবে, যা ভেবেছিলাম, অনেক জেরাটেরা হবে, সন্দেহ কুটিল দৃষ্টিতে তাকাবে, তার কিছুই হলো না। যতটুকু জিজ্ঞেস করা দরকার ঠিক ততটুকুই জিজ্ঞেস করল ইমিগ্রেশন।

ভেতরের সব ঝামেলা মিটিয়ে বেরুতেই দেখি আমাদের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে একজন দাঁড়িয়ে। নিজেদের পরিচয় দিতে ছুটে এলেন এক সুবেশী, হাত বাড়িয়ে বললেন, ‘আমার নাম ফার্নান্ডেজ। হোটেল সারওয়ানের পক্ষ থেকে নিতে এসেছি আপনাদের। পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?’

স্বত্তি বোধ করি। অতি চেনা শহরেও এয়ারপোর্টে কেউ না থাকলে অনিচ্ছ্যতায় ভুগি যার কোন কারণ নেই। অচেনা জায়গায় তো টেনশন থাকেই। চেনা মুখ দেখলেই নিমিমে সব শ্রান্তি-ক্লান্তি টেনশন দূর হয়ে যায়। ফার্নান্ডেজকে দেখে তাই মনে হলো। ভদ্রলোক হাসিখুশি, কথা বলতে ভালবাসেন। আমাদের জন্য একটি মিনিবাস নিয়ে এসেছেন এয়ারপোর্টে, এয়ারকভিশনড। যাত্রী আমরা অবশ্য এই তিনজনই।

মহিউদ্দিন ভাই আর আফসান আগেও কয়েকবার এসেছেন করাচী, ১৯৭১-এর আগে বসবাসও করেছেন করাচীতে। করাচী তাঁরা চেনেন, এক ধরনের নষ্টালজিয়াও আছে তাঁদের এ শহরের প্রতি। তাঁরা আগের করাচী ও বর্তমান করাচীর বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ফার্নান্ডেজ আলাপে মানুষ, যোগ দিলেন আলোচনায়। জানলাম তিনি, গোয়ানীজ ক্রিশ্চান, তাঁর বাবা চলে এসেছিলেন করাচী, ভাগ্যাব্বেষণে। আর ফিরে যান নি। পাকিস্তান-ভারত রেয়ারেষি নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। ফার্নান্ডেজ বললেন, একবার গোয়া যাবেন বলে মুঘাই এয়ারপোর্টে নেমেছেন। সঙ্গে কিছু গোয়ানীজ খাবার। মুঘাইর ইমিগ্রেশন তাঁকে নাজেহাল করতে লাগল। তিনি খৃষ্টান, আত্মীয়-স্বজন আছে সব গোয়ায়—কোন অজুহাতই খাটল না। পরে ভারতীয় এক গোয়ানীজের অনুরোধে তাঁকে সেই খাবার নিতে দেয়া হয়। ভারতীয় যাত্রী দেখলে পাকিস্তানী ইমিগ্রেশনও একই ব্যবহার করবে সন্দেহ নেই।

সদরে হোটেল সারওয়ান। মাঝারি মাপের হোটেল, করাচীর প্রাণকেন্দ্র সদর, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। নিজের কুমে থিতু হয়ে হোটেলের ডাইনিং রুমেই খেতে গেলাম। সেই ট্র্যাডিশনাল খাবার নান, সবজী, মুরগী। খাবার খেতে খেতে আমরা ঠিক করতে লাগলাম কীভাবে এগোবো। একটি পদ্ধতি হলো, অক্সফোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা, কারণ তারা আমাদের এপয়ন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছে। অন্য পদ্ধতি হলো, মহিউদ্দিন ভাইয়ের পুরনো বন্ধু যদি কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করা এবং সেই সূত্রে তালিকার বাইরে সাক্ষাত্কার গ্রহণ করা। আমরা খুব বেশি একটা প্রশ্ন করব না। তাঁদের বলতে বলব। প্রয়োজনে কথার পিঠে কথা আসবে। কোন রকম অভিযোগও নয়। শুধু তাঁদের ভাষ্য শোনা। বিচার-বিশ্লেষণ করা।

আজ বিকেলটা ফ্রি। মহিউদ্দিন ভাই ফোন করলেন তাঁর পুরনো বন্ধু ইয়াসমীন ও সুহায়েল লারিকে। তাঁরা খুব খুশি। বললেন, সন্ধ্যায় চলে যেতে, একেবারে রাতের খাওয়া খেয়ে ফিরতে। আমরা ঠিক করলাম, বিকেলটা কাটাব ক্লিফটনে, তারপর যাব সুহায়েল লারির বাসায়।

বিল মিটিয়ে ঘরে ফিরলাম। এবং স্যুটকেস খুলে দেখলাম, আমার টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেটের বাকি কিছুই নেই। বাকি সবই ঠিক আছে।

॥ ২ ॥

শুধু টেপ রেকর্ডার ও ক্যামেট হারানো বেশ একটা রহস্যের সৃষ্টি করল। আমরা কী আমাদের মিশন শেষ করতে পারব? এ ধরনের অনিষ্টয়তাও যে মনে জাগল না তা নয়। বিকেলে হোটেল থেকে বেরোবার আগে স্যুটকেসে তালা মারলাম যা সাধারণত করি না।

মহিউদ্দিন ভাই ছিলেন অক্সফোর্ডের প্রথম সম্পাদক। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অক্সফোর্ডের চাকরি নিয়েছিলেন। থাকতেন ক্লিফটনে। গাড়িতে উঠেই বললেন, 'চলেন, আগে আমার বাসাটা দেখাই।'

ক্লিফটন এক সময় ছিল করাচীর সেরা জায়গা। সমুদ্রের ধারেই। আরব সাগর এখন অনেকটা সরে গেছে। আদি ক্লিফটন বিস্তৃত হয়েছে। আফসান নতুন ক্লিফটন দেখে বলল, 'আগে এ জায়গাটা ছিল বিলের মত। ছেলেবেলায় বাবা নিয়ে আসতেন ঘুরে বেড়াবার জন্য।' সেই জলাভূমি ভরে গড়ে তোলা হয়েছে আবাসিক এলাকা। মহিউদ্দিন ভাইয়ের বাড়িটা ছিল বীচের ধার যেঁমে। যখন ক্লিফটন গড়ে ওঠে তখন কোন মেমন পরিবার এই বাসাটি তৈরি করেন। এক সময় করাচীতে মেমনরা ছিলেন বেশ অর্থশালী গোষ্ঠী। ১৯৪৭-এর পর অনেকে চলে যান করাচী ছেড়ে। এই বাড়িটির মালিকও বাড়িটিকে একটি ট্রাস্টের অধীনে রেখে বোধ হয় চলে গিয়েছিলেন। মহিউদ্দিন ভাই সেই দিনগুলির কথা বললেন, যখন করাচী আক্ষরিক অর্থে ছিল মেট্রোপলিটন শহর।

ক্লিফটনে ঘুরে বেড়াবার সময়ই নজরে পড়ল একটি রাস্তায় বালির বস্তা ইত্যাদি রেখে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। সশন্ত সৈনিকরা দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে জিজেস করে জানতে হলো না যে, এটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাসভবন। এখন এখানে থাকেন তার ছেলের বৌ ঘিনবা ভুট্টো। বেনজীর ভুট্টো স্বামীর সঙ্গে থাকেন ক্লিফটনের আরেক মাথায়।

ক্লিফটন ও আশেপাশের কিছু জায়গা ঘুরে লারিদের বাসায় পৌছলাম সঙ্গের সময়। ক্লিফটন পেরোবার পর সব আবাসিক এলাকাগুলির নামের আগে দেখি জুড়ে দেয়া হয়েছে 'ডিফেন্স' শব্দটি। লারিদের বাসায়ও এ রকম একটি এলাকায়। পরে জেনেছি 'ডিফেন্স' এলাকাগুলি আমাদের ডিওএইচএ'র মত। আমাদের সেনাবাহিনী পাকিস্তানীদের থেকে আইডিয়াটা নিয়েছিল সন্দেহ নেই। সরকার একেকটা এলাকা সেনাবাহিনীর জন্য দখল করে উন্নত করেছে। তারপর তা শুধু সেনাকর্তাদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে নামমাত্র মূল্যে। সেনাকর্তারা আবার জমিগুলি বিক্রি করেছে উচ্চ মূল্যে সিভিলিয়ানদের কাছে। এসব সিভিলিয়ানদের মধ্যে আছে বেসামরিক আমলা, বিভিন্ন পেশার মানুষজন, ব্যবসায়ী। এখন ডিফেন্স ফেজ সিঙ্গের কাজ চলছে অর্থাৎ ষষ্ঠ পর্যায়ের আবাসিক এলাকা উন্নীতকরণ হচ্ছে।

ইয়াসমীন লারি স্থপতি। পাকিস্তানের প্রথম দিককার মহিলা স্থপতিদের একজন। বাড়িটি দেখলেই বোৰা যায় স্থপতির বাড়ি, যত্ন করে করা। মধ্যপঞ্চাশের ইয়াসমীন খুব অমায়িক। হাসিটি মুখে লেগেই আছে। অন্যদিকে তাঁর স্বামী সুহায়েল লারিকে দেখলেই বোৰা যায় বনেদী সিন্ধু পরিবারের। বিদেশে পড়াশোনা করেছেন, ছবি তুলতে ভালবাসেন, সিন্ধুর ঐতিহ্যের ওপর কয়েকটি বই লিখেছেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে গড়ে তুলেছেন ‘হেরিটেজ ফাউন্ডেশন’।

‘ছেলেরা কই’, ছোট ড্রাইং রুমে আয়েস করে বসে জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘ছেলে দু’জন আমেরিকায়’, জানালেন ইয়াসমীন, ‘কম্পিউটার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত।’

‘আপনাকে আমি আগে দেখেছি’, জানাল আফসান, ‘কী একটা কনভেনশনে যেন আপনি একবার গিয়েছিলেন ঢাকায়। টিভিতে একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল। আমিই নিয়েছিলাম সে ইন্টারভিউটা।’

হাসলেন ইয়াসমীন। আমি সুহায়েলের লেখা বইগুলি উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। ‘সুহায়েল কী করছেন এখন?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘করাচী আর থাট্টা নিয়ে কাজ করছি। করাচীর পুরনো বিল্ডিংগুলির ছবি তুলছি, রক্ষা করার চেষ্টা করছি।’

আমার কাছে খানিকটা অবাক লাগে। করাচীর ভায়োলেসের কথা সবার জানা। এই ভায়োলেসে ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে মেতে থাকা নিতান্ত ধৈর্যের ব্যাপার। ঢাকা নিয়ে কত কিছু করার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। অর্থের অভাব, চারদিক থেকে নানা বাধা। এই দম্পতি একা একটি ফাউন্ডেশন করে নিজেরা কাজ করছেন। আসলে ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করতে হলে সচ্ছল বুনিয়াদটা বোধ হয় থাকা দরকার। অন্তত আজকের জামানায়।

‘তা আপনাদের মিশনটা কী?’ জিজ্ঞেস করলেন সুহায়েল।

মহিউদ্দিন ভাই কোন রাখটাক না রেখেই বললেন। সুহায়েলকে তিনি অনেকদিন ধরে চেনেন। এক ধরনের বিশ্বাসের সম্পর্ক আছে। সুহায়েল শুনলেন সব মন দিয়ে। বললেন, ‘হ্যাঁ, একটা সময় গেছে তখন। মার্টের গোড়ার দিকে আমি ছিলাম ঢাকায়। কমোডোর আহসানের সঙ্গেই ছিলাম। উনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।’

‘হ্যাঁ, কমোডোর আহসান আমাদের ওখানেও জনপ্রিয় ছিলেন’, আমি জানাই, ‘তিনি তো আর বেঁচে নেই। থাকলে হয়ত ঐ মুহূর্তগুলি সম্পর্কে কিছু জানা যেত।’

‘আমরা চেয়েছিলাম, মিসেস আহসানের সঙ্গে কথা বলতে,’ জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘যদি কমোডোরের কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু শুনেছি তিনি অসুস্থ।’

‘অসুস্থ?’ জিজ্ঞেস করলেন সুহায়েল, ‘বেশ কিছুদিন আগেও তো একবার দেখা হয়েছিল, তবে কাগজপত্র বোধ হয় নেই। থাকলে আমি জানতাম। আপনারা কী দেখা করতে চান তাঁর সঙ্গে?’

‘না থাকুক’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘উনি অসুস্থ, তাছাড়া এখন হয়ত আর কিছু বলতেও চাইবেন না। তাঁকে আমরা ডিস্টাৰ্ব করতে চাই না।’

‘আপনি সেই সময় ঢাকায় ছিলেন কয় দিন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘বেশ কিছুদিন। আহসান গবর্নর হিসেবে পদত্যাগ করা পর্যন্ত।’ তারপর তিনি সে সময়কার কিছু বিবরণ দেয়া শুরু করলেন। মনে হলো, আচ্ছা, এঁর সাক্ষাৎকার দিয়েই তো শুরু করতে পারতাম! কিন্তু আজ তো আমরা সাক্ষাৎকার নিতে আসিনি। আমি আর আফসান তাকালাম একবার পরম্পরের দিকে, একবার টেপ রেকর্ডারের দিকে। ইয়াসমীনও নিবিষ্ট মনে শুনছেন। এক সময় বললেন, ‘আমরা এ বৰ্বৱতার অনেক কথাই জানতে পারিনি।’

ঘরের আবহাওয়া ভারি হয়ে এল। আমরা সবাই ফিরে গেলাম সেই দিনগুলিতে যখন প্রতি মুহূৰ্ত ছিল ভয়ের, ভয় জয় করার এবং জয়ের। এক সময় ইয়াসমীন বললেন, ‘চলুন, খাবার দিয়েছে।’

লারিদের বাসায় খাবারটা ভালোই খেলাম। ড্রইং রুমে কফি খেতে খেতে বললাম, ‘লারির একটা সাক্ষাৎকার নিলে কেমন হয়?’

‘নিলে কেমন হয় মানে,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘নিতেই হবে। কী বলেন, কাল একটু সময় হবে?’

‘না আমার আবার কী দরকার? আমি তো এ সবের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।’ ইতস্তত করে বললেন সুহায়েল, ‘বৱং আপনাদের প্ৰোগ্ৰাম বলুন।’

‘আসলে কাল সকাল থেকে আমাদের কাজ শুরু,’ জানালেন মহিউদ্দিন ভাই। ‘প্ৰথম ইন্টারভিউটা জেনারেল উমৱের সঙ্গে।’

‘জানেন নাকি তাঁর সম্পর্কে কিছু?’ জিজ্ঞেস করল আফসান।

‘হ্যাঁ, তেমন কিছু নয়। ১৯৭১ সালে তিনি ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে শুনেছি।’ বোৰা গেল জেনারেল উমৱ তাঁর ‘ক্রাউডে’র নয়। লারির ক্রাউড হলো, পুৱনো ক্ষমতাবান আমলা, লেখক, সিদ্ধুর বনেদী পৱিত্ৰাবেৰ লোকজন।

‘আমরা আমাদের তালিকার বাইৱে আৱ কাৰ সঙ্গে কথা বলতে পাৰি?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘তালিকাটা বলুন।’

কৰাচীতে আমরা কাৰ কাৰ সঙ্গে দেখা কৱিব তা জানালেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘সিঙ্গু ক্লাবে আমরা অনেকেই প্ৰতি শনিবাৰ আড়ডা দিই। সেখানে পুৱনো অনেকেই আসেন, যেমন, আগা হিলালী, কমৱ উল ইসলাম

‘তাঁদেৱ কাৰো সঙ্গে কথা বলা যাবে?’ জিজ্ঞেস কৱে আফসান।

‘আমাৰ মনে হয় কমৱ উল ইসলামেৰ সঙ্গে কথা বলা যায়,’ জানালেন সুহায়েল। ‘তিনি ঐ সময় ছিলেন প্ল্যানিং কমিশনেৰ সেক্রেটাৰি, পৱে ডেপুটি চেয়াৰম্যানও

হয়েছিলেন। হ্যাঁ, লাহোরে, আইনবিদ রাজা কাজেমও আছেন। খুবই জ্ঞানী, গান-বাজনা নিয়ে থাকেন। লাহোরের নামকরা আইনবিদ। আমি তাঁর সঙ্গে না হয় ফোনে কথা বলে রাখব।’

‘আমার মনে হয়’, বললাম আমি, ‘আমরা কমর উল ইসলামের সঙ্গেই কথা বলি। কারণ ঐ সময় প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের চিন্তা-ভাবনাটা জানতে পারলে ভালো হয়।’

‘ঠিক আছে’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আজ রাত হয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল সকালে আমরা দেখা করব জেনারেল উমরের সঙ্গে, রাতে আমেনার ওখানে খাবার দাওয়াত। সঙ্কেয় আপনার এখানে আসব। আপনার বক্রব্য টেপ করব।’

সুহায়েলকে আর কোন কথা বলার সুযোগ দিলেন না মহিউদ্দিন আহমেদ।

### ॥ ৩ ॥

যে ক'দিন করাচী থাকব সে ক'দিনের জন্য একটি গাড়ি যোগাড় করা গেছে। বিভিন্ন সময় ট্যাক্সি ভাড়ার বুট ঝামেলা থেকে বাঁচা গেল। গাড়ির ড্রাইভার, এক যুবক, নাম পিটার। আমুদে লোক, সারাটাক্ষণ কথা বলে, পান চিবোয়, বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভর্যে তার মতামত প্রকাশ করে। এতে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। সাধারণ মানুষরা কী ভাবছে তা জানা যায়।

সকাল ন'টায় পিটার গাড়ি নিয়ে হাজির। আমরাও তৈরী। ‘গুড মর্নিং স্যার’, হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানায় পিটার।

‘চল’, গাড়িতে উঠে বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘অক্সফোর্ড।’

সদর থেকে খানিকটা দূরে অক্সফোর্ড। এয়ারপোর্টের পথে। পিটার গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনারা বুঝি এই প্রথম?’

‘আরে, আমি তো এখানেই ছিলাম,’ মহিউদ্দিন ভাই জানালেন। আগে ম্যাকলিয়ড রোডে ছিল অক্সফোর্ডের ছোট অফিস। মহিউদ্দিন ভাই ও আফসান বরং তাকে করাচীর অনেক ল্যান্ডমার্কের কথা জানালেন। পিটার চমৎকৃত।

‘তোমার বাড়ি কই?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আসলে আমরা এখানকার লোক নই।’ জানাল পিটার। পপগশের দশকে ভারত থেকে পিটারের বাবা পাকিস্তান চলে আসেন। করাচীতে থিতু হন। পিটারের জন্মও এখানে। করাচী, লাহোর, পুরনো মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে অনেক খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁরা এখানেই থেকে গেছেন।

‘অক্সফোর্ড’-এর এখন দোতলা বাড়ি। সুপ্রশংস্ত প্রাঙ্গণ। ‘দেখেন, দুদশকে কোথায় চলে গেছে অক্সফোর্ড। এখন তাদের গাড়ির সংখ্যাই ১১/১২টা। নিজস্ব ভবন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।’

অক্সফোর্ডের বর্তমান কর্ণধার আমেনা সান্ডে। তিনিই আমাদের জন্য সব আয়োজন করেছেন। মহিউদ্দিন ভাই তাঁর সঙ্গে পুরনো দিনের শৃঙ্খিচারণ করলেন। পুরনো কারা কারা আছেন হৌজ-খবর নিলেন। অল্প বয়সী একটি মেয়ে এল। নাম জাহরিন। বলল, ‘আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেছে।’ মেয়েটি আমাদের সঙ্গে যাবে জেনারেল উমরের বাড়ি। ‘রাতে দেখা হবে।’ বললেন আমেনা, ‘আপনাদের ডেপুটি হাই কমিশনারকেও বলেছি। উনি আমার এখান থেকে এক গাদা বই কিনে নিয়ে গেছেন।’

হায়, কাল রাতে ফোন করব ভেবেছিলাম আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার আন্দুর রহিমকে! অমায়িক মানুষ। ঢাকায় আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহিউদ্দিন আহমদ। গতকাল রাতে খেয়াল ছিল না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে বললাম, ‘একটা ফোন করা যাবে?’

অক্সফোর্ডের বিজনেস বেড়েছে। পাঠ্যবই-ই তার ভিত্তি। এখন অফিসে জায়গার সঙ্কুলান হচ্ছে না। ফোন করার জন্য সেলস ম্যানেজারের রুমে যাই। সেখানে আরও দু’জন বসেন। মহিউদ্দিন ভাই তাঁদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ শুরু করলেন।

‘আমি আশরাফ,’ বাংলায় বললেন ভদ্রলোক, ‘আমি অক্সফোর্ডের সেলসে আছি।’ নিজের নেমকার্ডটা বাড়িয়ে দিলেন। লে. কর্নেল (অব) আশরাফ।

‘আপনি বাঙালী?’ বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

‘হ্যাঁ,’ বলে হাসলেন, ‘বাড়ি নোয়াখালি। অবসর নেয়ার পর এখানেই আছি।’

আমি রহিম সাহেবকে ফোন করি।

‘আরে আপনাদের জন্যইতো ওয়েট করছি,’ উৎফুল্ল গলায় জানালেন তিনি। বস্তুত বিদেশে আমাদের দৃতাবাসের কর্মকর্তাদের এমন উৎফুল্ল স্বর খুব একটা শোনা যায় না।

‘আমি খবর পাইছি আপনারা আসছেন।’ জানালেন তিনি, ‘আসবেন নাকি এখন?’

‘না, এখন যাচ্ছি কাজে। বিকেলে একবার আসতে পারি।’

‘আমি একজনকে পাঠায়ে দেব আপনার হোটেলে। নিয়া আসবে। তা ছাড়া রাতে তো আমেনার ওখানে দাওয়াত। আমেনা ফোন করছিলেন।’

আন্দুর রহিমের সঙ্গে কথা শেষ হয়। মহিউদ্দিন ভাই আশরাফকে একটি নম্বর দিলেন। আশরাফ ফোন করলেন, জানালেন, অক্সফোর্ড থেকে। রং নাম্বার। তিনি ফোন রাখার আগেই অন্য প্রান্ত থেকে ভদ্রলোক বললেন, ‘কী বললেন অক্সফোর্ড? আমার এক বন্ধু সেখানে কাজ করত। এখন ঢাকায়।’

‘কী নাম ভদ্রলোকের?’ জানতে চাইলেন আশরাফ।

‘মহিউদ্দিন।’

‘বলেন কী, তিনি তো আমার সামনেই বসে আছেন।’

‘তার মানে?’

‘উনি ঢাকা থেকে এসেছেন গতকাল। আপনার নাম?’

আশরাফ মহিউদ্দিন ভাইকে ফোন দিলেন। বললেন, ‘আপনার বন্ধু আলম।’

‘সে কি! আমি গতকাল থেকে তার নাম্বার খুঁজে বেড়াচ্ছি। খোঁজ পাচ্ছি না। বছর দশক আগে একবার দেখা হয়েছিল।’

না, দৈবে বিশ্বাস করতেই হয়। মহিউদ্দিন ভাই কথা বলতে থাকেন। আমি অক্সফোর্ডের সেলস কাউন্টারের বইগুলি দেখি। নতুন বইয়ের মধ্যে জেনারেল নিয়াজী ও রোয়েদাদ খানের বইটি চোখে পড়ে। এঁদের দু'জনের সঙ্গেই আমাদের দেখা করার কথা। বই দুটি সংগ্রহ করে নিই। কাজে লাগতে পারে। জাহরিন আবার তাড়া দেয়। মহিউদ্দিন ভাই আর আফসানও বেরিয়ে আসে। গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলি, ‘মহিউদ্দিন আহমেদ জিন্দাবাদ।’

‘কেন?’ জানতে চান তিনি।

‘আপনি একা গত এক দশকে যে পরিমাণ বই বের করেছেন, এমন কি শুণের কথা বিচার করেও, এখানকার অক্সফোর্ড তার ধারে কাছেও না।’

‘তার মানে?’

‘মানে হলো, অক্সফোর্ডের বাড়ি গাড়ি সব আছে। তবে তারা টাকাটা পায় পাঠ্যবই বিক্রি করে। এরই ফাঁকে তারা অন্য ধরনের দু'চারটি বই বের করে। আপনিও পাঠ্যবই করেন, কিন্তু সেগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে অন্য ধরনের বই। এটা রিয়েলি একটা অ্যাচিভমেন্ট।’

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেও মনে হলো না তিনি এ বিষয়ে খুব একটা নিশ্চিত।

॥ ৪ ॥

ডিফেন্সের খায়াবান শেহারে মেজর জেনারেল গুলাম উমরের বাড়ি। দরজায় একজন নয়, দু'জন সশস্ত্র শান্ত্রী। উমর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এলেন। বয়স সত্ত্বে পেরিয়েছে কিন্তু এখনও সবল ও সুস্থ। শুধু একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। আমাদের সবাইকে জড়িয়ে ধরলেন যেন অনেকদিনের চেনা। গাড়িবারান্দার এক পাশে সবুজ লন, লনের পাশে নানা বর্ণের ফুল। ড্রাইং রুমটি রুচিসম্মতভাবে সাজানো। দেয়ালে পেইন্টিং, একটি ড্রাইং চুঘাতাইয়ের। প্রাচ্যের কিছু পটারি, এমন কি টেবিলে রাখা আছে আফ্রিকার কাঠের মূর্তি। রুচি দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রশংসা করতেই বললেন, ‘এসব আমার ছেলের বউয়ের করা। সে আর্কিটেষ্ট, বাড়ির ডিজাইন তার, ঘরদোর সে-ই

সাজায়।' কথা শেষ না হতেই উমরের পুত্রবধূ এলেন। উমর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মহিউদ্দিন ভাই আমাদের উদ্দেশ্য বললেন। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম উমরের শান্ত, সৌম্য মুখ। ১৯৭১ সালে ইনি ছিলেন পাকিস্তানের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব। অনেকে বলেন সর্বেসর্বা, ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ। গণহত্যার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কতটুকু? ২৫ মার্চের পাকিস্তানী আক্রমণ সম্পর্কে তিনি জানতেন কতটুকু?

উমর জানালেন, আমাদের উদ্দেশ্য তিনি কিছুটা জানেন। সাধ্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। আমরা যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারি। তিনি যতোটা জানেন, বলবেন, কিছুই লুকোবেন না। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, আমাদের তেমন কোন প্রশ্ন নেই। ১৯৭০-৭১-এর ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে আগ্রহী। তবে, তাঁর খুশিমতো যেখান থেকে ইচ্ছে শুরু সেখান থেকে বলা শুরু করতে পারেন। উমর তাঁর ছাত্রজীবন থেকে শুরু করলেন।

জন্ম তাঁর আস্থালায়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করেছিলেন। পরে, ইস্তাম্বুল ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. করেছেন। পড়াশোনা নিয়েই হয়ত থাকতেন। 'আমার পরিবারের কেউ বা আমি আগে কখনও কোন সৈন্যের মুখোমুখি হইনি।' জানালেন উমর। আলিগড়ে পড়ার সময় জিন্নাহর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ব্রিটিশের ভারতীয়দের সেনাবাহিনীতে নিতে চাচ্ছে। আলিগড়েও সেই ডাক পৌছেছে। হাসান আসকারির সঙ্গে একদিন গেলেন জিন্নাহর কাছে। জিন্নাহ বললেন, সেনাবাহিনীতে মুসলমান কেন, ভারতীয়দের সংখ্যাই কম। মুসলমান যারা আছে তারা সব জায়গীরদার পুত্র। 'পাকিস্তান হবে, তখনতো আমাদের সেনাবাহিনী লাগবে।' বলেছিলেন জিন্নাহ, 'সুতরাং বিনা দ্বিধায় সেনাবাহিনীতে যোগ দাও।' উমর ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু আর্মি রিক্রুটিং বোর্ডের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। নামাত্র পরীক্ষা করে তাঁদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হয়েছিল। তখন ১৯৪০ সাল।

১৯৪৭ সালের পর তিনি পাকিস্তান চলে আসেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। সেনাবাহিনীতে থাকার সময়ই তিনি লন্ডন ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও ছিলেন কিছুদিন। মিলিটারি অপারেশনের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন, সৌদী আরবে বাদশাহ ফয়সলের সামরিক সচিব ছিলেন। ১৯৬৯ সালে রাবাতে ওআইসি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। ১৯৭১ সালে নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব হওয়ার আগে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ডিভিশনের কমান্ডার।

১৯৫৮ সালে উমর প্রথম বাংলাদেশে যান। সেনাবাহিনীতে তখন অনুসরণ করা হতো ব্রিটিশ ও মার্কিন তত্ত্ব। উমর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বলছিলেন, পাকিস্তানের নিজস্ব সামরিক তত্ত্ব তৈরি করতে হবে। খুব সম্ভব তাঁর অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য তিনি

আইয়ুব খানের নজরে আসেন। পাকিস্তানের সামরিক তত্ত্ব তৈরির ভার দেয়া হয় তাঁর ওপর। চার বছর এ দায়িত্বে ছিলেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকবার এসেছিলেন বাংলাদেশে। ১৯৬২ সালে সামরিক বাহিনীপ্রধান জেনারেল মুসা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাকে পূর্ব পাকিস্তানে পোষ্টিং দিতে চাই, আপত্তি আছে?’

‘মোটেই না।’

সুতরাং একজন লেং কর্নেল হিসেবে তিনি এলেন ঢাকায়। জেনারেল ওয়াসি উদ্দিন তখন জিওসি। উমর জিএসও। ওয়াসি উদ্দিনকে উমর বলেছিলেন, ‘আপনি আমাকে মার্শাল ল’র কোন কাজ দেবেন না। আমি আমার কাজ করব।’

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার অবস্থা কী ছিল? উমর বলছেন, সেখানে তখন কোন গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না, মর্টার ব্যাটারি ছিল একটি, আর দুটি যুদ্ধবিমান। ট্যাংক রেজিমেন্টও ছিল না। ‘আমরা সব সময় বলেছি’, বললেন উমর, ‘ডিফেন্স অব স্টেট লাইস ইন দি ওয়েস্ট, এটা বোগাস থিউরি। ব্রিটিশরা প্রথম এই কথা শুরু করেছে, তারপর সবাই আউড়ে গেছে।’

এমন সময় ভৃত্য এল চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। পরিপাটি পোষাক, পায়ে স্পঞ্জের স্যাডেল। উমরের ছেলের বড় সবাইকে চা ঢেলে দিতে লাগলেন। আমি শুধু উমরকে দেখছিলাম। প্রতাপশালী জেনারেল, যিনি নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ১৯৭১ সালে, আজ কেমন অবলীলাক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী বর্ণনা করে যাচ্ছেন। যা বলছেন, সবই বাঙালীদের পক্ষে! ১৯৭১ সালের সঙ্গে কী তাঁর যোগ ছিল না?

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সেই সময় এসেছেন ঢাকায়। উমর জিওসিকে বললেন প্রেসিডেন্টসহ একটি মিটিং ডাকতে, যেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক চিত্র তুলে ধরবেন। তুলে ধরলেনও, ‘যদি যুদ্ধ বাধে ভারতের সঙ্গে,’ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন উমর, ‘তা হলে এখানকার অবস্থা কী হবে?’

‘ভারতের তেমন কোন ইচ্ছে নেই’, উত্তরে জানালেন কর্মকর্তারা। পশ্চিমা কর্মকর্তাদের তবুও অনুরোধ জানান হলো তাঁরা যেন একটি ট্যাংক ও একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট পাঠান পূর্ব পাকিস্তানে।

এর ছয় মাস পর উমরকে বিদেশে একটি কোর্স করার জন্য বদলি করা হয়, বদলি করা হয় ওয়াসি উদ্দিনকেও। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এলেন জিওসি হয়ে। তিনি উমরকে বললেন, ‘তোমার এখন কোর্সে যাওয়া চলবে না, আমাকে সাহায্য কর।’ সেই থেকেই কী উমরের সঙ্গে ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠতার শুরু যে কারণে ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া তাঁকে নিরাপত্তা কাউপিলে নিয়ে এলেন? ‘১৯৬৫ সালে যুদ্ধের সময়’, বললেন উমর, ‘আমার মনে হয়েছিল, ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করবে না?’

‘এ কথা কেন মনে হলো?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন কামেল পুরুষ।’ একটু মিষ্টিক হাসি হাসলেন উমর। বোঝাতে চাইলেন ঐ কামেলত্বের কারণেই তিনি বুঝেছিলেন।

‘তারপর?’ বললাম আমি।

‘তবে, ভারত যদি ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করত তা হলে ছয় ঘণ্টাও পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হতো না। আর বাঙ্গলীরা তখন বুঝেছিল তাদের কেউ রক্ষা করবে না।’

এরপর উমর বেশ খানিকক্ষণ এক ধরনের অ্যাকাডেমিক লেকচার দিলেন। আমরা বাধা দিলাম না। যদি তাঁর আঞ্চোপলক্ষি হয় এই বয়সেও, ক্ষতি কী! উমর যা বললেন তার মূল কথা হলো— গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইনের মাধ্যমে সে প্রক্রিয়া খর্ব করা হলো। বলা যেতে পারে পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজ তখনই শুরু হলো। সামরিক আইনের প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের দুই অংশে দুই রকমভাবে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ শিক্ষিত, রাজনীতি সচেতন। তাদের মনে হয়েছে এভাবে চলতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ত সংস্কৃতি, মানুষ কম রাজনীতি সচেতন, সেখানে তাই তেমন প্রতিক্রিয়া হয়নি। আসলে কোন নীতি প্রণয়নে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের কোন অংশদারিত্ব ছিল না। ১৯৭১ সাল একদিনে হয়নি।

‘ভারত’, বললেন উমর, ‘শুরু থেকেই পাকিস্তান ভাঙ্গার নীতি গ্রহণ করেছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানে সে কাজ শুরু করেছিল।’

আমি আর মহিউদ্দিন ভাই অজান্তেই হেসে ফেললাম, নিঃশব্দে। মহিউদ্দিন ভাই সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভারতীয় এই এজেন্টার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এজেন্ট কী ছিল?’

জেনারেল উমর সরাসরি এর উত্তর দিলেন না। বললেন, ‘আমরা ইন্টিগ্রেডেট স্টেট হিসেবে বিকশিত হইনি। হয় আমরা এর অর্থ বুঝিনি অথবা নিজেদের স্বার্থ দেখেছি। নিজেদের স্বার্থ অর্থাৎ ফিউডাল লর্ডের স্বার্থ। যেমন, দু’অঞ্চলের বৈষম্য থাকার কথা ছিল না; কথা ছিল না সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল, বালুচ বিভিন্ন নামের রেজিমেন্ট থাকার। বাঙ্গালীদের আমরা হেয় চোখে দেখতাম, নিজেদের বলতাম মার্শাল জাতি কিন্তু পৃথিবীতে মার্শাল জাতি বলে কিছু নেই। নিরাপত্তার মানেও আমরা বুঝিনি। বন্দুক দিয়ে কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়? এই যে আমরা এতো টাকা খরচ করছি ডিফেন্সের পিছে তা দিয়ে কি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে?’

এই মনোলগের উত্তর না দিয়ে মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা, আগরতলা মামলা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?’

‘আমি সেই সময় মিলিটারি অপারেশনের ডিজি ছিলাম’, জানালেন উমর, ‘এখানে অগরতলা মামলা সবাই বিশ্বাস করেছিল এবং সবাই চেয়েছিল পাবলিক ট্রায়াল হোক। তাতে মুজিব যদি নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে নির্দোষী, যদি দোষী প্রমাণিত হন তবে দোষী...’

‘কিন্তু আপনার কী মনে হয়?’ জিজ্ঞেস করল আফসান।

‘আগরতলা মামলার হ্যান্ডলিং ভুল ছিল’।

‘এরপরতো এল নির্বাচন’, বললাম আমি, ‘এ সম্পর্কে কী জানেন বলুন।’

‘নির্বাচনের পর’, জানালেন উমর, ‘আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বললাম, আপনি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। একবার পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আসুন। তিনি মোটামুটি রাজি ছিলেন। খন্দকার মুশতাক আমাকে জানালেন, মুজিব ভয় পাচ্ছেন পশ্চিম পাকিস্তান যেতে। কারণ তাঁর ধারণা তাঁকে সেখানে খুন করা হতে পারে। এটা জেনে আমি তাঁকে বললাম, আমার এক ছেলে লেফটেন্যান্ট। সে আপনার সঙ্গে থাকবে। এই গ্যারান্টি আমি আপনাকে দিচ্ছি। তারপর দেখা করলাম ভুট্টোর সঙ্গে। বললাম, মুজিব চান ঢাকায় সেশন হোক। ভুট্টো রাজি হলেন।’

এ প্রসঙ্গে উমর জানালেন, ‘হ্যাঁ, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। নানাজন নানা দাবি করেছিলেন। যেমন, নুরুল আমীন তিন কোটি টাকা চেয়েছিলেন।’ কিন্তু, তারপর কী হলো? মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘লারকানায় ভুট্টো ইয়াহিয়া মিটিং সম্পর্কে কী জানেন?’

‘লারকানা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন মুজিব প্রাইম মিনিস্টার হবেন। কিন্তু তারপর সব বদলে গেল।’

‘আপনি ছিলেন সে মিটিংয়ে?’

‘না, লারকানায় আমাকে ছাড়া সবাইকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। শুনেছি ভুট্টো সেখানে ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, উমরকে রিটায়ার করাও।’

উমর, মনে হলো, ভুট্টোর ওপর খানিকটা ক্ষুঁক। তিনি জানালেন, ঐ সময় ক্ষমতার শীর্ষে জেনারেল গুল হাসান ও পীরজাদা ছিলেন শক্তিশালী, যাঁরা চেয়েছিলেন, ভুট্টো ক্ষমতায় আসুক, তা হলে তাঁরাই হবেন সর্বেসর্বা।

‘পিপলস পার্টি ওয়াজ নট ইন্টারেক্টেড ইন স্টেট পাকিস্তান’, দৃঢ়ভাবে জানালেন উমর, ‘ভুট্টো শুধু পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি, আর্মিরও সর্বনাশ করতে চেয়েছে।’ ভুট্টোর কী কোন ক্যান্ডিডেট ছিল পূর্ব পাকিস্তানে? না। কিন্তু মুজিবের ক্যান্ডিডেট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। আসলে ভুট্টো কোন আন্তর্রাষ্ট্র্যান্ডিংয়েই যেতে চায়নি। একটি ঘটনা বলি: একটু থেমে বললেন উমর, ‘১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় একটু ঝামেলা হচ্ছিল। জেনারেল ইয়াকুব থেকে এই খবর যখন জানতে পারলাম তখন আমি ছিলাম করাচীতে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও ছিলেন করাচীতে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি ভুট্টোও আছেন সেখানে। ইয়াহিয়া আমাকে বললেন, ইয়াকুবকে খবর পাঠাও—বি ফার্ম বাট জাস্ট। ভুট্টো বাধা দিয়ে বললেন, না, আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া উচিত। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মি: ভুট্টোকে অথিরিটি দিয়েছেন আমাকে নির্দেশ দেয়ার? প্রেসিডেন্ট কিছু বললেন না।’

‘২৫ মার্চ ঢাকায় কি হয়েছিল আপনি জানেন?’

‘হ্যাঁ, ২৫ মার্চ আমি ঢাকায় ছিলাম,’ জানালেন উমর, ‘জেনারেল ইয়াকুব অপারেশন ব্রিংসক্রিগ তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পলিটিকাল সলিউশনের পক্ষে ছিলেন। ২৫ মার্চ কি হয়েছিল জানি। সকালে রেডিয়োতে ঘোষণা দেয়ার জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রোয়েদাদ খান রেডিয়োতে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন এটা নর্মাল মনে হয়েছিল কিন্তু পরে দেখলাম তা নর্মাল নয়।’

‘আপনি কি জানতেন তারপর কি হয়েছে?’ জিজেস করল আফসান।

‘না, আমি ঠিক জানি না।’

‘আপনি ছিলেন ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ, নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য, আপনি কিছু জানতেন না?’ প্রশ্ন করি আমি।

‘না, আমি জানতাম না,’ জানালেন উমর, ‘নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল বটে কিন্তু কোন মিটিং ডাকা হতো না। দেখুন, পূর্ব পাকিস্তানের লোক বহুত পেয়ারে, সাচ্চা মুসলমান। ১৯৭১ সালে কয়েকজন লোক পলিসি ডিকটেট করেছে, সাধারণ মুসলমানরা নয়।’

‘কিছুই জানতেন না?’ আবারও প্রশ্ন করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘না, পরে জেনেছি’, আবেগাক্রান্ত স্বরে বললেন উমর, ‘জানেন আপনারা আসার আগে আমি কোরান পড়েছিলাম। আর পড়তে পড়তে কাঁদেছিলাম।’

আমরা আর কী বলব? চুপ করে রইলাম। উমর হঠাতে বললেন, ‘১৯৭০ সালের নির্বাচনে আহমদিয়ারা ভুট্টোকে সাপোর্ট করেছিল।’ প্রসঙ্গটি অপ্রাসঙ্গিক। আমরা জানালাম, ভুট্টো পরে আহমদিয়াদের অমুসলমান ঘোষণা করেছিলেন। আর যদি করেই থাকে তা হলে ক্ষতি কী?

‘নিয়াজী সম্প্রতি তাঁর বইতে বলেছেন,’ প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললাম আমি, ‘তাঁকে ঢাকায় পরিত্যাগ করা হয়েছিল।’

‘ইটস নট কারেকট’, বললেন উমর, ‘নিয়াজী লুট করেছে, সোনা পাচার করেছে। তার চরিত্রও খারাপ,’ উত্তেজিত গলায় বললেন উমর, ‘হি ওয়ান্টস টু জাস্টিফাই হিমসেলফ। সে ব্যালাসড পার্সন ছিল না। সিনিয়র জেনারেলরা কেউ পূর্ব পাকিস্তানে যেতে চায়নি। তাই তাকে পাঠানো হয়েছিল।’

‘তা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার জন্য কে দায়ী?’

‘সবাই রেসপন্সিবল। ভুট্টো ক্ষমতায় যতদিন ছিলেন ততদিন আমি হয় জেলে নতুবা গৃহবন্দী ছিলাম। জেনারেল জিয়া অনেকবার তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে বলেছিলেন। আমি যাইনি।’

তারপর হঠাতে তিনি আবার ভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। ভারত তো সব সময় পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছে। ১৯৪৭ সালে মাইগ্রেশন হলেও পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা থেকে গিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের শিশু-কিশোরদের তারা

অ্যান্টিপাকিস্তান করে তুলেছিলেন। আমার মনে হলো এই কথাটি যেন কোথায় পড়েছি বা শুনেছি। মনে পড়ল রাও ফরমান আলীও তাঁর বইয়ে সেই একই কথা লিখেছেন, যার মূল কথা হলো বাঙালীরা হিন্দুদের চিন্তায় প্রভাবাভিত্তি হয়ে পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের দুর্বলতার সুযোগ তারা নিয়েছে। ঘড়ি দেখলাম, জুমার নামাজের সময় হয়ে গেছে। যিনি এতো নামাজী, পীরের বৎশ, তাঁরতো এখনই নামাজে যাওয়ার কথা। উঠি উঠি করছি। এমন সময় পূর্ব প্রসঙ্গের জের ধরে তিনি বললেন, ‘ইকবালের সঙ্গে তো আর রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনা চলতে পারে না।’

‘জুমার নামাজের সময় হয়ে গেছে,’ বলি আমি, ‘এবার উঠতে হয়।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ,’ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন উমর, ঘড়ি দেখলেন, বললেন, ‘না, সময় চলে গেছে।’

আমরা দুঃখ প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, ‘আপনারা আসাতে খুব খুশি হয়েছি। দেখুন, বাঙালীদের আমি পছন্দ করি। আমি অনেকদিন ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে। এই যে বাঙালী ছেলেটি কাজ করে আমার বাসায় তাকে আমি নিজের ছেলের মত দেখি।’

এ কথার আর জবাব হয় না। বাইরে বেরিয়ে আসি। বাঙালী ভৃত্যটি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার এক কোণে। উমর কথা বলছেন মহিউদ্দিন ভাই ও আফসানের সঙ্গে। আমি ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি, ‘কতদিন হলো আছ এখানে?’

‘এগার বার বছর,’ বিবর্ণ গলায় উন্নত দেয় ছেলেটি।

‘কত বেতন পাও?’

‘হাজার চারেক।’

‘বাড়িটাড়ি যাও?’

‘সামনের বছর যাব।’

‘তোমার বাড়ি কই, ফুলগাজি?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘হ্যাঁ। ফুলগাজি।’

‘মহিউদ্দিন ভাই’, ঠাট্টার সুরে বললাম, ‘অ্যানাদার ম্যান ফ্রম ফুলগাজি।’ মহিউদ্দিন ভাইয়ের বাড়িও ঐ এলাকায়।

আমাদের গাড়ি যতক্ষণ না রওয়ানা হলো ততক্ষণ জেনারেল উমর বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রচার যা আমাদের দেশের অনেকেও বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই জুমার সময় দেখলাম না রাস্তার ট্রাফিক কমেছে। পরে, মনে পড়ল, আরে, পাকিস্তানে তো বক্ষ রবিবার, শুক্রবার নয়। ধর্মের ওয়াষ্টে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারাতে রাজি নয় পাকিস্তান। এতো মসজিদও চোখে পড়ল না।

আমার ধারণা ছিল, করাচীতে ট্রাফিক জ্যাম থাকবেই। কিন্তু দেখা গেল, প্রতিটি রাস্তায় ট্রাফিক নির্দেশ সবাই মেনে চলছে। আশেপাশে যে পুলিশ-টুলিশ আছে তাও নয়। ট্রাফিক জ্যাম নেই বললেই চলে, অথচ ঢাকা থেকে করাচীতে ভায়োলেন্স বেশি।

‘এই যে, এইটে হলো কায়েদে আজমের বাসা,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই। গাড়ি বাঁক ঘূরতেই পুরনো আমলের দোতলা একটা বাড়ি চোখে পড়ল। এখন এটা জাদুঘর।

‘একবার আসতে হয়’, বলি আমি।

‘এটা বোধ হয় এখন বক্ষ’, জাহরিন বলে, ‘শুনেছি, কায়েদের একটি ডায়েরি চুরি গেছে জাদুঘর থেকে।’

‘তবুও খোঁজ নিয়ে যাবো।’

হোটেলে আমাদের নামিয়ে জাহরিন চলে যায়। পিটার জানায়, সঙ্কের পর আসবে। খাওয়া-দাওয়ার পর মাত্র ঘরে ঢুকেছি, হাই কমিশন থেকে ফোন। ‘আপনারে আনার জন্য গাড়ি পাঠাচ্ছি’, জানালেন রহিম সাহেব। মিনিট কুড়ি পরই রিসেপশন থেকে ফোন। গাড়ি এসেছে হাই কমিশন থেকে। হাই কমিশনের হিসাবরক্ষক মোহিদুল এসেছেন।

ক্লিফটনের কাছেই হাই কমিশনের বাড়ি। আহা মরি এমন কিছু নয়। কিন্তু করাচী শহরের একটি বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। পাকিস্তানী শাস্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। খারাপ লাগল না। আসলে এসব বিষয় ছোটখাটো, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বোঝানো যাবে না।

সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আবদুর রহিম। মাত্র এসেছেন করাচী। এখনও গুছিয়ে উঠতে পারেন নি। তার ওপর আবার বাড়ি বদল করতে হবে। অন্যদিকে হাই কমিশনের অবস্থা খুবই নাজুক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তিনিই একমাত্র কর্মকর্তা। তিনিই ভিসায় সিল দেন, তিনিই বাণিজ্য বাড়াবার জন্য ইকোনমিক কাউন্সিলরের কাজ করেন, তিনিই আবার ডেপুটি হাই কমিশনার। গত ছয় মাস কোন কর্মকর্তার পোষ্টিং হয়নি, অথচ ঢাকা-করাচীর একটি বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার অবকাশ আছে। জানি না, ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। ‘আপনাদের অনারে একটা ডিনার দেব ভাবছি।’ বললেন ডেপুটি হাই কমিশনার।

‘কী দরকার?’ বললাম আমি, ‘আপনার বাসা বদল করতে হবে, লোকজন নেই।’

‘আরে না, বলেন কী!’ উড়িয়ে দিলেন আপত্তিটা রহিম সাহেব।

সন্ধ্যার আগেই বিদায় নেই। সুহায়েল লারির বাসায় যেতে হবে, সেখান থেকে আমিনা সাইদের বাসায়। হোটেলে ফিরতে ফিরতে ভাবি, না, সময়ের খুব একটা অপচয় হয়নি।

সারা দিনই কাজ করছি। এমন কী নিম্নগণেও আলাপ-আলোচনায় জানা যাবে অনেক কিছু।

সেরওয়ানে পৌছে দেখি লিখতে মহিউদ্দিন ভাই আর আফসান অপেক্ষা করছেন। পিটারও গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত। আমরা আবার ডিফেন্স থার্ড ফেজের দিকে রওয়ানা হই।

সুহায়েল আর ইয়াসমীন অপেক্ষা করছিলেন। নিজের হাতে কেক বানিয়েছেন ইয়াসমীন। অন্যান্য খাবারতো আছেই। সুহায়েল বললেন, 'কামার উল ইসলামের সঙ্গে আলাপ করে রেখেছি। দুপুর বেলায় সিন্ধ ক্লাবেও লাঞ্চ করতে পারি। সেখানেও অনেকে থাকবেন। তবে,' একটু থেমে বললেন, 'ওখানে আবার টাই জুতো পরে যেতে হবে।'

'আমি রাজি নই,' বাংলায় বললাম মহিউদ্দিন ভাইকে। আমাদের ঢাকা ক্লাবেও এরকম কিছু অদ্ভুত নিয়ম কানুন আছে। এগুলি সাহেবদের থেকে ধার করা। এ ধরনের ক্লাবের কথা মনে হলেই আমার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক-ম্যান্ডেলা যুগের কথা মনে হয়। ঐ সময় এ সব ক্লাবে কুরুর ও কালো মানুষদের ঢোকা বারং ছিল। 'না, সিন্ধ ক্লাবে দরকার নেই,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'আমরা কামার উল ইসলামের বাসায়ই যাবো।'

লারিদের বাসায় খাবারটা ভালোই খেলাম। তারপর কফি খেতে খেতে আমরা পুরনো প্রসঙ্গ তুললাম। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, '১৯৭১-এর মার্চে তো ছিলেন ঢাকায়, কিছু বলুন।'

'কি বলব?', বললেন লারি, 'আমি ছিলাম কয়েকদিন তারপর ফিরে আসি করাচী। আসলে বলার মতো কিছু নেই।'

'গতকাল বলছিলেন,' বললাম আমি, 'মার্চের প্রথম দিকে গভর্নর হাউসে ছিলেন, কিছু দৃশ্যতো দেখেছেন, কিছু তো শুনেছেন...'

আসলে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম মার্চের আগে, ফেব্রুয়ারিতে এক বন্ধুর সঙ্গে। করাচীর সান পত্রিকার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। ঢাকায় নেমে প্রথম সপ্তাহ এডমিরাল আহসানের সঙ্গে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। সেখানে মাঝে মাঝে সাহেবজাদা ইয়াকুব আসতেন, রাজনীতির কথা হতো, সব অবশ্য মনে নেই।'

'কোন ঘটনার কথা কি মনে আছে?'

'না, তেমন নয়, তবে রাতে গুলির আওয়াজ শুনতাম। গভর্নর হাউসে থেকেই। সকালে একদিন গভর্নরের এডিসি ব্রিগেডিয়ারকে জিজেন্স করলাম, এতো গুলি হলো কোথায়? তিনি বললেন, আকাশের দিকে ব্ল্যাংক ফায়ার করেছে সৈন্যরা। খুব সম্ভব আরও কয়েকজনকে এ ধরনের প্রশ্ন করে একই উত্তর পেয়েছি। কিন্তু বাঙালী এডিসি আমাকে জানালেন, তাঁর সঙ্গে থানার যোগাযোগ আছে। রাতে নিরাপত্তা রক্ষীরা গুলি করে মানুষ মারছে। তাঁর চোখে পানি। এ ঘটনা হয় ফেব্রুয়ারি শেষে অথবা ১লা মার্চের পর। তবে তুরা মার্চের পর আর গুলির শব্দ শুনিনি।'

‘তারপর?’ জিজ্ঞেস করল আফসান।

‘ঢাকা থেকে চলে গিয়েছিলাম ছবি তুলতে। ছবির কাজ শেষ করে ১লা মার্চ ফিরে এলাম ঢাকায় পার্লামেন্টের অধিবেশন দেখতে। গভর্নর হাউসে এসে প্রথমে মিলিটারি সেক্রেটারির রূমে ঢুকলাম। তিনি তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনছেন। ভাষণ শেষে সবাই স্টান্ড। এডমিরাল আহসান এতই স্টান্ড হয়ে গিয়েছিলেন যে, কিছুই বলতে পারছিলেন না। বিকেল তিনটার দিকে তিনি এর প্রতিবাদে পদত্যাগপত্র পাঠালেন।’

‘হ্যাঁ,’ বললাম আমি। ‘এডমিরাল আহসানের এই সাহস প্রশংসিত হয়েছে এখানে। জেনারেল ইয়াকুবেরও।’

‘জেনারেল ইয়াকুব বলতেন’, বললেন সুহায়েল, ‘এডমিরাল আহসান টু সফট। ফার্ম নয়। কিন্তু তার অর্থ ইয়াকুবও হ’ক ছিলেন না। তুরা মার্চে পল্টনে শেখ সাহেবের বক্তৃতার পর মানুষ কিছুটা শান্ত হলো। সবই তখন শেখ সাহেবের নিয়ন্ত্রণে। ঢাকা শান্ত, ইয়াকুবের আর করার কিছু ছিল না। তবুও জেনারেল পীরজাদা যখন ইয়াকুবকে কঠোর হওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগলেন তখন ইয়াকুবও পদত্যাগ করলেন।’

‘এডমিরাল আহসানের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি।’ জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘কিন্তু তাঁর স্ত্রী অসুস্থ আর তাঁদের কাছে এডমিরাল আহসানের কোনও কাগজপত্র নেই।’

‘হ্যাঁ, আমিও কিছু কাগজপত্রের খোঁজ করেছিলাম, পাইনি। আহসানকে এ সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে লিখতেও বলেছিলাম। লিখবেনও বলেছিলেন, কিন্তু লেখা আর হয়নি।’

‘২৫ মার্চের ঘটনাবলী বা এরপর কী ঘটেছিল জানেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘আসলে বিশদ কিছু জানি না। রেডিয়ো বা মাঝে মাঝে বিদেশী কাগজপত্র পড়ে অবশ্য একটো ধারণা হয়েছিল যে, সেখানে খারাপ কিছু হচ্ছে।’

‘পশ্চিম পাকিস্তানে কিছুই জানা যায়নি?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘পাকিস্তানের লোকেরা আসলে কিছুই জানত না’, বললেন সুহায়েল, ‘বিবিসির খবর শুনলেও বলত যে মিথ্যা। পিপল হ্যাড টোটালি ক্লোজড মাইড। এখানে সবাই বলত, ৬ দফা মেনে নেয়ার অর্থ পাকিস্তানের বিলুপ্তি। একমাত্র এয়ার মার্শাল আসগর খান ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করে কিছু বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সবাই তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলেছে। তাঁর জনসভায় তাঁকে ইট-পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। আশ্চর্যের বিষয়, যারা জানত তারাও কিছু বলেনি আসগর খান ও আহমেদ রাজা কাসুরি ছাড়া।’

‘আচ্ছা, আবার পুরনো কথায় ফিরে যাই,’ বলি আমি, ‘গভর্নর আহসান পদত্যাগ করলেন...’

‘হ্যাঁ, তারপর গভর্নরের সঙ্গেই হেলিকপ্টারে গভর্নর হাউস ত্যাগ করি এবং করাচী ফিরে আসি। করাচীতে ড. মুবাশির হাসান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি খবর?’

জানালাম। তিনি বললেন, ‘৪৭ সালে স্বাধীনতা রক্ষায় লাখ খানেককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এখনও না হয় মরবে, ক্ষতি কী?’ মুবাশির ছিলেন পিপলস পার্টির নীতিনির্ধারকদের একজন।

‘মেজর জেনারেল ফরমান আলীর সঙ্গে দেখা হয়নি ঢাকায়?’

‘গভর্নর হাউসে হয়েছে।’ তিনি আমাকে পছন্দ করতেন না। গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি আমাকে তা জানিয়েছিলেন।

‘১৬ ডিসেম্বর কী হলো?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই। ‘১৬ ডিসেম্বর টিভিতে ঢাকার সারেভারের ছবি দেখিয়েছিল। এতে অবল প্রতিক্রিয়া হয়। টেলিভিশনে সেই সারেভারের ছবি আর দেখান হয়নি।’

সুহায়েল কথা শেষ করলেন। বোঝা গেল টেপ রেকর্ডারের সামনে তিনি স্বত্ত্ব বোধ করছেন না। আমরাও আর জোর করলাম না।

‘দেখি, কামার উল ইসলামকে পাই কী না?’ বলে উঠে গেলেন সুহায়েল। আমি বাদামের খোসা খুলে বাদাম চিবুতে লাগলাম। মহিউদ্দিন ভাই ইয়াসমীনের সঙ্গে টুকটাক কথা বলতে লাগলেন। খানিক পর ফিরে এলেন সুহায়েল। ‘আগামীকাল সন্ধ্যায় এপ্রেন্টিমেন্ট হলো কামার উল ইসলামের সঙ্গে। আপনারা এখানে চলে আসুন। আমি পৌছে দেব।’

‘ঠিক আছে,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই। ‘আগামীকাল জামায়াতের মওলানা গফুরের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। তারপর না হয় চলে আসব এখানে।’

## ॥ ৬ ॥

আমেনা সাঈদের বাসায়ও সশন্ত্র প্রহরী। করাচীর বড়লোকদের বাসায় কমপক্ষে একজন সশন্ত্র প্রহরী থাকবেই। ক্লিফটন ছাড়া ডিফেন্সের প্রথম থেকে ঘঠ পর্যায় পর্যন্ত আবাসিক এলাকাগুলির প্রতিটি বাড়িতে সশন্ত্র প্রহরী, দেয়ালগুলি উঁচু, মনে হয়, বড়লোক হওয়া খুব সুখের নয়।

আমেনা তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে নিম্নরূপ জানিয়েছিলেন। ঢাকায় তিনি এসেছেন কয়েকবার, ঢাকায় অনেককে চেনেন। আমরা বলছিলাম, বেনজীর ভুট্টোর একটি সাক্ষাত্কার নিলে কেমন হয়? বেনজীর অবশ্য তাঁর বইয়ে লিখেছেন, তিনি তেমন কিছুই জানতেন না ১৯৭১ সম্পর্কে। তবুও দেখা যাক না কথা বলে। কিন্তু বেনজীর বিভিন্ন জায়গায় ঘূরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে পাওয়াই কঠিন। আমেনার ওপরেই আমরা এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করি। প্রকাশক হিসাবে অক্সফোর্ডের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে বেনজীরের। আমেনা জানালেন চেষ্টা করে দেখবেন।

রহিম সাহেব বললেন, ‘আমি আপনাদের জন্য ডিনারের আয়োজন করে ফেলছি। এখন বলেন, কাকে কাকে দাওয়াত দিই।’

‘যাকে খুশি’, জানলাম আমি, ‘করাচীতে আমার চেনাশোনা কেউ নেই।’

‘আমি, পাকিস্তানের তিন প্রাইম মিনিস্টারের বংশধরদের হাজির করব,’ ঘোষণা করলেন রহিম সাহেব।

‘এ ছাড়া ইন্টারেস্টিং আর কে হতে পারে?’

‘আচ্ছা, আমার স্যার আখতার হামিদ খানকে দাওয়াত দিলে কেমন হয়?’

‘এতক্ষণে আপনি একটা ভাল নামের উল্লেখ করলেন’, বললাম আমি, ‘আসলে তাঁর সঙ্গেই আলাপ করতে চাই, কিন্তু তিনি কী আসবেন?’

‘কুমিল্লার ভিট্টোরিয়া কলেজে উনি আমার প্রিসিপাল ছিলেন। আমার সঙ্গে সব সময়ই একটা যোগাযোগ ছিল। খুব মেহ করেন আমাকে। আমি বললে নিশ্চয় আসবেন।’

আখতার হামিদ খান কোরাসীতে কাজ করেন। ঐ অঞ্চলে তাঁর কাজ দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমাদের সময় এত কম, আর কাজ এত বেশি যে, কোরাসী প্ল্যানের বাইরে রাখতে হয়েছিল। কোরাসী যেতে না পারি কিন্তু তার রূপকারের সঙ্গে আলাপ করাটা কম কী?

আমেনা সাঈদের বাসার পাচক ও সাহায্যকারী দু'জনও বাঙালী। জিজ্ঞেস করলাম, ‘বাড়ি কই, নোয়াখালি?’

‘জু।’

‘কদিন হলো পাকিস্তানে?’

‘অনেক বছর।’

এদের পরিবার-পরিজন থাকে নোয়াখালিতে। অন্যান্য দেশে প্রবাসী বাঙালীরা যেভাবে থাকেন এবং জীবন যাপন করেন, এদের জীবন ধারণের প্যাটার্নও সেই রকম। টাকা জমাবার চেষ্টা করেন প্রাণপণে। কয়েক বছর পর পর কয়েক সপ্তাহের জন্য ফেরেন গ্রামে। এ এক অন্তুত জীবন, বিবাহিত অথচ বিবাহিত নয়, পরিবার আছে অথচ পরিবার নিয়ে বসবাস নেই। এটিকেই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে দু’ পক্ষ।

খাওয়া-দাওয়ার পরও আমরা কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। মুখ্য বিষয় : করাচীর ভায়োলেস। করাচীবাসীরা সবাই এতে আতঙ্কিত। রাতে প্রয়োজন না হলে কেউ বেরঙ্গতে চায় না। বিন্দুশালীরা করাচী ত্যাগ করছে। আসলে যে কোন বড় শহরে যে রকম ভায়োলেস থাকে, করাচীতেও তেমন আছে। তবে মোহাজেররা যে এলাকায় থাকে সে এলাকায় বেশি। তাই বলে করাচীর জীবনযাত্রা থেমে নেই। চলছে। আর শহরটা এত বড় হয়ে গেছে যে, নিয়ন্ত্রণে রাখাই দুঃসাধ্য। কোরাসীতে দু'জন খুন হলে ক্লিফটনে টের পাওয়া যায় না। তবে জাতিগত টেনশনটা থাকছেই এবং বাড়ছে।

আমরা যখন আমেনা সাইদের বাসা থেকে রওয়ানা দেই তখন খুব বেশি হলে রাত সাড়ে দশটা। কিন্তু এরি মধ্যে রাস্তাঘাট খালি হয়ে গেছে। দুপুরে দেখা শহরটা যেন বদলে গেছে নিমিষে।

॥ ৭ ॥

আহমদ গফুর জামায়াতে ইসলামের ভাইস প্রেসিডেন্ট। রবিবার দুপুরের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা। সকালটা কী করি? করাচীর দেখার আছে কী? এক সময় বোরাহ, মেমন, কাচি, পার্সি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন করাচীকে জমজমাট করে রেখেছিল। গড়ে তুলেছিল করাচী। ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। বলা হতো, সুয়েজ খালের পূর্বে করাচীই হচ্ছে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর। সেসব সম্প্রদায় এখন আর তেমন নেই। সেই মেট্রোপলিটন শহরের চরিত্রও অনেক বিনষ্ট হয়েছে। করাচীতে বাজার করার ইচ্ছা আমাদের কারও নেই, কারণ যা পয়সাকড়ি তা দিয়ে পুরো কাজ করতে পারব কী না সন্দেহ।

‘চলুন জিন্নাহ যাদুঘরটি দেখে আসি। আফটার অল তিনিও তো এক সময় আমাদের ফাদার অফ দ্য নেশন ছিলেন,’ প্রস্তাব করি আমি। ‘জিন্নাহর সমাধি আমি সেই ত্রিশ বছর আগে দেখেছি। এখন পারিপার্শ্বিক নিশ্চয় বদলেছে কিন্তু দেখার আর ইচ্ছে নেই।’

‘জিন্নাহ মিউজিয়াম চেন?’ পিটারকে জিজ্ঞেস করে আফসান। মাথা নাড়ে পিটার। ‘ঐ যে ফ্ল্যাগস্টাফ হাউস’, বলেন মহিউদ্দিন ভাই। পান চিবুতে চিবুতে ঘাড় চুলকায় পিটার অর্থাৎ সে জানে না।

‘জায়গাটা মোটামুটি চেনা’, বলে আফসান, ‘বেরুলেই চেনা যাবে।’

আমরা বেরিয়ে পড়ি। পিটারকে আবার জিজ্ঞেস করি, ‘কায়েদের মাজার চেন? তোমাদের জাতির পিতার সমাধি?’

মনে হলো না পিটার প্রশ্নটি বুঝল। মহিউদ্দিন ভাই জাতির পিতা প্রত্যয়টি তাকে শেখাবার চেষ্টা করলেন এবং কয়েকবার ‘কায়েদে আজম’ শব্দটি উচ্চারণ করলেন। আমরা খুব অবাক হই। করাচীতে গাড়ি চালায় সে, অথচ কায়েদে আজমের নাম জানে না বা জাতির পিতা নিয়েও কেয়ার করে না। আরও দু’একবার ব্যাখ্যা করার পর সে ব্যাপারটা বুঝল। তারপর বলল, ‘আরে ঐ কবরের কথা বলছেন তো। কী কাও বলুন। করাচীর মতো শহরে কী বিরাট এলাকা নিয়ে তাঁর কবর হয়েছে। কী দরকার ছিল এর? ঐ জায়গাটুকু পেলেতো গরিবদেরও উপকার হতো।’

এ কথার উত্তর দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। কিন্তু বোবা গেল, আমরা আজ যা খুব জরুরী বলে চিন্তা করি, পরবর্তী জেনারেশন তা নিয়ে চিন্তা নাও করতে পারে।

পূর্ববর্তী প্রজন্মের চিন্তা নিয়ে যখন পরবর্তী প্রজন্ম এগোয় বা চিন্তা করে সেটিই বোধ হয় তখন চিত্তিত হয় ‘ভিশন’ হিসাবে।

খানিক ঘোরাঘুরির পর পুরনো ফ্ল্যাগস্টাফ হাউস খুঁজে বের করি। জিনাহ কিছুদিন এখানে ছিলেন। না, জাদুঘর বক্স। আমরা ফের হোটেলের দিকে রওনা হই। পিটারকে দুপুরের খাবারের পর আসতে বলে সদরের কাছে নেমে পড়ি। ঠিক করি এক কাপ চা খাব। রেস্তোরাঁ খুঁজতে থাকি। সদর এলাকায় মাঝে মাঝে একই সঙ্গে চোখে পড়ে তিন চারটি বাড়ি, পুরনো। প্রতিটির আছে জাফরি কাটা বারান্দা। সিঙ্গুল সরকার আইন করেছে, এগুলো আর নষ্ট করা যাবে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রেস্তোরাঁ পাইনি। পরে এক ট্রাফিক পুলিশের শরণাপন্ন হই। তাঁর নির্দেশ ধরে এ রাস্তা সে রাস্তা খুঁজে সাধারণ একটা রেস্তোরাঁ খুঁজে পাই। পাশে একটি ধুলোপড়া বইয়ের দোকান। আগে হয়ত এলাকাটা জমজমাট ছিল। এখন পড়তির দিকে। মালিক সাধারে আমন্ত্রণ জানান। জেনারেল নিয়াজীর বইটি ভালভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। জিজ্ঞেস করি, ‘কেমন চলছে?’

‘খুব ভাল।’

অক্সফোর্ড নিয়াজীর বইটি প্রকাশ করায় পাকিস্তানের এলিট মহল খুব একটা খুশি হয়নি। প্রথমত অক্সফোর্ড এই প্রথমবারের মতো কোন বইয়ে উল্লেখ করেছে যে, লেখকের মতামতের সঙ্গে তাঁরা একমত নয়। পত্র-পত্রিকায়ও বিস্রূত সমালোচনা হয়েছে। আসলে ১৯৭১-এ পরাজয়ের জন্য পাকিস্তানীরা দায়ী করে নিয়াজীকে, তাদের পরাজয়ের প্রতীক নিয়াজী। সে আবার বই লিখেছে এবং তাতে সমালোচনা করা হয়েছে অনেকের, এটি কারও মনঃপৃত হচ্ছে না। তাতে অবশ্য অক্সফোর্ডের খুব বেশি কিছু একটা যায় আসে না। বই বিক্রি হলে কোন্ প্রকাশক না খুশি হয়।

রেস্তোরাঁয় বসে চা-সিঙ্গাড়া দিতে বলি। সঙ্গে সঙ্গে গরম সিঙ্গাড়া ভেজে দেয়া হয়। উপাদেয়। চা পান শেষ হয়। বেয়ারা বিল দিয়ে যায়। বিল দেখে চমকে উঠি-- সাতাশ টাকা! কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করি মহিউদ্দিন ভাইকে।

‘ঠিকই আছে, পাকিস্তানে দাম এ রকমই।’

আমি নাছোড়বান্দার মতো বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করি, ‘চা কত করে?’

‘প্রতি কাপ ছয় টাকা।’

‘এত অবাক হচ্ছেন কেন’, বলেন মহিউদ্দিন ভাই। ‘পাকিস্তানে তো চা হয় না। ইমপোর্ট করতে হয় আপনার দেশ থেকে। তা, আপনি ইমপোর্ট করলে চায়ের দাম ঢাকায় ছয় টাকাই হতো।’

॥ ৮ ॥

করাচী যে কত বড় তা টের পেলাম গফুর আহমদের বাসায় যাওয়ার সময়। গফুর জামায়াতে ইসলামীর ভাইস প্রেসিডেন্ট। থাকেন লালুক্ষেত। করাচীর বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও পিটারকে জেনে নিতে হলো লালুক্ষেতের নিশানা। তারপর পান মুখে দিয়ে বলল, ‘চলিয়ে সাব।’

তা আমরা চলছি। মাঝে মাঝে নজরে পড়ে রাস্তার মোড়ে ভাস্কর্যের মত জঙ্গী প্লেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লাহোরেও আছে। ঢাকা ও খুলনায়ও দেখেছি আইল্যান্ডের মোড়ে জঙ্গী প্লেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের এখানে এগুলি নিশ্চয় পৌর কর্পোরেশন বসায় নি। সেনাবাহিনীই বসিয়েছে। ঢাকা-করাচী দূরত্ব হাজার মাইলের ওপর। একটি দেশের সেনাবাহিনী শাসক, আরেকটি দেশের সেনাবাহিনীর জন্ম মুক্তিযুদ্ধের কারণে, অথচ এদের সংস্কৃতির মিল দেখে অবাক হতে হয়। একেই বোধ হয় বলা যেতে পারে কাকুল কালচার। আধুনিক শহরে যে জঙ্গী বিমান রাখা হয় না ভাস্কর্য হিসাবে এটি কে বোঝাবে! কারণ এগুলি অনাধুনিক, স্থুল রূপচির পরিচয়।

কত মাইল পেরিয়েছি জানি না। যতদূর যাই শহর। লালুক্ষেতের কাছাকাছি আসার পর বুঝলাম, এটি মূলত মোহাজেরদের এলাকা। লালুক্ষেতের একটি এলাকায় সরকার আবাসিক এলাকা গড়ে তুলেছে। অনেকটা ধানমন্ডির মতো। আহমদ গফুরের বাড়ি খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগল। আমরা তাঁর বাড়িতে পৌছলাম নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর।

গাড়িতে যেতে যেতে মহিউদ্দিন ভাই আমাকে সাক্ষাতকারের বিষয়টি বোঝাচ্ছিলেন। এর আগেও কয়েকবার আমাকে বলেছিলেন। মূল কথা হলো, আমার ভেতরে ক্রোধ থাকতে পারে, আবেগ থই থই করতে পারে, কিন্তু সাক্ষাতকার নেবার সময় তার কিছুই প্রকাশ পাবে না। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য সাক্ষাতকার নেয়া, তা ভঙ্গল করা নয়। বললেন, ‘জামায়াত শুনলে তো আপনি আবার ক্ষেপে যেতে পারেন। সুতরাং মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন।’

একদিক দিয়ে কথাটা হয়ত ঠিক। কারণ এ পর্যন্ত আমি কোন জামায়াতী নেতার মুখেমুখি হইনি। গবেষণার কারণেও নয়। গফুর আহমদের সাক্ষাতকার নিতে যাওয়ায় যে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল তাও নয়। কিন্তু আমাদের জানতে হবে কী ছিল তাদের চিন্তা-ভাবনা। কারণ ১৯৭১ সালে সারা পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর ছিলেন তিনি নেতা।

প্রহরী আমাদের নাম জেনে নিয়ে ভেতরে গেল। ফিরে এল তাড়াতাড়ি। গফুর আহমদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সৌম্য, শান্ত চেহারা, শিক্ষকের মত। তাঁর বাড়িটি বেশ বড়। বসার কামরাটি নিরাভরণ। এক কোণে কয়েকটি চেয়ার রাখা। বোঝা যায়, পার্টি কর্মীদের সঙ্গে তাঁর এখানেই দেখা-সাক্ষাত হয়।

মহিউদ্দিন ভাই যথারীতি আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেন, 'জনাব গফুর, এবার আপনি বলুন ১৯৭১ সালের কথা।'

'ঐ সম্পর্কে তো তেমন কিছু জানা নেই।'

'আচ্ছা, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াত নেতা গোলাম আয়মের সঙ্গে কি আপনার জান-পছান ছিল?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'গোলাম আয়ম?' তিনি শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। যেন নামটি প্রথম শুনছেন!

'তাঁর সঙ্গে পরিচয় নেই বলতে চান?'

'দেখুন,' বললেন শান্ত কণ্ঠে গফুর, 'দুই পাকিস্তানে তো অনেক নেতাকর্মী ছিলেন। আসা-যাওয়াও ছিল। দেখা হয়ত হয়েছে।'

'১৯৭১ সালের পর গোলাম আয়ম তো পাকিস্তান ছিলেন। ১৯৭১ সালের সময় নিয়মিত যাওয়া-আসা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে তা আপনাদের উনি জানান নি!'

'অনেক পুরনো ঘটনা, এখন এসব মনে নেই। তা ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর খুব একটা দেখা সাক্ষাত হতো বলেও আমার মনে পড়ে না।'

আমরা এমনটিই আশা করেছিলাম। ১৯৭১ সাল জামায়াত এড়িয়ে যেতে চাইবেই। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, 'আচ্ছা, ১৯৭১ সালের আগের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন?'

এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন গফুর আহমদ। বললেন, '১৯৬৯ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে দুই পাকিস্তানের ভূমিকা ভিন্ন কিছু ছিল না, বরং বলা যায় ছিল অভিন্ন। আইয়ুব খান মার্শল ল' জারি করার পর থেকে জামায়াত তার প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। আমরাও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন করেছি। তারপর এলেন ইয়াহিয়া। তিনিও আইয়ুব খানের মত একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন।'

'তারপর?' খেই ধরিয়ে দেয় আফসান।

'তারপর তো এল নির্বাচন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াত চারটি আসন পেয়েছিল। জামায়াত সব সময় পরিষদ বসার দাবি জানিয়েছিল কিন্তু ইয়াহিয়া অপটেড ফর আর্মি অ্যাকশন।'

এমন সময় তাঁর এক খাদেম চা-বিস্কুট-কলা নিয়ে এলেন। চা খেতে খেতে পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে খানিক আলাপ হলো। তিনি জানালেন, এক সময় তিনি এ এলাকা থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। আরেকবার পরাজিত হয়েছিলেন। মনে হয় না আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন। চা শেষ করেই মহিউদ্দিন ভাই প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কী হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, তা আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ,' জানালেন গফুর, 'আমরা শুনেছি ভারত ও অমুসলমানরা মিলে বিশ্বজ্ঞালার চেষ্টা করছিল। সেনাবাহিনী শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেয়েছিল।'

‘মৃত্যুর কোন ঘটনা ঘটেছে কি?’

‘হ্যাঁ, আমরা শুনেছি ভারত বলছে হাজার হাজার লোক সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি।’

‘পারেন নি,’ মনে হলো মহিউদ্দিন ভাইয়ের গলার স্বর খানিকটা উষ্ণ, ‘ইতিয়া করেছে, তা’হলে শেখ মুজিবুর রহমানের কোন ভূমিকা ছিল না সেই আন্দোলনে?’

‘হ্যাঁ ছিল,’ নির্বিকার কঠে জবাব দিলেন মওলানা গফুর। ‘শেখ মুজিব ছয় দফার মাধ্যমে পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিলেন।’

‘তা’ হলে বাংলাদেশের মানুষ কিছু চায়নি?’ মহিউদ্দিন ভাইয়ের স্বর আরেকটু উষ্ণ।

‘দেখুন, দিস ওয়াজ নট অ্যান আপরাইজিং অফ দি পিপল।’

‘তা’হলে কী ছিল সেটা?’ জিজ্ঞেস করে আফসান।

‘আমি মটের কর্পোরেশনে চাকরি করতাম ১৯৭১-এর আগে’, জানালেন গফুর, ‘সেই সূত্রে গিয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তান। তা সেখানে আমার বন্ধুরা জানিয়েছিল, পার্টিশনের পর হিন্দু শিক্ষকরা যায়নি পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে। শিশু-কিশোর মনের ওপর তাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। বিভেদের বীজটা তারাই বপন করেছিল।’

‘একেবারে জেনারেল উমরের মত কথা’, বিড় বিড় করে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘ঠিক আছে,’ বললাম আমি, ‘মেনে নিলাম। কিন্তু শেখ মুজিব তো ছিলেন মুসলমান এবং আপনিও স্বীকার করবেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান চেয়েছিল দেখে পাকিস্তান হয়েছিল। আপনার কথা সত্য হলে তো ইতিহাসের এই সত্য মিথ্যা বলতে হবে।’

‘পাকিস্তান আমরা সবাই চেয়েছিলাম,’ বললেন গফুর, ‘কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানীরা ন্যায় বিচার পায়নি। তাদের ওপর অবিচার করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শাসক আর আমলাদের ভূমিকা ছিল খারাপ।’

‘২৫ মার্চের পর বাংলাদেশে গিয়েছিলেন?’ জিজ্ঞেস করে আফসান।

‘যেতে চেয়েছিলাম, যাওয়া হয়নি।’

‘১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন উপনির্বাচন হয়েছিল। জামায়াত তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাই না?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘ঐ সময় উপনির্বাচনে জামায়াত দাঁড়িয়েছিল কিনা খেয়াল নেই।’

‘ঠিক আছে’, উত্তেজিত স্বরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানের পরাজয়ের কথা মনে আছে?’ বোৰা যাচ্ছে মহিউদ্দিন ভাই ঝুঁক হয়ে উঠেছেন। তাঁর চোখ দুঁটি বিক্ষেপিত। আমি আফসানের দিকে তাকালাম। সেও খানিকটা অবাক। নির্বিরোধী এই ভদ্রলোক চটে যাচ্ছেন কেন? তিনি না আমাদের চটতে মানা করলেন!

‘১৬ ডিসেম্বরের খবর শুনে আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল’, স্বীকার করলেন গফুর, ‘না, সেনাবাহিনীর জন্য নয়। পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল বলে। আমরা

তখন মনে করেছিলাম সেনাবাহিনী, আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির জন্যই পাকিস্তান ভেঙেছে।'

'তাহলে আপনার কথার সূত্র ধরে বলতে হয়,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, রাগত স্বরে, কিন্তু থেমে থেমে, 'এরা পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী অর্থাৎ মুজিব যেমন ইন্ডিয়ান এজেন্ট, ভুট্টোও তাহলে ইন্ডিয়ান এজেন্ট।'

'না,' বেশ স্পষ্টভাবে বললেন গফুর আহমেদ, 'মুজিব ইন্ডিয়ান এজেন্ট ছিলেন না।'

'জেনারেল উমর বলছিলেন,' বলল আফসান, 'পাকিস্তান ভাঙার জন্য আহমদীয়রাও নাকি ষড়যন্ত্র করেছিল।'

'আহমদিয়ারা ষড়যন্ত্র করেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।' বললেন গফুর, 'আমি আহমেদিয়াদের দোষ দিই না। পাকিস্তান ভাঙার জন্য মুজিব, ভুট্টো, ইয়াহিয়াই দায়ী।'

'আপনি কী জানেন,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, '১৯৭১ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে একটি লায়াবিলিটি তত্ত্ব চালু হয়েছিল। যে পূর্ব পাকিস্তান লায়াবিলিটি, ঐ অঞ্চল ছাড়াও পাকিস্তানের চলবে?'

'হ্যাঁ, এ ধরনের একটা কথা চালু ছিল বটে শাসক মহলে। পূর্ব পাকিস্তান বোৰা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আর্থিক দিকই নয়, অন্যদিকেও ছিল। তারা বেশি গণতান্ত্রিক। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো সেখানে ফিউডাল স্ট্রাকচার নেই যে সহজেই ম্যানপুলেট করা যাবে। এ ধারণাটা অনেকের মনে ছিল।'

'আচ্ছা,' জিজেস করি আমি, 'আপনি কী জানেন জামায়াত কর্মীরা যারা নাকি ছিল আলবদর তারা ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল?'

'১৪ ডিসেম্বর জামায়াত ঘটাতে পারে না।' দ্ব্যথহীনভাবে বললেন গফুর, 'যদি বলেন, জামায়াত আর্মির সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তা বিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু জামায়াত হত্যা করেছে এটা বিশ্বাস করা যায় না।'

'বিশ্বাস করা যায় না?' ক্ষুক স্বরে প্রশ্ন করলেন মহিউদ্দিন ভাই। মনে হচ্ছিল তিনি পাল্টা কিছু রুঢ় কথা বলতে চাইছেন। ঘরের আবহাওয়া বেশ টেন্স হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'বাংলাদেশের জামায়াত নেতারা যোগাযোগ রাখেন না আপনাদের সঙ্গে?'

'এই আর কী, জামায়াতের নেতারা আসে যায়, কথা বলে। এখান থেকেও যায়।'

'বাংলাদেশ ও পাকিস্তান কী তাহলে আবার এক হওয়া উচিত?' একটু খোঁচা মেরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'না, এক দেশ হওয়া সম্ভব নয়,' বললেন গফুর, 'কনফেডারেশন হয়ত সম্ভব। আমরা এমন কিছু চাই না যাতে বাংলাদেশীদের মনে কোন সন্দেহ জাগে। তারাই বলুক তারা কী চান?'

‘চলেন,’ আস্তে আস্তে বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘এরা কিছু বলবে না,’ বেশ বিরক্ত তিনি।

‘ঠিক আছে’, বলি আমি। তারপরই জিজ্ঞেস করি, ‘নওয়াজ শরীফ ঢাকায় বলেছেন ১৯৭০-এর নির্বাচনী রায় মেনে নিলে ইতিহাস অন্য রকম হতো, আপনার কী মত?’

‘হ্যা, আমিও নওয়াজ শরীফের বক্তব্য সমর্থন করি।’

‘জেনারেল নিয়াজীর বইটি পড়েছেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘কে, নিয়াজী? না’, এই প্রথম ক্ষুঁক্ষু স্বরে বললেন গফুর, ‘নিয়াজী বাঁচল কেন? ওর তো ওখানে মরে যাওয়া উচিত ছিল।’

‘দু’এক মিনিট নীরবতা। তারপর সৌজন্য জানিয়ে বিদায় নেয়ার পালা। গফুর আহমেদ আমাদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমি মহিউদ্দিন ভাইকে বললাম, ‘ঢাকা থেকে আমাকে উপদেশের পর উপদেশ দিয়ে এলেন। কিন্তু আজ হলো কী? নির্মূল কমিটির সদস্য আমি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আসলে কমিটির সদস্য হওয়া উচিত ছিল আপনার।’

॥ ৯ ॥

সুহায়েল আর ইয়াসমীন লারি অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। দু’জনই কাজ করছিলেন তাঁদের স্টুডিওতে। ‘পাকিস্তান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে’র অফিস হিসাবেও স্টুডিওটিকে তাঁরা ব্যবহার করেন। ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে আটটি প্রকাশনা করেছে। এই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সিঙ্ক্লু প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ইমারতসমূহের তালিকা প্রণয়ন শুরু হয়েছে। করাচীর কোন্সুল কোন্সুল অঞ্চল সাংস্কৃতিক পরিমগলের আওতায় আসবে তাও তাঁরা নির্ধারিত করেছেন। ফলে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু জিমখানা সংরক্ষণের জন্য সিঙ্ক্লু সরকার তা অধিগ্রহণ করেছে। ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এস্প্রেস মার্কেট, গার্ডেন মার্কেট সংরক্ষণ করার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে করাচী মেট্রোপলিটন কর্পোরেশন। আরেকটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে ফ্রেয়ার হল এবং গার্ডেনস রক্ষা করার। করাচী মেট্রোপলিটন কর্পোরেশনই তাতে সহায়তা করছে। সম্পত্তি তাঁরা একটি বড় ধরনের কাজে হাত দিয়েছেন, যা সমাপ্তির পথে। করাচীর বিভিন্ন এলাকার প্রাক ১৯৪৭ সালের বাড়িগুলির একটি সচিত্র তালিকা তাঁরা প্রণয়ন করেছেন। তালিকায় প্রতিটি বাড়ির বর্ণনা ও ঠিকানা দেয়া আছে। লাহোরেও তাঁরা একই ধরনের কাজে হাত দিয়েছেন। এ দ্রষ্টব্যের সবচেয়ে বড় কাজ ১৯৯৪ সালে সিঙ্ক্লু সরকারকে দিয়ে ‘কালচারাল হেরিটেজ (প্রিজারভেশন) এ্যাস্ট’ পাস করানো। এই আইন অনুযায়ী প্রাক

১৯৪৭ সালের কোন ইমারত অনুমতি ছাড়া কেউ সংস্কার বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারবেন না। গাড়ির মালিকরা, বলাই বাহ্ল্য, এতে অখুশি। কিন্তু বেঁচে গেছে করাচীর ঐতিহ্য। পুরনো করাচীতে ঘুরে বেড়ালে এখনও চোখে পড়বে পুরনো সব চমৎকার বাড়ি।

এসব কাজে আমার আগ্রহ অনেক দিনের। সময় থাকলে এ স্টুডিওতে একটি দিন কাটাতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম। ফাউন্ডেশনের প্রস্তাবনার একটি বাক্য আমার খুব ভাল লেগেছে। সেখানে বলা হয়েছে, পাকিস্তান হেরিটেজ ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে— “That historic building are a trust that we hold for future generations and as such they must be actively saved from destruction.”

লারি দম্পতির কাজ দেখতে দেখতে আর কারও না হোক, আমার খুব আফসোস লাগল। চোখের সামনে ঢাকা শহরের ঐতিহ্যবাহী ইমারত সব নষ্ট হয়ে গেল। এগুলো রক্ষার জন্য গত এক দশক আমি, শিল্পী হাশেম খান, স্টপতি রবিউল হুসাইন— কত আমলা, রাজনীতিবিদ, ধনাত্যদের দ্বারা নষ্ট হয়েছি! ফিরে এসেছি রিক্ত হাতে। ঢাকা শহরের ঐতিহ্যবাহী ইমারত রক্ষা পেলে যেন আমাদের ব্যক্তিগত লাভ হবে— এ ধরনের মনোভাব ছিল তাঁদের! কতটা বোধহীন আমাদের ক্ষমতাশালীরা!

সন্ত্য নামছে। ইয়াসমীন চা খাওয়ার অনুরোধ করলেন। ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়। সুহায়েল আবার যাবেন ক্লাবে। দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া কামার উল ইসলামের বাসায় গেলে নিচয় চা খাওয়াবেন। সুহায়েলের গাড়িতে আবার ডিফেন্সের বিভিন্ন পর্যায় ঘুরে কামার উল ইসলামের বাসায় পৌছলাম। সুহায়েল আর নামলেন না।

করাচীর অন্যান্য অভিজাত এলাকার বাড়িগুলির সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই এ বাড়ি। উঁচু দেয়াল, উঁচু ফটক। কলিং বেল টিপলাম। শান্ত্রী দরজার ফোকর দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করে ভিতরে নিয়ে গেল।

বকবকে বাড়ি। মার্বেল পাথরের মেঝে। ড্রাইং রুমটি জাপানী কারুকাজ করা কাঠের পার্টিশন, ছবি আর টেবিল ল্যাম্প দিয়ে সাজানো। আসবাবপত্রও দায়ী। মনে হয়, জাপানেও হয়ত তিনি দৃত হিসাবে কিছুদিন কাটিয়েছেন। সারা বাড়িতে কোন শব্দ নেই। হয়ত তিনি বিপজ্জনিক। ছেলেমেয়েরা বাইরে। নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। যেমন করছেন ধানমণি, গুলশানের অনেক সাবেক আমলা, ব্যবসায়ী।

বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন কামার উল ইসলাম। আমরা তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। তাই কুশল বিনিময়ের পর বললাম, ‘আপনার যা মনে হয় বলুন। সেই ১৯৪৭ সাল থেকেও শুরু করতে পারেন।’

থেমে থেমে বলতে লাগলেন তিনি। অতীত থেকে বর্তমান, আবার অতীতে ফিরে যাচ্ছিলেন। আমরা বাধা দিলাম না। তিনি জানালেন, আইসিএস পাস করে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়

আরও অনেকের মতো তিনিও অপশন দিলেন পাকিস্তানের পক্ষে। তাঁকে প্রথমেই পোষ্টিং দেয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানে। সানন্দে তিনি তা গ্রহণ করেন। ‘আমি পশ্চিম পাকিস্তানের টিপিক্যাল অফিসার ছিলাম না। আমি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম।’

প্রথমে তাঁকে এডিএম করে পাঠানো হয় ময়মনসিংহে। সেখানে থাকতেই তিনি ডিএম হন। এর কিছু দিন পর ঢাকায় তাঁকে বদলি করা হয় সচিবালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসাবে।

‘আচ্ছা, সে সময় কি পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান দ্বন্দ্ব আপনার নজরে পড়েছে?’ জিজ্ঞেস করল আফসান।

‘দল্দের বিষয়টি তখন তেমনভাবে নজরে পড়েনি’, বললেন ইসলাম। ‘কারণ আমি তো পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ই তুলে ধরতাম। তবে ঘটনা কিছু ঘটত। যেমন তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি আইয়ুব খানের সঙ্গে আমার বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। একটি মিটিংয়ে আইয়ুবসহ আমরা সবাই আছি। সরকারের সমালোচনা হচ্ছিল তখন, আর আইয়ুব কেন্দ্রীয় সরকারকে ডিফেন্ড করে উত্তর দিচ্ছিলেন। আমিও সমালোচনা করছিলাম। আইয়ুব, সবুর খানসহ পূর্ব পাকিস্তানের দু’একজন মন্ত্রীর সমালোচনা করছিলেন এবং এক পর্যায়ে বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের সব সমালোচনা আমাকে ডিফেন্ড করতে হচ্ছে। আমার সমালোচনা শুনে এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়ায় গওগোল আছে। লুক এ্যাট মাই গুড ফ্রেন্ড কামার উল ইসলাম। হি ইজ ইভেন মোর ভোকাল দ্য ইন্ট পাকিস্তানিস।’

পাটের উন্নয়নের জন্য জুট কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হলে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয় সে পদে। কিছু দিন এ পদে কাজ করার পর তাঁকে আবার ডিএম হিসাবে পাঠানো হয় খুলনায়। তিনি বছর পর করাচী ফেরত আসেন কেবিনেট বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি হিসাবে। কিছু দিনের মধ্যে জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়ে যান।

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর মোনেম খানের সঙ্গে একদিন তাঁর দেখা। ইসলাম যখন ময়মনসিংহের এডিএম ছিলেন মোনেম খান তখন সেখানে ওকালতি করতেন। তখন তাঁর সঙ্গে মোনেম খানের আলাপ হয়েছিল। মোনেম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমাকে চিনতে পারেন?’ কামার বললেন, ‘আপনি এখন গবর্নর। আপনি আমাকে চেনেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।’

মোনেম খান কামার উল ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসতে চাইলেন। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য কামার উল ইসলামের মতো অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন-এটাই ছিল মোনেম খানের বক্তব্য। কামার বললেন, ‘আমাকে তখন লাহোরে এডিশনাল চীফ সেক্রেটারি করতে চেয়েছিল। আমি বললাম, না লাহোরে যেতে চাই না। ঢাকায় যেতে চাই।’

‘কিন্তু কেন এত ভাল পদ ছেড়ে ঢাকায় আসতে চাইলেন?’ প্রশ্ন করলাম আমি।

‘কারণ’, জবাব দিলেন কামার উল ইসলাম, ‘পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ অফিসারের দরকার ছিল, যাঁরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি তৈরি করবেন। পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাররা তখন এসব বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। আমার মনে হয়েছিল সেখানে প্ল্যানিং বোর্ডের প্রধান হয়ে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের অফিসারদের অভিজ্ঞ করে তুলতে পারব।’ একটু থেমে বললেন, ‘চা না কফি?’

‘কোনটাতেই আপত্তি নেই।’ জানালাম আমরা।

তিনি উঠে ভিতরে গেলেন। ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পর। আলাপের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন।

‘আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করার সময় কখনও কি আপনার মনে হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘অবিচার?’ কিছুক্ষণ ভাবলেন কামার উল ইসলাম। ‘১৯৪৭ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তান এলাম তখন টিএম নুরুল্লাহী ছাড়া আমার সমমানের কোন বাঙালী অফিসার এখানে ছিলেন না। তবে অনেক আইপিএস অফিসার ছিলেন। যেমন, কেএম কায়সার, আনোয়ারুল হক। এর অর্থে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের কাউন্টার পার্ট কোন আইসিএস অফিসার ছিলেন না। সামাজিকভাবে অফিসারদের মধ্যে ইন্টার এ্যাকশন ছিল না। আজগর আলী শাহ ছিলেন আমার সিনিয়র। প্রথা অনুযায়ী আমি একদিন বিকালে গেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেখলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন। আমি শাহ সাহেবের রুমে চলে গেলাম। এমন সময় বেয়ারা এসে জানালো, শেখ মুজিবুর রহমান অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্য। শাহ বললেন, ‘অপেক্ষা করুক। হি হ্যাজ কাম ফর এ ফেভার।’ একথা বলছি এ কারণে যে, আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, দিস ওয়াজ দ্য কাইড অব বিহোভিয়ার অব দ্য অফিসার্স হুইচ ক্রিয়েটেড এ পলিটিক্যাল ব্যাকল্যাশ ইন ইন্ট পাকিস্তান।’ একটু থেমে বললেন, ‘সে সময় অবশ্য এর ইমপ্রিকেশন বুঝিনি।’

বেয়ারা কফির সরঞ্জাম নিয়ে এল। সঙ্গে হালকা নাস্তা। খেতে খেতে আমরা আলাপ করতে লাগলাম। তাঁকে কথার সূত্র ধরিয়ে দিতে হচ্ছিল। এক সময় বললেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের যে ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি, তা বুঝিনি। আমাকে সেসব বলাও হয়নি। আমি আমার মতো কাজ করে যাচ্ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য ইপিআইডিসি তখন সৃষ্টি করা হলো।’

‘কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়ও এ প্রসঙ্গ আসেনি?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘ডিগনামের মি. আহাদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ-পরিচয় ছিল। মাঝে মাঝে আসতেন, আলাপ-আলোচনা হতো। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, পশ্চিম পাকিস্তান ন্যায্য আচরণ করছে না পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে। পশ্চিম পাকিস্তানের অফিসাররা

সহানুভূতিশীল নয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি। আমি তখন এর গুরুত্ব অনুধাবন করিনি এ কারণে যে, আমি তো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'প্ল্যানিং বোর্ড থেকে আমি ফিরে আসি ইসলামাবাদে প্ল্যানিং কমিশনে। সেখানে কয়েক জন বাঙালী অর্থনীতিবিদও ছিলেন। ছিলেন ড. আখলাকুর রহমান। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু কখনও কোন বৈরিতা লক্ষ্য করিনি। তিনি কি বেঁচে আছেন?'

'না', বললাম আমি। কামার উল যেন কি ভাবতে লাগলেন।

'প্ল্যানিং কমিশনে তো তখন এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল', জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'হ্যাঁ, ১৯৭০-৭১ সালে আমি ছিলাম প্ল্যানিং কমিশনের সচিব। সে সময় এ কথাগুলি উঠেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না এবং পাটের টাকায় পশ্চিম পাকিস্তান গড়ে উঠেছে।'

'পূর্ব পাকিস্তানের অনেক প্রকল্প', বললাম আমি, 'প্ল্যানিং কমিশন পাস করত না।'

'না, ইচ্ছা করে এমন হতো বলে আমার মনে হয় না। আসলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তেমন ভায়াবেল কোন প্রজেক্ট আসত না।'

'এটা কি মেনে নেয়া সম্ভব যে, এত বছরেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন ভায়াবেল প্রজেক্ট আসেনি।' জিজ্ঞেস করি আমি।

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কামার উল ইসলাম। পানি খেলেন এক প্লাস। তারপর বললেন, 'এমএম আহমদ বলতেন, প্রজেক্টগুলো ভায়াবেল না।'

'আচ্ছা মি. ইসলাম', জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই, 'পূর্ব পাকিস্তানকে তখন কি আপনারা বোঝা হিসাবে ভাবছিলেন?'

'আমরা শুনেছি, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে একটি লায়াবলিটি তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছিল।' যোগ করে আফসান।

'হ্যাঁ,' যেন সম্বিত ফিরে পেলেন কামার উল ইসলাম, 'হ্যাঁ, এরকম কথাবার্তা তখন হচ্ছিল। কোন এক বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তানের গবর্নর কালাবাগের আমীর এ কথাটা তুলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান তখন পশ্চিম পাকিস্তানের বোৰ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। আইয়ুব খান সেটা পছন্দ করেননি। আইয়ুব খান, কালাবাগের আমীর ও এমএম আহমদ মনে করতেন, পূর্ব পাকিস্তানের আর দরকার নেই পশ্চিম পাকিস্তানের।' একটু থামলেন তিনি। যেন দম নিলেন। তারপর বললেন, 'তাই তাঁরা বলছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে আর কোন রাজনৈতিক ছাড় দেয়া যাবে না। কোরিয়ান যুদ্ধের কারণে পশ্চিম পাকিস্তান লাভবান হয়েছিল, উন্নতি হয়েছিল, ফলে এই চিন্তাটা এই মহলে ছড়িয়ে ছিল।'

আমরা কফি তৈরি করে নিই। কামার বললেন, তিনি পরে থাবেন। কফির কাপে আমরা নিঃশব্দে চুমুক দিই। কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে আসব, সেটা ভাবার চেষ্টা করি। কামার উল ইসলাম যেন আবার পুরনো প্রসঙ্গের খেই খুঁজে পান। বলেন, ‘আমি এস্টাবলিশমেন্টগুলি ছিল সব পশ্চিম পাকিস্তানে। এটাও ছিল ক্ষেত্রের কারণ। কারণ ক্যান্টনমেন্ট অনেক চাকরির সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা ছিল অনেক। ফলে অনেক চাকরির সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে ডিফেন্স বাজেটের প্রায় পুরোটা খরচ হতো এখানে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান এর বেনিফিট পেয়েছে।’ আসলে কথাটাতো ঠিকই। আমরা ঠিক ঐভাবে কথনও চিন্তা করিনি। এ কারণেই হয়ত সেনাবাহিনীর একটি সমর্থন গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে স্বৈরশাসন চালানো সহজ হয়েছিল। জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদও কি এই কারণে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন? নিজেকেই প্রশ্ন করি আমি।

‘তাছাড়া’, বলতে লাগলেন কামার উল ইসলাম, ‘পশ্চিম পাকিস্তানের যারা সেনাবাহিনীতে ছিল এবং সিভিল সার্ভিসে এসেছিল, তারাও পূর্ব পাকিস্তানকে খাটো করে দেখত। নিজেদের সুপরিয়ন্ত্রণ ভাবত।’

‘আচ্ছা, আমরা এবার ’৭০-এর নির্বাচনে ফিরে আসি।’ বললাম আমি, ‘৭০-এর নির্বাচনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এখানে?’

‘সতরের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না।’ জানালেন কামার উল ইসলাম।

‘আচ্ছা ২৫ মার্চ বা তার পরের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু বলুন’, আচমকা জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমি ঠিক তেমন কিছু জানি না।’ কফি ঢাললেন কাপে। ধীরে ধীরে চুমুক দিলেন।

‘কিছুই জানেন না?’ জিজ্ঞেস করল আফসান।

‘আমরা ছিলাম পরামর্শক। ঝুঁটিন কাজ করতাম।’

‘আপনি কি জানেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান?’ থেমে থেমে বললাম আমি। তিনি বিব্রত দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে, ‘আমরা আসলে কিছু জানতাম না। আমাদের সব রং ইনফরমেশন দেয়া হতো।’

‘আপনি পাকিস্তান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘এবং আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আপনি কিছু জানতেন না! এত বড় একটা গণহত্যা চলছিল...’ রেগে গেলেন মহিউদ্দিন ভাই। কথা শেষ করলেন না।

'আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম একবার মার্চের পর', বিব্রত কঠে বললেন কামার উল ইসলাম, 'জানতাম মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু ডিটেল কিছু জানতাম না।... এক্সকিউজ মি', বলে কামার উল ইসলাম উঠলেন, ভিতরে গেলেন এবং মিনিট পাঁচেক পর আবার ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ, তারপর আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'শুনেছি সেখানে খুব' কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। কফির কাপটা আবার হাতে নিলেন। চুমুক দিলেন। বললেন, 'এখন কি সব ভুলে যাওয়া যায় না?' যেন ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললেন আমার দিকে তাকিয়ে, 'আপনারা, আপনারা কি এখনও সব মনে রেখেছেন?'

'মি. ইসলাম', বললাম আমি, তাকালেন তিনি আমার দিকে, '১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা আমার শিক্ষকদের হত্যা করেছে, আমার বন্ধুদের হত্যা করেছে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের খুন করেছে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। আমার বা আমার জেনারেশনের পক্ষে কি তা ভোলা সম্ভব?' তাঁর হাত হঠাতে কেঁপে উঠল। কফির কাপটা নামিয়ে রাখলেন। 'না, আমাদের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।' শান্তভাবে কথা শেষ করলাম আমি।

## ॥ ১০ ॥

বছর খানেক হলো, ভুট্টোর ওপর রফি রাজার একটি বই বেরিয়েছে, নাম 'জুলফিকার আলী ভুট্টো অ্যান্ড পাকিস্তান। প্রকাশক অক্সফোর্ড। ঢাকায় বইটির কিছু অংশ পড়েছিলাম। যত্ন নিয়ে লেখা হয়েছে। রফি এক সময় খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন ভুট্টোর, মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তারপর পিপলস পার্টি অনেকবার ভেঙেছে। অনেক কুশীলব হারিয়ে গেছেন, রফি রাজাও। রাজনীতিতে যোগ দেয়ার আগে ছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। এখনও তাই।

রফি রাজার সঙ্গে দেখা করারও ইচ্ছে ছিল আমাদের। কারণ শুনেছি, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ভুট্টোর সঙ্গে তিনিও ছিলেন ঢাকায়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকারের সময় ঠিক করা হয়েছিল দুপুরের পর।

মহিউদ্দিন ভাই বলেছিলেন, আগে ক্লিফটনে যেখানে তিনি থাকতেন, তার উল্টো দিকেই ছিল রফি রাজার বাড়ি। এখনও তিনি ক্লিফটনেই আছেন, তবে ক্লিফটনের নতুন অংশে, নতুন বাড়িতে।

ঠিক সময়েই আমরা তাঁর উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে পৌছাই। শান্তী ভেতর থেকে খবর নিয়ে আসে আমরা যেতে পারি। আধুনিক বাড়ি, রুচিসম্ভাবে সাজানো। দেখেই ধারণা করা যায়, রফি রাজা পাকিস্তানী হলেও মনন পাশ্চাত্য যেঁষা।

রফি রাজার বই পড়ে তাঁর অবয়ব সম্পর্কে যে রকম ধারণা করেছিলাম, বাস্তবে তা মিলল না। ফিটফাট, নাদুন্দুস চেহারা। হাসিখুশি, খুব যে সিরিয়াসলি কথা বলেন তাও নয়। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর আমরা টেপ রেকর্ডার বের করছি, বললেন, ‘ওগুলি কি জন্য?’ আমরা জানালাম যাঁদের সাক্ষাতকার নিছি সবারটিই আমরা টেপ করে নিছি যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়, এমন কি টেপের একটি কপি চাইলেও আমরা তাঁকে দিতে পারি। তিনি কি টেপ করার অনুমতি দেবেন?

‘আসলে ১৯৭১ সাল, পিপিপি ও ভুট্টো সম্পর্কে আমার যা বলার ছিল, তাতো বইতেই লিখেছি। এর বাইরে আর বলার কি আছে?’

‘আপনার বই পড়েছি,’ জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘তারপরও এমন অনেক কিছু থাকতে পারে যা বইতে লেখেন নি।’

বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন রফি রাজা। বেয়ারাকে ডেকে চা দিতে বললেন, তারপর একটি ভঙ্গি করে বললেন, ‘না, টেপ থাকুক। আসুন আমরা এমনিই কথা বলি। পরে আপনারা আলাপের বিষয়বস্তু লিখে নিতে পারেন। আমাকে পাঠালে না হয় কারেক্ট করে দেব।’

‘বাদ দেন মহিউদ্দিন ভাই,’ বললাম আমি, ‘এমনিতেই আলাপ করুন।’ যদিও জানি মন্তব্যটা সাংবাদিকসূলভ হলো না।

‘ঠিক আছে, আপনি যখন ইনসিস্ট করছেন। তবে এ পর্যন্ত, আপনিই প্রথম যিনি রেকর্ডার ব্যবহার করতে দিলেন না।’

‘বাদ দিন, টেপে কি হবে? এমনিই আলাপ করি।’

‘আমরা এসেছি ’৭১ সাল নিয়ে আলাপ করতে। তা হলে সে প্রসঙ্গ নিয়েই শুরু করি,’ অখুশি স্বরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই। তাঁর অখুশি হওয়ার আরেকটি কারণ ‘বাঙালী’ শব্দের বদলে রাজা একবার তাছিল্যসূচক ‘বিংগো’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘১৯৭১ সালের ক্রাইসিসটা কখন শুরু হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমার মনে হয়,’ সিগারেটটা এ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখলেন রাজা, ‘মিলিটারি এ্যাকশন যখন শুরু হলো ক্রাইসিসটা শুরু হলো তখন থেকেই।’

‘এর আগে ক্রাইসিস ছিল না?’ জিজ্ঞেস করে আফসান।

‘এর আগে তো আলাপ-আলোচনা চলছিল।’

‘১লা মার্চ কি মনে হয়েছিল আর্মি ক্র্যাকডাউন করবে?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘অবশ্যই। আর্মি এ্যাকশন হতে পারে—এ চিন্তা মনে এসেছে, তবে যেভাবে হয়েছে বা ফলাফল তা ভিস্যুয়ালাইজ করিনি।’

‘পিপলস পার্টি কি এ বিষয়ে সচেতন ছিল?’ জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আসলে অনেক দিনের ঘটনা,’ বললেন রফি রাজা। ‘পিছনের কথা চিন্তা করলে উত্তর দেয়া কঠিন। পার্টি সচেতন ছিল কি ছিল না, তা বলা মুশকিল। তবে এটা বলা

যায়, ভাবা হয়েছিল, আর্মি এ্যাকশন হলে ‘বিংগোরা’ টিকবে না। তবে এমনটি হবে তা ভাবিনি। আসলে একটি ঘটনার ফলাফল কি হতে পারে, শুরুতে তা বোঝা দুষ্কর। নিন চা নিন।’

বাঙালীর বদলে ‘বিংগো’ শব্দটি আমাদের কারই পছন্দ হয়নি। প্রতিবাদ জানালাম না। হয়ত মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও এ শ্রেণীর মানুষজন কী চোখে বাঙালীকে দেখে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চা খেতে খেতে রাজা বাংলাদেশের দু’একজনের কথা জিজ্ঞেস করলেন যাঁদের তিনি চেনেন। চা পর্ব শেষ হলে আরেকটা সিগারেট ধরালেন। আমাদেরও অফার করলেন। আমরা জানালাম, না, সিগারেট খাব না।

‘ইয়াহিয়া তো মনে হয় ক্ষমতা হস্তান্তরে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু লারকানায় ভুট্টোর সঙ্গে শিকারে গিয়ে মত বদলে ফেললেন কেন?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘অনেকটিলি লারকানা মিটিং সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।’

‘আপনি ভুট্টোর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন।’

‘ছিলাম, কিন্তু জানি না সেখানে কি আলোচনা হয়েছিল। পরে মমতাজ ভুট্টোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও বললেন, কিছু জানেন না।’

‘আচ্ছা, একজন আইনবিদ হিসাবে বলুনতো, মুজিব মেজরিটি পেয়েছিলেন। ভুট্টো তা মানতে রাজি ছিলেন না।’ জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘তিনি মুজিবের সঙ্গে ঠিক কি ধরনের আভারস্ট্যাভিং চাচ্ছিলেন?’

‘প্রথমত, একটা ধারণা ছিল দু দফা পাকিস্তান ভেঙ্গে দেবে।’

‘ভুট্টো তো বলেছিলেন দু দফার ৫ $\frac{1}{2}$  দফা মানা যায়, মেনে নেবেন। গণগোল  $\frac{1}{2}$  দফা নিয়ে। সেই আধা দফা কি?’

‘আসলে সিক্স পয়েন্ট মেনে নিলে সেন্টারের কি হবে, তা আমরা জানতাম না। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি হতে ফিউচার কনস্টিউশনাল এ্যাসেম্বলি। ধারণা ছিল সিক্স পয়েন্ট মানলে ইষ্ট পাকিস্তান ডিমিনেট করবে। কনস্টিউশন এ্যাসেম্বলিতে তা পাস হলে ইষ্ট পাকিস্তান পার্মানেন্টলি ওয়েষ্ট পাকিস্তানকে ডিমিনেট করবে। ভুট্টো কিন্তু কখনও পাওয়ার শেয়ারিং-এর কথা বলেননি। কারণ তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, পাঞ্জাবে তিনি মেজরিটি পেয়েছেন।’

‘ভুট্টোর বই ‘প্রেট ট্র্যাজেডি’-তে যা বলা হয়েছে এখনও তা মেনে নেবেন?’ জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘মোর অর লেস’, নির্বিকারভাবে উত্তর দেন রাজা, ‘দেশে একটি গৃহযুদ্ধ চলছে। সে সময় বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মৌলিক থাকতে পারে।’ ভুট্টো কি কখনও পূর্ব পাকিস্তানে আর্মি এ্যাকশনের বিরুদ্ধে বলেছেন? না বলেন নি। ‘তিনি ইয়াহিয়াকে বরং এ কাজে উৎসাহিত করেছেন।’

‘ইষ্ট পাকিস্তান লায়াবলিটি ছিল, সুতরাং তা না থাকলেও চলে...’ মন্তব্য করল আফসান।

‘কারও কারও তা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হতেও পারে। শুনেছি, জেনারেল গুল হাসান বলতেন, ইষ্ট পাকিস্তান যেও না। ইটস এ ডেড কেস।’

‘ইলেকশনের আগে’, বললাম আমি, ‘জেনারেলরা বলত আওয়ামী লীগ মেজরিটি পাবে না এবং যাতে না পায় সেজন্য তারা জামাত, মুসলিম লীগকে পয়সা দিয়েছে। যদি তা না হয় সেজন্য বোধ হয় গণহত্যাটা বিকল্প বা কনটেনজিনসিসি প্ল্যান ছিল।’

‘হতে পারে’, একটু ভেবে বললেন রাজা। ‘তবে, ব্যাপারটা একেবারে প্রি-কনসিভড ছিল এমন বলব না, হয়ত দে স্টামবল্ড। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এখানকার কোন পলিটিক্যাল পার্টি ঢাকায় গিয়ে বলেনি, ইয়াহিয়া যা হচ্ছে তা থামাও।’

‘২৫ মার্চ যখন ঢাকা ছাড়লেন, তখন জানতেন ঢাকায় কি হচ্ছে?’

‘না।’

‘না, মানে!’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আপনি, ভুট্টো সব এক সঙ্গে প্রেনে চেপে ঢাকা ছেড়েছেন।’

‘না, আমি জানতাম না কি হচ্ছে। হয়ত ভুট্টো জানতেন,’ মুখের ভাব একটুও বদলাল না রফি রাজার। ‘জেনারেল ইয়াকুব এখন হিরো সাজছেন। বলছেন যে ঐ সময় রিজাইন করেছেন। কোথায় রিজাইন করেছিলেন? আসলে সবাই ভেবেছিল, ইয়াহিয়া ক্ষমতায় যাওয়ার পর সব শান্ত হয়ে আসবে। তবে মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে যেসব হরতাল হয়েছিল সেগুলি সবাইকে স্তুতি করে দিয়েছিল।’

‘আমাদের জেনারেল উমরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনিও ছিলেন ২৫ মার্চ ঢাকায়। তিনিও বললেন কিছু দেখেন নি।’

‘হ্যাঁ, এখন সবাই তা বলবে’, সবজাত্তা হাসি হাসলেন রাজা, ‘আমরা তখন প্রেনের ভেতর বসে আছি। উমর চুকল প্রায় সবার শেষে বেশ ভাব নিয়ে, যেন বেশ কিছু একটা করে এসেছে। কারও সঙ্গে কথাও বলল না এমন কি ভুট্টোকে দেখেও মনে হলো না তাঁকে চেনেন। উমর অবশ্যই ইনভলভড ছিল। সব জেনারেল এখন দায়-দায়িত্ব অস্থীকার করছে।’ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আরেকটা সিগারেট ধরালেন রাজা, ‘শোনেন, ২৬ মার্চ নিয়েতো ডিসএ্যাগ্রি করার কিছু নেই। উমর যদি ২৬ মার্চ না চাইত তা হলে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে আলাপ করত। ঐ যে আপনাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন! কি যেন নাম, হ্যাঁ, বিচারপতি সাত্তার, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কয়েকবার বলেছেন, আমি ঢাকায় ফিরে যেতে চাই। আমার দুই মেয়ে আছে সেখানে। ঢাকায় আমি শান্তিতে মরতে চাই।’

‘১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে রুলিং ক্লাসের ধারণা বোধ হয় খুব ভাল ছিল না।’ জিজেস করে আফসান।

‘হঁয়া, তা বলতে পারেন’, ক্যাজুয়ালি উত্তর দিলেন রাজা, ‘ইষ্ট পাকিস্তানীদের তাচ্ছিল্যভরেই দেখত কুলিং ক্লাস। ভাবত, সেখানে হিন্দুরা ডমিনেট করছে। বেসিক্যালি হিন্দুদের সঙ্গে ইষ্ট বেঙ্গলিদের এক করেই দেখা হতো।’

‘আচ্ছা,’ জিজ্ঞেস করি আমি, ‘৯টি মাস গণহত্যা চলল। আপনারা পাওয়ারফুল, শিক্ষিত, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আপনারা সবাই বলছেন কি হয়েছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানে জানতেন না—এর মানে কি?’

মুহূর্তখানেক চুপ করে থাকলেন রফি রাজা। এতক্ষণ কথার পিঠে কথা বলে চলছিলেন। সিগারেটের ছাই ফেললেন। তারপর উত্তর দেয়ার জন্য যেন মন ঠিক করে ফেলেছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, ‘উই ডিউনট ওয়ান্ট টু নো অর উই ডুনট নো—যেভাবেই নেন। পিপলস পার্টির লোকেরা ভেবেছিল, আর্মি এ্যাকশনের পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেঙ্গলিস কুড় বি সট্টেড আউট। কিন্তু হয়নি। হয়ত জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে গোপন আঁতাত ছিল, যা পিপিপি’র কেউ জানত না এবং এ ঘটনায় নো বডি ইন দ্য আর্মি রিহোটেড ইট।’ তারপর যেন আপন মনেই বললেন, ‘উই হ্যাভ এ ভেরি ক্রটালাইজড সোসাইটি আফটার দ্যাট।’

॥ ১১ ॥

এম বি নকভীর বাসা সদর থেকে বেশ দূরে। সকাল সাড়ে ন’টায় পিটার গাড়ি নিয়ে হাজির। নকভীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতকার দশটায়। পিটারের হাতে ঠিকানা গচ্ছিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসি। গত কয়েক দিনের কাজের বিষয় আলোচনা করি। মনে হলো, ‘কাজের বিনিয়য়ে খাদ্য’ কর্মসূচীর অধীনে কাজ করে যাচ্ছি। সকালে বেরঞ্চি, ফিরতে ফিরতে গভীর রাত। সাক্ষাতকারের বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমায় কাজ করতে গেলে বেশ অসুবিধা হয়। অচেনা শহরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌছতে সময় লাগে বেশি। যাঁর সাক্ষাতকার নেব, তাঁর সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পরও তিনি বলতে পারেন, আজ নয় কাল। তার ওপর আছে মুড়ের ব্যাপার। আমরা হিসাব করে দেখলাম, না, আমরা এখনও ব্যর্থ হইনি। ব্যর্থ হতে পারি একমাত্র বেনজীর ভুট্টোর ক্ষেত্রে। এখানে এসে আমরা ঠিক করেছি, বেনজীরের সাক্ষাতকার নেব। কিন্তু তাঁর সময় পাওয়া কঠিন। প্রচুর লোক বসে আছে তাঁর সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য। আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করছি। পারিনি, বেনজীর করাচীর বাইরে।

দশটা প্রায় বাজে। ষাটের দশকে গড়া নাজিমাবাদ আবাসিক এলাকায় পৌছে গেছি, কিন্তু নকভীর বাসা খুঁজে পাচ্ছি না। এম বি নকভী পাকিস্তানের প্রথম সারির

সাংবাদিকদের একজন। ঢাকার মর্নিং নিউজে কাজ করেছেন। শহীদুল্লাহ কায়সার, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রযুক্তের ছিলেন সহকর্মী ও বক্তু। এখন সক্রিয় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত নন কিন্তু কলাম্বিট হিসাবে পাকিস্তানে তিনি খ্যাতিমান। আমিনা আমাদের বলেছিলেন, নকভীর সঙ্গে আলাপ করতে। কারণ খোলামেলা সত্য কথা যদি কেউ বলেন, তা হলে এই নকভীই বলবেন।

পিটার বিভিন্ন জায়গায় থেমে থেমে ঠিকানা খুঁজছে। আমাদের এ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পেরিয়ে গেছে। রীতিমত হতাশ বোধ করছি। করাচী যে এত বড় শহর তা আগে কল্পনা করিনি। এবং আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, শহরটি তো চলছে, ভালভাবেই চলছে, ঢাকা থেকেও। অনেক আশা ছিল মেয়র হানিফকে নিয়ে, কিন্তু তিনি অনেক আকাঙ্ক্ষাই আমাদের পূরণ করতে পারেন নি।

আমাদের রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে আসার পর একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করছি, তাহলো তাঁদের ভিশনের অভাব। ইনোভেটিভ কোন উদ্যোগও তাদের নেই। সব কিছু তাঁরা এডহক ভিত্তিতে করতে চান।

এক ঘণ্টা লেট হলো। ভেবেছিলাম নকভী বেরিয়ে গেছেন। না, তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এলাকাটা আমাদের মোহাম্মদপুরের মতো। বাড়িগুলোর ধরনও তাই। ফটকে কোন সান্ত্বি নেই। কাজের ছেলে এসে দরজা খুলে দিল। একতলা সাধারণ বাড়ি। সামনে কয়েক ফুট লন। বারান্দা।

এম বি নকভী সন্তুর পেরিয়েছেন। শীর্ণকায় কিন্তু ঝজু। আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসালেন সাদামাটা বসার ঘরে। দেখেই বোৰা যায়, কোন রকমে ধারকর্জ করে বাড়িটা করেছিলেন বটে, কিন্তু এখন 'দিন আনি দিন খাই'র মতো অবস্থা। কুশল বিনিয়য়ের পর নানা কথা আলোচনার ফাঁকে জানা গেল, আমাদের ধারণাটা মিথ্যা নয়। 'ডনে' তিনি কলাম লেখেন। এটিই তাঁর রোজগার। সংসারের ভার তাঁকে বহন করতে হচ্ছে। বোৰা গেল সাংবাদিকতা করেছেন বটে কিন্তু পেশা ব্যবহার করে টাকা করেননি।

নকভী বললেন, আলোচনা শুরু করার আগে চা-টা হয়ে যাক। চা আসার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রকল্পের বিষয়টি খুলে বললাম। মনে হলো, তিনি বেশ উৎসাহিত। চা এল। সঙ্গে এক প্লেট সাধারণ বিক্ষিট। চায়ে ভুবিয়ে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। আসলে নকভীর বাসায় আমরা এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলাম।

চা পর্ব শেষ হলে নকভী গুছিয়ে বসলেন। বললেন, 'কীভাবে শুরু করব?'

'আপনি যেভাবেই শুরু করেন আমাদের কোন আপত্তি নেই।' বলল আফসান।

'আচ্ছা', বললাম আমি, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানসিক পার্থক্য ধরে এগুলে কেমন হয়?'

‘মন্দ নয়’, বললেন নকভী। এবং তারপর ধীরভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে লাগলেন। পারতপক্ষে আমরা আর কথা বলিনি। কারণ দরকার পড়েনি। নকভী জানালেন, ভারতবর্ষে মুসলমানদের বৈচিত্র্য থাকলেও (একেক অঞ্চলের মুসলমানের জীবনচর্চা ছিল একেক রকম) তারা এক নেতৃত্বের নিচে সমবেত হয়েছিল এবং ভারত বিভাগে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু তারপরও তারা একত্রে থাকতে পারেনি। থাকা যে যাবে না সেটা গোড়া থেকেই অনুভব করা যাচ্ছিল। ‘গোড়ার কথাই ধরুন’, বললেন নকভী, ‘পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী প্রথা বিলোপ করল। পশ্চিম পাকিস্তানে হলো এর বিরুপ প্রতিক্রিয়া। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের সাংসদদের অধিকাংশ ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার। তাদের মনে হলো বাঙালীরা তো ভয়ঙ্কর। তারা জমিদারদের মানে না। মানা তো দূরে থাকুক, তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেয়। তাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া যাবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা ছিলেন ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ভূস্বামী। এরা দখল করেছিলেন মুসলিম লীগ এবং সরকার ও দলকে সমর্পণ করেছিলেন আমলাতত্ত্বের কাছে। আমলাতত্ত্বের সঙ্গে এঁদের ছিল সুন্দর সম্পর্ক। এখানকার ভূস্বামীদের পূর্বপুরুষরা ১৮৫৭ সালের পর ইংরেজ আমলা বা জেনারেলদের কাছ থেকে জমিদারিগুলি পেয়েছিলেন উপহার হিসাবে। সুতরাং আমলাদের তাঁরা দেখেছেন *mentor and guide* হিসাবে।’

‘আমাদের ওখানে তো এমনটি হয়নি।’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘না, তা হয়নি,’ বললেন নকভী, ‘পাকিস্তানের প্রথম ১১ বছর সমস্ত কিছু কুক্ষিগত ছিল এই কোটারির হাতে। যত গণতন্ত্রের কথাই বলেন না কেন, ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক ছিলেন এরা এবং যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন তাঁরাও ম্যানুপুলেটেড হয়েছেন। এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিন সবার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।’

একটু দম নিলেন নকভী, কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, ‘আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর ঘাটের দশকেই বোধ হয় প্রথম বড় ধরনের পরিবর্তনটা আসে। বাঙালীরা নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের আর কখনই ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে হয়েছিল, “*It was a further evolution of the ruling coterie.*”। জেনারেল ভাবলেন, বেসামরিক আমলারা বহুদিন বন্দুক চালিয়েছে। কিন্তু আসল ক্ষমতা তো আমাদের হাতে, সুতরাং আমরাই ক্ষমতা ভোগ করব।’

‘তারপর?’

‘সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল থেকে সঙ্কটের শুরু। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সেই সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করল মাত্র। ১৯৬৫ সালের নবেন্দ্রে সংসদে নুরুল আমীনের মতো রাজনীতিকের বক্তৃতা শুনলেও তা অনুভব করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান একেবারে অরক্ষিত ছিল এবং শাসকদের তা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না।’

‘অথচ’, বলি আমি, ‘পাকিস্তান রক্ষার জন্য আন্তরিকভাবেই বাংলালী সেনারা যুদ্ধ করেছে, বুদ্ধিজীবীরা প্রচার চালিয়েছে।’

‘অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও’, বললেন নকভী, ‘একটি পরিবর্তন এসেছিল। ঐ সময় ত্রৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। এবং তখনই বাংলালী অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে এখানকার আমলাতত্ত্বের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। ঐ সময় আমি এ বিষয়ে কিছুটা খোঁজ-খবর নিয়েছি। পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতত্ত্বের কামার উল ইসলাম, মাহবুবুল হক প্রমুখ যাঁরা তখন জুনিয়র, ঠিক করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ১০০ কোটি টাকার সম্পদ স্থানান্তর করবেন। সিদ্ধান্তটি ছিল পরিকল্পনা কমিশনের কিন্তু কার্যকর হয়নি। বাংলালী অর্থনীতিবিদরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন, বললেন পাটের টাকা দিয়ে করাচী গড়া হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান সব সময় পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছে এবং ১৯৪৭-এর পর প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।’

‘কথাটা বোধ হয় খুব অতিরিক্তও নয়’, বললাম আমি।

‘অতিরিক্ত না কি ঠিক, সেটি ডিটেলের ব্যাপার, তার মধ্যে আমি যাব না।’ বললেন নকভী, ‘কিন্তু এরপরই পশ্চিম পাকিস্তানের কোটারির মধ্যে নতুন চিন্তা এল যা তারা ফ্রিলি এ্যাডভোকেট করতে লাগল।’ নকভী জোর দিয়ে বললেন, I am using the word 'advocating'. West Pakistani members of the Planning Commission and other leaders of bureaucracy were now advocating that we should now get rid of Bengalis কেন? কারণ এদের জনসংখ্যা বাড়ছে, সে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হবে এখানে; আমাদের যা উদ্ভৃত তা তারা শেষ করে ফেলবে। এরা আমাদের ভার স্বরূপ। এ বোঝা টানার দরকার কী? সময় বুঝে ফেলে দাও। সুতরাং ১৯৭১ *did not come from heaven.*”

এ মনোভাবটা গোড়া থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল। পরে বিভিন্ন জনের সাক্ষাতকারেই তা প্রমাণিত হয়েছে। নকভী জানালেন, ষাটের গোড়ার দিকে অস্ট্রেলিয়ান অর্থনীতিবিদদের একটি গ্রুপ এসেছিল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করতে। তাঁদের মতামত ছিল, কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্ভাবনা অপার। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিতে বিনিয়োগ করা হোক আর পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে তোলা হোক শিল্প। কিন্তু কি হলো শেষে? নকভী বললেন, ‘চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তখন অর্থমন্ত্রী। তিনি আমার বন্ধু নাজিউল্লাহকে বলেছিলেন, পূর্ব বাংলায় কেন শিল্প গড়ব? It is bound to go away. We will keep the industry in West Pakistan। এটি ১৯৫৫ সালের ঘটনা।’

‘আমরা শুনেছিলাম’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘পরবর্তী সময়ে কামার উল ইসলাম, এমএম আহমদরাও এই তত্ত্ব বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।’

‘আসলে সময়ের কারণে নাম মনে থাকে না’, বললেন নকভী। ‘দুটি নাম আমার ভালভাবে মনে আছে, একজন এমএম আহমদ, অপরজন কামার উল ইসলাম। তবে তাঁরাই যে বিশিষ্ট ছিলেন তা নয়। আইয়ুব খানের ‘নবরত্ন’রা সবাই এই ঘড়্যন্ত্রে জড়িত ছিলেন, দেখুন the bureaucracy operates as a very closely knit thing.’।

‘১৯৭১-এর কথা বলছিলেন জনাব নকভী।’ খেই ধরিয়ে দেয়ার জন্য বলল আফসান।

‘১৯৭১-এর আগে আরেকটি ব্যাপার ঘটেছিল,’ বললেন নকভী, ‘এখানে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, বাঙালীরা হিন্দুঘৰ্ষে। তাদের ভাষা সংস্কৃতের কাছাকাছি। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের মাখামাখি বেশি, সুতরাং, তারা নিখুঁত মুসলমান নয়। আর যারা সাক্ষা মুসলমান নয় তাদের সমানভাবে দেখার কোন প্রশ্নই আসে না। ইমেজটি কেমন, মানে আমি ভালভাবে বোঝাতে পারছি না। It disposed them as an adversarial role and saw them as antagonists, as virtual enemies, I did not say actual but virtual.’

একটু দম নিলেন, বললেন, ‘চা চলবে আরেক কাপ।’

আপত্তি নেই জানালাম আমরা। অনেকক্ষণ ধরে একটানা কথা বলছেন তিনি, একটু বিশ্রাম দরকার। নকভী চায়ের কথা বলতে ভিতরে গেলেন। সাক্ষাতকারটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল কারণ তিনি খোলাখুলি সব বলছিলেন, গুছিয়ে। নকভী আবার ফিরে এলেন। দু’দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করলাম। খানিক পর নকভীর নাতনি চা আর বিস্কুট নিয়ে এলেন। ধীরে সুস্থে আমরা তা শেষ করলাম।

‘শুরু করা যাক,’ টেপ রেকর্ডারের বোতাম টিপে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমরা সরাসরি ১৯৭১-এ চলে আসি,’ বললাম আমি, ‘আপনারা কী জানতেন, কী হচ্ছে তখন পূর্ব পাকিস্তানে? অনেককে আমরা এ প্রশ্ন করেছি। সবাই বলছেন তাঁরা কিছুই জানতেন না।’

‘এটি একটি মিথ’ একটু রাগত স্বরে বললেন নকভী, ‘ঐ সময় ট্রানজিস্টর বিপ্লব সমাপ্ত হয়েছে। গ্রাম পর্যন্ত চলে গেছে ট্রানজিস্টর। আমাদের কী বিশ্বাস করতে হবে এ ভূখণ্ডে কেউ অল ইভিয়া রেডিও, বিবিসি, রেডিও ইরান বা কাবুল শোনেনি? সব রেডিও থেকেই তো তখন ১৯৭১-এর ঘটনাবলী প্রচারিত হয়েছে। এ সব রাবিশ কথাবার্তা। সবারই কিছু না কিছু ধারণা ছিল। তাছাড়া পাঞ্জাবের অনেক পরিবার নিয়মিত মানি অর্ডার পাচ্ছিল। ঐ সময় একজন সিপাই কত পেত? ১০০, ২০০ বা ৩০০ টাকা। কিন্তু গ্রামে সে পাঠ্যছিল ৫০০ বা ৬০০ টাকা। এ বাড়তি টাকা কোথেকে আসছিল? তার তো ঘুমের বন্দোবস্ত ছিল না! পাকিস্তান সরকার সৃষ্টি করেছে এ মিথের।’

জেনারেল নিয়াজীর বইয়ের প্রসঙ্গ এল তারপর। এ বই নিয়ে তখন বেশ বিতর্ক চলছে। বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া হবে কী হবে না, সে নিয়েও পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। ‘এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘পাকিস্তানী বাহিনী ছিল,’ অকস্মিত স্বরে বললেন নকভী, ‘বিশুর্ঘল, লুটেরা বাহিনী, এরা লুট করেছে, ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব রকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের মন্তব্য। ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন লুট, ধর্ষণ, হত্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরিক্ত। মাত্র তিনি হাজার, মাত্র তিনি হাজার মহিলা ধর্ষিত হয়েছে!’ ক্রেতে নকভীর গলার স্বর কাঁপছিল, ‘এখন টিক্কা, ইয়াহিয়া, নিয়াজী, ভুট্টোর ওপর দোষ চাপানো হচ্ছে, আসলে দেশটির চরম অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ কাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। সবাই এর সঙ্গে জড়িত। If ever there is any debate in the world about how much economic motivation can decide human affair, Pakistan's case can be cited as a great example where perceived economic interest decided every thing'।

‘আমাদের সঙ্গে আলোচনায় অনেকে বলছিলেন, পাকিস্তান একটি ইসলামী দেশ, ইসলামকে রক্ষা করা পাকিস্তানের কর্তব্য। বাঙালীরা ইতিয়া বা হিন্দুয়েষা-এ ধরনের একটা যৌক্তিক ভিত্তি অনেকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন ১৯৭১ সম্পর্কে।’

‘ছয় সাত শ’ বছর ধরে আমরা হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করেছি’— জানালেন নকভী। ‘যখন মুসলমানরা ঠিক করল হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে না, তারা ঘর ভাগাভাগি করে নিল। স্বাধীনতার পর যখন তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন কিভাবে সেকেন্ড গ্রেড হিন্দু এজেন্টদের দ্বারা প্রভাবিত হবে? এগুলি বকওয়াজ, শাসকদের প্রচার। ১৯৯৬ সালে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম এবং তখন বিএনপি’র একজন মন্ত্রীর ভাষা আমাকে অবাক করেছিল। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন। এবং তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন এবং যে ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন সে ভাষা ১৯৭১ সালে আমি পাকিস্তানীদের মুখে শুনেছিলাম।’

‘১৯৭১ সালে কী আপনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি, ‘কোন ঘটনা মনে পড়ে?’

‘হ্যাঁ, এখান থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক তা বোঝাবার জন্য। শুধু বলতে পারি, worse in humanity was visited upon the Bengalis। একটি ঘটনার কথা বলি। আমাদের তথাকথিত একটি রিফুজি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে রাখা হয়েছিল বিহারীদের। একজন পাঠান কর্নেল ছিলেন ক্যাম্পের কমান্ডার। বিহারীদের ওপর বাঙালীদের অত্যাচারের অনেক কথা শোনানো হলো। কমান্ডার বললেন, এ সব কথা শুনতে যখন আমার রাগ

লাগে, ক্লাস্ট লাগে তখন থামে গিয়ে কিছু মানুষ মেরে আসি।' নকভীর গলার স্বর  
কাঁপতে লাগল আবেগে, 'থামে নিরীহ মানুষদের লাইন ধরিয়ে শুলি করে আসে। এ  
ধরনের প্রচুর কাহিনী আছে। এরা কী মানুষ, নাকি পশুরও অধম...'। তিনি কথা শেষ  
করতে পারলেন না। আমরাও চূপ করে রইলাম। খানিক পর আনমনা সুরে বলতে  
লাগলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে। I want to reserve  
one detail to myself and I would write and explain it as to the precise  
grizzly manner in which a lot of students were killed। সে সব শৃঙ্খলার নয়,' কথা শেষ হলো না, তিনি কাঁদতে লাগলেন। আমরা বিমুঢ়। আমাদের  
চোখও সজল। 'শহীদুল্লাহ কায়সার, প্রফেসর জ্যোতির্ময় শুহীরতা- এঁরা ছিলেন  
আমার বন্ধু। এন্দেরও তাঁরা তুলে নিয়ে হত্যা করেছে...' আবারও ফুঁপিয়ে উঠলেন  
নকভী।

আমি টেপ রেকর্ডারটি বন্ধ করে দিলাম।

## ॥ ১২ ॥

দুপুর দু'টো। ফিরছি হোটেলে। রোদ প্রথর, কিন্তু তাপ ততো নয়। পিটার পান  
চিবুতে চিবুতে কথা বলছে। নকভীর সাক্ষাতকার আমাদের প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে।  
আসল অর্থে তিনি হিউমিনিস্ট যিনি চান রাষ্ট্র হবে অসাম্প্রদায়িক, যেখানে মানুষ  
নির্ভয়ে নিজ বক্রব্য রাখতে পারবে। পাকিস্তানে তাঁকে থাকতে হচ্ছে বটে কিন্তু এই  
পাকিস্তানে থাকতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। আমরা এসব ভাবছিলাম,  
পিটারের কথায় মন ছিল না। হঠাৎ শুনি বেশ উঁচু গলায় পিটার বলছে, 'ইয়ে সব  
পাগল হ্যায়।' কী ব্যাপার। সেই চিরাচরিত দৃশ্য। পুলিশ ট্রাক থামিয়েছে। দর  
কষাকষি চলছে। পিটার আবার বললো, 'ইয়ে সব পাগল হ্যায়।' করাচীতে এরপর  
যতোদিন পিটারের সঙ্গে ঘুরেছি, পুলিশ দেখলেই মজা করার সুরে সে বলতো, 'ইয়ে  
সব পাগল হ্যায়।'

দুপুরের খাবারটা আমরা হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাই। প্রায় একই খাওয়া, তন্দুর ঝুঁটি,  
মাংস, সবজি, ঘন ডাল। কখনও বাসমতি চালের ভাত। হোটেলের তুলনায় বেশ  
সন্তোষ-ই মনে হয়। খাবার পর, 'দি নেশন'-এ পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা  
চাইবে কী না সে বিতর্ক পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি।

ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। মনে হলো আধ ঘটাও ঘুমাইনি। ঘড়িতে কিন্তু  
দেখি বিকাল পাঁচটা। বিছানা ছেড়ে উঠতে না উঠতে দরজায় টোকা। মহিউদ্দিন  
ভাইয়ের গলা, 'আর কতো ঘুমাবেন? কাজ করে পয়সা হালাল করুন।'

আমরা যাব মেরাজ মোহাম্মদের বাসায়। ষাটের দশকে ছাত্রনেতা হিসাবে মেরাজ পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন প্রভাবশালী এবং বিখ্যাত। পরে পিপলস পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। সে সময় জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকটজন হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পরে শুনেছি পিপলস পার্টি ও ত্যাগ করেন। আমরা তাঁর সঙ্গে আলাপে উৎসুক ছিলাম। কথা ছিল অক্সফোর্ডের অফিসে মেরাজের সঙ্গে আলাপ হবে। আমরা যখন করাচী পৌছে তখন তিনি বাইরে। ভেবেছিলাম, তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু গতকাল করাচী ফিরেই তিনি খবর পাঠিয়েছেন, আমাদের জন্য বাসায় অপেক্ষা করবেন।

মেরাজের বাড়ি খুঁজে পেতেও সময় লাগল। তিনি থাকেন স্তুর বাসায়। তাঁর স্তুর ‘রানা লিয়াকত আলী হোম ইকনমিক্স কলেজের’ প্রিসিপাল। নতুন গড়ে ওঠা করাচীতে কলেজ। সন্ধ্যার দিকে আমরা নতুন তৈরী আগা খান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার ক্যাম্পাস পর্যন্ত পৌছে গেলাম কিন্তু রানা লিয়াকত আলী হোম ইকনমিক্স কলেজের প্রিসিপালের বাসা খুঁজে পাই না। আরও মিনিট বিশেক খোঝাখুঁজির পর রাস্তার ধারে ছোট এক টিলায় প্রিসিপালের বাসা খুঁজে পেলাম।

আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো এক যুবক। সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসতে না বসতে মেরাজ হাজির। আমাদের জড়িয়ে ধরলেন যেন অনেকদিনের পরিচিত। পোড় খাওয়া শুক্র সমর্থ চেহারা। বয়স ষাটের দিকে এগোচ্ছে। যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আমার ছেলে, আমেরিকান সিটি ব্যাংকে কাজ করে।’

‘ভাল,’ বললাম আমি, ‘বামপন্থী বাবার ছেলে মার্কিন ব্যাংকে চাকরি করে।’ উঁচু গলায় হেসে উঠলেন মেরাজ।

দরজায় কলিং বেলের শব্দ। ঘরে চুকলেন শ্বাসালো গোঁফের এক প্রৌঢ়। সালোয়ার কুর্তা পরা। মেরাজ বললেন, ‘ন্যাপ নেতা, ইউসুফ মাস্তে খান।’

‘আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমার আরও কয়েকজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।’ বললেন মেরাজ, ‘আপনি নেই তো।’

‘কি যে বলেন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘এ সুযোগে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে।’

আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানালাম। মেরাজ ও মাস্তি বললেন, ‘খুব ভাল খুব ভাল, এ ধরনের মত বিনিময়ের দরকার।’

‘অন্যরা আসার আগে আমরা কাজ শুরু করি,’ বললাম আমি।

‘আপনাকে দিয়েই শুরু করি।’

মেরাজ জানালেন, সব সময় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তিনি মানুষের সেবা করতে চেয়েছেন। ছাত্রজীবনেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফ্রন্টের সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ছাত্রনেতা হিসাবে ষাট দশকের অনেক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বেই তিনি বছর মেয়াদী

ডিগ্রী ও আইনের কোর্স লুণ্ঠ করা হয়। ফাতেমা জিম্মাহৰ সঙ্গেও কাজ করেছেন। তারপর যোগ দেন ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি'তে। এ দলে বেশ সক্রিয় ছিলেন। ভুট্টোর মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীও ছিলেন। মতবিরোধ হওয়ায় পার্টি ছেড়ে দেন এবং তাঁকে জেলে নেয়া হয়। চার বছর জেলে ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর শ্রমিক আলোচনে জড়িয়ে পড়েন। জেনারেল জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে 'মুভমেন্ট ফর রেন্টারেশন অব ডেমোক্র্যাসি' গড়ে তোলার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছিলেন। একটি দলও গড়েছিলেন- 'কওমী মাহাজ-ই-আজাদী'। সেটিও ত্যাগ করেছেন। এখন 'তেহরিক-ই-ইনসাফের' সাধারণ সম্পাদক।

'১৯৭১ সম্পর্কে আপনার ধারণাটি কী', প্রাথমিক আলোচনার পর সরাসরি জিজ্ঞেস করে আফসান।

'১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা যদি ভাবেন,' বললেন মেরাজ, 'তাহলে দেখবেন যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন খাঁটি জনপ্রতিনিধি।' ১৯৭০-এ প্রথম অবাধ নির্বাচন হয়, হয়ত সে পরিপ্রেক্ষিতে মেরাজ এ মন্তব্য করলেন।

ঐ নির্বাচনে অনেক বড় বড় নেতা ছিলেন কিন্তু মানুষ 'Voted for consensus' এটিই হলো গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ ছিল সেকুলার পার্টি। এই পার্টির প্রোগ্রাম ছিল সেকুলার এবং তারা জোর দিয়েছিল অধিক স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্য এবং পক্ষপাতী ছিল নির্জেট পরাণ্টনীতির। বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল ন্যাপ। তাদের সাধারণ নীতি ছিল গণতন্ত্র, সামন্ত বিরোধিতা, শ্রমিকদের অধিকার আদায় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। ন্যাপও কিন্তু ছিল সেকুলার পার্টি।

পাঞ্জাব ও সিঙ্গুলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল পিপিপি। এখানকার মানুষ 'Wanted a change in system.' সাধারণভাবে সেকুলার পিপিপি'ও দৃশ্যত ছিল সামন্ত ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। পিপিপি দাবি করত ওয়ার্কিং ক্লাসের তারাই প্রতিনিধি। 'What I really mean to say that people voted for some common agenda-autonomy, secularism and antifeudalism.' এই বলে থামলেন। সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। বললেন, 'চায়ের কথা বলে আসি।' আমার মনে হলো, আসলে এভাবে বোধ হয় কখনও বিষয়টি ভাবিনি। আফসান মাস্তির সঙ্গে কথা বলছে। মেরাজ এসেও তাতে যোগ দিলেন। প্রধানত বামপন্থীদের নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হলো। মাস্তি যেহেতু ন্যাপের, সেজন্য তিনি ন্যাপের ভূমিকা তুলে ধরছিলেন। বলছিলেন, ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর সঙ্গে ন্যাপের যোগ নেই। মিনিট পনেরো মধ্যে চা এল। চা খেতে খেতে মহিউদ্দিন ভাইকে বললাম, 'শুরু করে দেন, না হলে আলোচনা অন্যদিকে চলে যাবে।'

‘আচ্ছা মি. মেরাজ মোহাম্মদ’, চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘ন্যাপ-আওয়ামী লীগ না হয় ফিউডালিজম লুণ্ঠ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পিপিপি?’

‘আমার মনে হয়,’ বললেন মেরাজ, ‘পিপিপি ও সামন্তবাদ লুণ্ঠ করতে চেয়েছিল কিন্তু What Mr. Bhutto preached and practised সেটি ভিন্ন ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ হলো কয়েকটি বিষয়ে যে ঐকমত্য তৈরি হয়েছিল আর্মি তা মানতে রাজি ছিল না। নির্বাচনের ফলাফল সেনাবাহিনীকে অবাক করেছিল, গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকেও। কারণ তারা টাকা-পয়সা দিয়েছিল মুসলিম লীগ ও ইসলামিক পার্টিগুলিকে।’

‘আর্মি আসলে কী চেয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?’ জিজেস করি আমি।

‘আমার মনে হয়,’ বললেন মেরাজ, ‘আর্মি ও রঞ্জিং এলিট স্বায়ত্ত্বশাসন মানতে রাজি ছিল না, সেক্যুলার ফোর্সের আধিপত্যেরও ছিল বিরোধী। তারা এর বিরুদ্ধে ডানপন্থীদের একটি ধারা তৈরি করতে চেয়েছিল। এ ঘটনা অন্য ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করল। আমি বহুবার শুনেছি জেনারেল ইয়াহিয়া ভুট্টোকে বলছেন, মুজিবকে শান্ত করা সহজ হবে। তিনি এমনও বলেছিলেন, পাকিস্তানের নেকট প্রাইম মিনিস্টার হবেন শেখ মুজিবুর রহমান। এটা আবার ভুট্টো মানতে রাজি ছিলেন না। ইয়াহিয়াকে তিনি অন্তত দু'বার আমার সামনে বলেছিলেন, পাকিস্তানে ক্ষমতার কেন্দ্র তিনটি-আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি এবং আর্মি।’

আবার কলিং বেলের শব্দ। মেরাজ উঠে বারান্দায় গেলেন, তারপর সালোয়ার-কুর্তা পরা দু'জন দীর্ঘদেহী লোক নিয়ে ঢুকলেন। একজন বয়সে তরুণ, সুদর্শন, নাম আজহার জামি। কওয়ী মোহাজের আজাদ পার্টির নেতা। অপরজন প্রৌঢ়-ওসমান বালুচ- বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। নতুন পরিচিত হলে যা হয়, তাই হলো। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে কথা শুরু হলো। বর্তমান কাঠামো ও শাসন যে কারও পছন্দ নয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেলাম। কিন্তু আমাদের কথার খেই হারিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে বললাম, ‘আমরা মেরাজ মোহাম্মদের সাক্ষাতকার নিছ্লাম। সেটা আবার শুরু করি। প্রয়োজনে আপনারাও যোগ দিতে পারেন।’

‘ঠিক আছে, ১৯৭১ সালে ফিরে আসি মেরাজ’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে মেরাজ ছিলেন পিপলস পার্টির প্রভাবশালী নেতা।

‘১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে’, বললেন মেরাজ, ‘লাহোরে পিপিপি’র বৈঠক বসেছিল। মূল বিষয় ছিল, সংসদ বৈঠক করা ঠিক হবে কি হবে না। আমরা কয়েকজন বলছিলাম বয়কট করা ঠিক হবে না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তান থাকবে না, কারণ বহুদিন তার ওপর অত্যাচার চলেছে।’

‘এ ধারণা আপনার হলো কেন?’ জিজেস করি আমি।

‘আমি ঢাকা গেছি দু'বার,’ জানালেন মেরাজ, ‘সেখানকার অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আওয়ামী লীগ ও ভাসানী অনুসারী, মতিয়া চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে। যা হোক,

সেন্ট্রোল কমিটির মিটিংয়ে আমি এও বলেছিলাম, এ অঞ্চলে যে পাওয়ার পলিটিকস চলছে তাতে এ ধরনের ঘটনায় ভারত সুযোগ নেবে। সেন্ট্রোল কমিটিতে আমি কোন সাপোর্ট পাইনি।’

‘তারপর?’

‘২৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) লাহোরে এক জনসভা আহ্বান করা হলো। লাহোরে করার কারণ, সেখানে আর্মি বেস শক্ত এবং আর্মিকে বোঝানো যে, পিপিপি কোন কম্প্রোমাইজে যাবে না অর্থাৎ আর্মির পক্ষে থাকবে। তা বেশ বড় মিটিং হলো। স্টেজে এক কোণায় বসেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম বক্তব্য সব অন্যরকম তখন স্টেজ থেকে নেমে পাবলিকে চলে গেলাম।’

‘২৫ মার্চের আগের ঘটনাবলী কিছু জানেন?’ জিজেস করি আমি।

‘আসলে ঘটনা খুব দ্রুত ঘটেছিল’, বললেন মেরাজ, ‘ডিটেলস মনে নেই। আমি ভেবেছিলাম ভুট্টো পাওয়ার পলিটিকস করবেন কিন্তু ইষ্ট পাকিস্তান ভাঙবে না। আমার সামনেই ইয়াহিয়া ভুট্টোকে বলেছিলেন, তোমার পার্টিকে শেষ করে দেব। তোমার পার্টি টি-পার্টি বেশি কিছু না। তুমি আমার পুরনো বন্ধু বটে কিন্তু দরকার হলে সব আটকে রাখব। আমার মনে হয় এই সময় পর্যন্ত ঠিক ছিল যে পার্লামেন্টের সেশন ডাকা হবে।’

‘তার পর?’

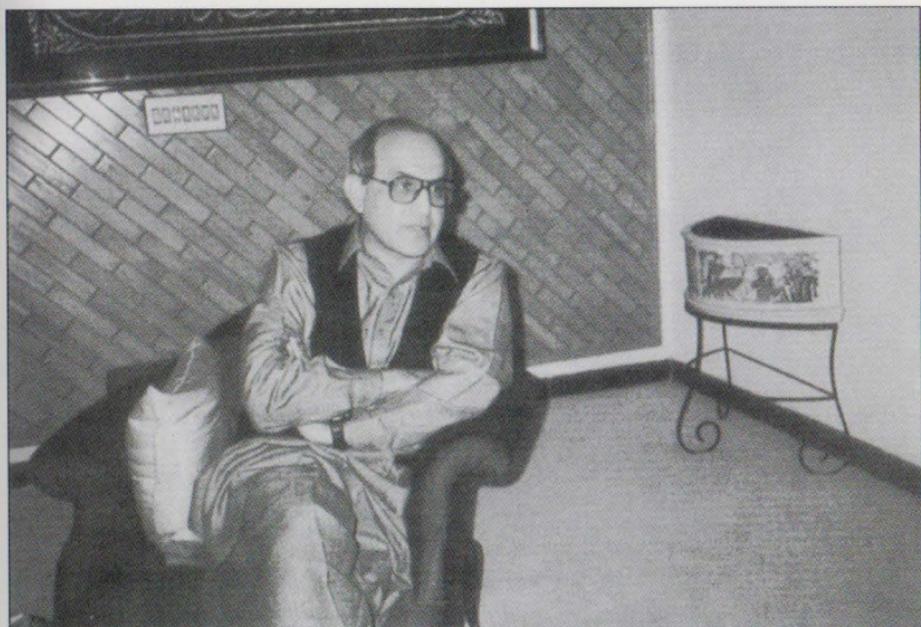
‘তার পরের ঘটনাতো জানা। ২৫ মার্চের পর ভুট্টো ফিরলেন। এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম তাঁকে রিসিভ করতে। ভুট্টো বললেন, থ্যাংক গড়, পাকিস্তান ইজ সেভড। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্ মিয়াতো পাকিস্তানকো মার দিয়া। ভুট্টোর বাসায় গেলাম। বেগম ভুট্টো সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, পাকিস্তান বাঁচবে না। এরপর কী করে বাঁচবে?’

‘এখানে ২৫ মার্চের ঘটনার রিঅ্যাকশন কী হয়েছিল?’ জিজেস করলাম আমি।

‘পাঞ্জাব ছাড়া সবখানে রিঅ্যাকশন হয়েছে।’

‘লাহোর ন্যাপ প্রতিবাদ মিছিল করেছিল,’ বললেন ইউসুফ মাস্তে, ‘কবি হাবিব জালিব প্রতিবাদ করে কবিতা লিখেছিলেন।’ মাস্তি আরও জানালেন, ‘২৫ মার্চের আগে বেজেঙ্গো মুজিবকে জিজেস করেছিলেন, তুমি কি স্বাধীনতা চাও? তাহলে আমি তা সমর্থন করব এবং ফিরে গিয়ে অন্যভাবে কাজ শুরু করব। মুজিব বলেছিলেন, তারা চাপিয়ে দিচ্ছে। এখনও আলোচনা চলছে।’

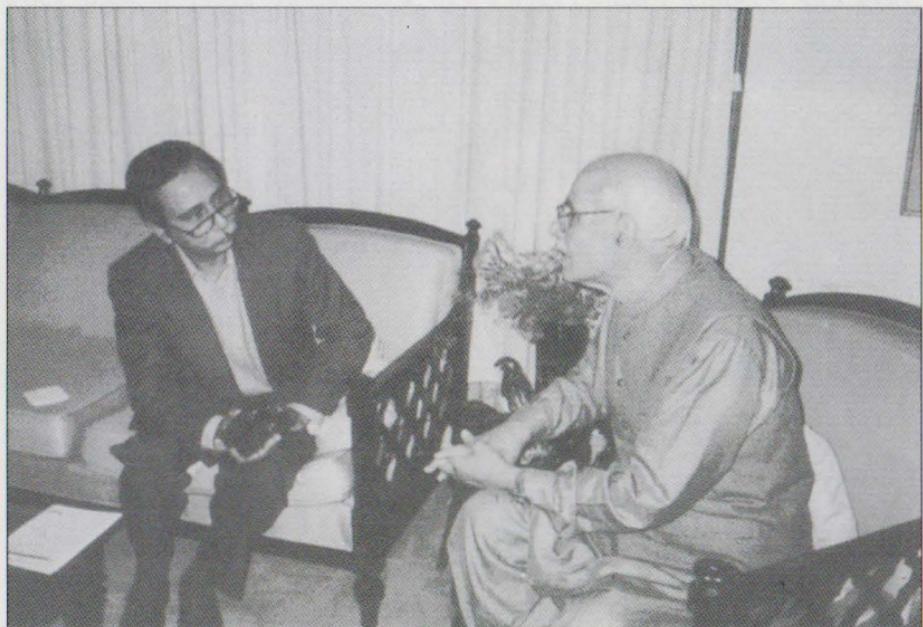
আজহার জামি ও ওসমান বালুচও আলোচনায় যোগ দিলেন। তাঁরা যা জানালেন তা হলো, পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যাপ এর বিরোধিতা করেছে কিন্তু তেমনভাবে সোচ্চার হতে পারেনি। মাস্তি বললেন, ‘ঢাকা থেকে ফেরার পর এয়ারপোর্টে ওয়ালী খানকে সাংবাদিকরা জিজেস করেছিলেন, কে প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন? ন্যাপ কয়টা সিট পাচ্ছেঃ



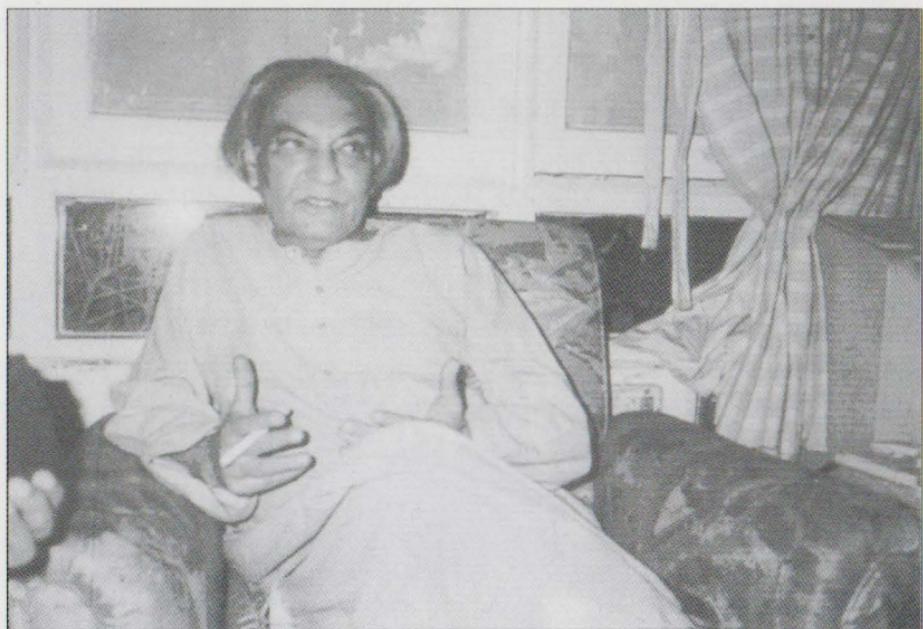
পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদ লেঘারি



রফি রাজা



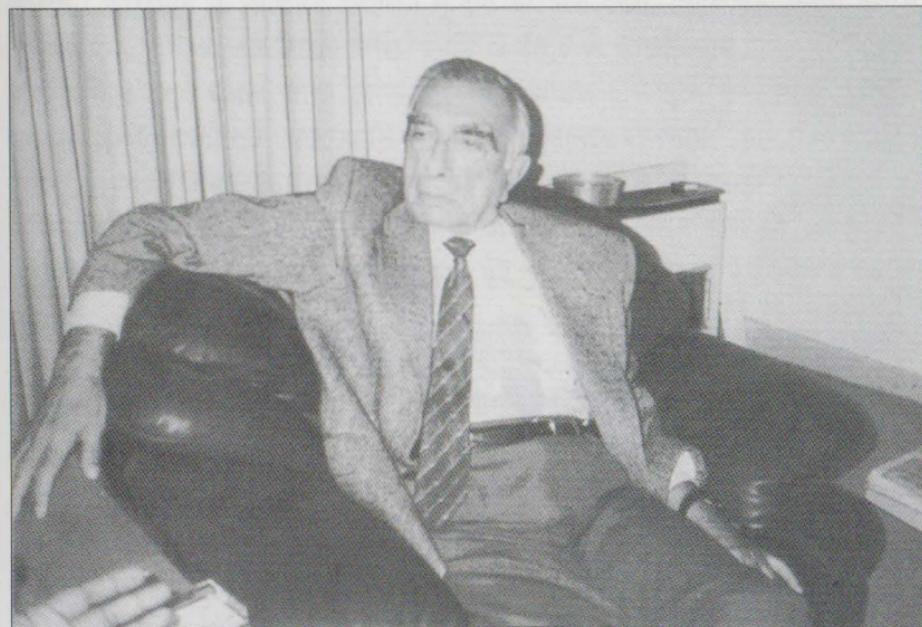
মেজর জেনারেল (অবঃ) রাও ফরমান আলীর সাক্ষাত্কার নিচের লেখক



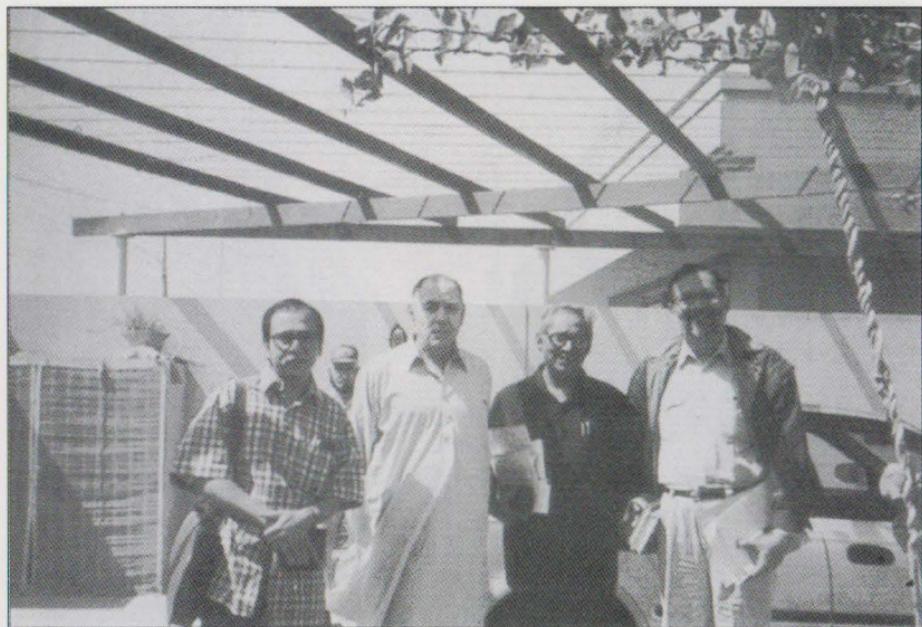
রাজা কাজেম



ড. মুবারিজির হাসানের সাক্ষাত্কার নিচেন মহিউদ্দিন আহমেদ



রোয়েদাদ খান



মেজর জেনারেল (অব:) গুলাম উমরের সঙ্গে লেখক, মহিউদ্দিন আহমেদ ও আফসান চৌধুরী



এম বি নকতী

ওয়ালী খান বললেন, নাক-ই কাটা যাচ্ছে যখন তখন নাক আর থাকবে কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন করে কী লাভ?’

‘এখানে নাকি অনেকে জানতেন না?’ জিজ্ঞেস করে আফসান।

‘জানতেন না বললে ভুল হবে,’ বললেন মাস্তি, ‘প্রেস ইগনোরেন্ট ছিল এটা বলা যায় না।’

‘সাধারণ মানুষ হয়ত তেমনভাবে জানত না’, বললেন মেরাজ, ‘কারণ তাদের মধ্যে সচেতনতা কম ছিল। কিন্তু ব্যরোক্র্যাটস, জেনারেল এবং পলিটিশিয়ানরা জানতেন।’

‘মিলিটারি বোধ হয় ২৫-এর ঘটনার মাধ্যমে’, বললেন জামি, ‘পাকিস্তানের পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে এই মেসেজ-ই দিতে চাচ্ছিল, দেখ, পাকিস্তানের একটি বড় পার্টির দশা কী করতে পারি। ন্যাপ এ বর্বরতা পছন্দ করেনি বটে কিন্তু তেমন কিছু করার সাহসও করেনি।’

তবে সবাই একমত হলেন যে, রাজনীতিবিদদের মধ্যে আসগর খান-ই যা একটু প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের ফিউডাল ক্লাসের সঙ্গে ইষ্ট পাকিস্তানের মিডল ক্লাসের লড়াই।

মেরাজের ছেলে এসে আমাদের বলল, নাস্তা রেডি। বসার ঘরের পাশেই খাবার ঘরে টেবিলে বিকালের নাস্তা সাজানো, যদিও তখন ঘড়ির কাঁটা আটটা পেরিয়েছে। আলোচনা গড়ালো খাবার টেবিলে। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র নিয়ে তখন আলোচনা চলছে। আফসান এ ব্যাপারে অঝর্ণী। দু'বার চা হয়ে গেল, আলোচনা তখন চলছে পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণী নিয়ে। মাস্তি, জামি ও বালুচ এ আলোচনায় মেতে উঠেছেন। সাক্ষাতকার শেষ করার আশা ছেড়ে দিয়েছি। মেরাজ চুপি চুপি বললেন, ‘বারান্দায় চলেন, একটা সিগারেট খেয়ে আসি।’ আমি আফসানকে বললাম, ‘তুমি তর্ক চালিয়ে যাও, আমরা ইন্টারভিউটা শেষ করার চেষ্টা করি।’ মেরাজ বারান্দায় বসে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ‘বড় ভাইয়ের সামনে সিগারেট খাই না।’ তখন জানলাম, বালুচ তাঁর বড় ভাই। ষাটোর্ধ্ব বড় ভাইয়ের সঙ্গে ষাট ছুঁই ছুঁই ছোট ভাইয়ের এই বিনয়ে অবাক হলাম।

‘২৫ মার্চের পরের ঘটনাবলী সম্পর্কে বলুন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘সে সময় পিপিপি’র জেনারেল সেক্রেটারি রহিম সামগ্রিক বিষয় নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি সমালোচনা করেছিলেন আর্মির কর্মকাণ্ডে। মুবাখিরের বাসায় সেন্ট্রাল কমিটির বৈঠক বসল। প্রতিবেদনটা আগে আমি জেরুজালেম করে নিয়েছিলাম। কমিটির সদস্যদের কাছে তা বিলি করলাম। ভুট্টো এ ঘটনায় খুব ক্ষিপ্ত হলেন।’

‘এ কারণে কি তিনি কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘না, তখনই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এরপর তো এল বাই-ইলেকশন। আমাদের গ্রংপ [পিপিপি’র] বলেছিল ইলেকশন বয়কটের। ভুট্টোকে আমি জিজ্ঞেস ও করেছিলাম, কয়টা সিট দিচ্ছে আপনাকে? বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, দেখ, ডেমোক্র্যাটিক প্রসেস শুরু করতে হবে। শুধু তাই নয়, বললেন, ঢাকার অবস্থা দেখতে যাবে মেরাজ আর তারিক। আমি বললাম, ট্যাঙ্কে চড়ে ডেমোক্র্যাসি ঠিক করতে যাব না।’

‘রফি রাজা বলছিলেন, এসব বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।’ মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন।

‘এখন তো অনেকেই অনেক কিছু বলবেন,’ বললেন মেরাজ, ‘রফি ছিলেন ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ এবং পার্টির কোন সভায় কখনও তিনি ভুট্টোনীতির বিরোধিতা করেননি।’

‘আচ্ছা এই যে পাকিস্তানে বলা হয় হিন্দুরা পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী, বাঙালীদের তারাই উস্কিয়েছে— এসব বিষয়ে আপনার কী মত?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘এগুল কোনটাই ঠিক নয়। এগুল বাকোয়াজ।’

‘তাহলে ১৯৭১-এর জন্য দায়ী কে?’ আবার জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘যে দল মেজরিটি পেল তাকে পিপিপি বঞ্চিত করতে চাইল এ ব্যাপারেওবা আপনার কী মত?’ সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রশ্ন করি।

‘আমি মনে করি,’ বললেন মেরাজ অকম্পিত স্বরে, ‘গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী মেজরিটি পার্টির কাছেই ক্ষমতার হস্তান্তর করা উচিত ছিল। করতে দেয়া হয়নি। এতেই মি. ভুট্টোর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দৃঢ়ভাবে কনসেন্ট্রেশন অব পাওয়ারে বিশ্বাস করতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের জন্য ভুট্টোই দায়ী। ভুট্টো পাকিস্তান ভেঙ্গে নিজের সামন্ত ব্যবস্থা বাঁচিয়েছিলেন।’

ভিতরে আফসান ও অন্যরা তখন বিশ্ব ব্যবস্থা নিয়ে জোরালো তর্কে লিপ্ত।

॥ ১৩ ॥

সকালে নাস্তার টেবিলে বসে কাগজ পড়ছি। আজ কাজের মধ্যে আছে শুধু করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া। রাত্রে আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসায় দাওয়াত। সেজন্য আজ একটু দেরিতে উঠেছি, সময়ের পরোয়া না করে নাস্তা সেরে আয়েশ করে চা খেতে খেতে কাগজ পড়ছি। এমন সময় বেয়ারা এসে জানাল, ‘মহিউদ্দিন সাব কা ফোন।’

মহিউদ্দিন ভাই চললেন কাউন্টারের দিকে। আফসান বললো, ‘মনে হয় করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে আমরা নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হব।’

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষক ও তরুণ ছাত্রের সাক্ষাতকার নেয়ার প্রস্তাবটা মহিউদ্দিন ভাই-ই রেখেছিলেন। তাঁর মতে তরুণরা ১৯৭১ সাল সম্পর্কে কী ভাবছে, তা হয়ত খানিকটা বোঝা যাবে। আমেনা এ কারণে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারপার্সনের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন। চেয়ারপার্সন তালাত নাজারিয়াত সানন্দে রাজি হয়েছেন। জানিয়েছেন, কিছু শিক্ষক ও ছাত্রকেও তিনি বলে রেখেছেন। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছুতে হবে বেলা এগারোটাৰ দিকে।

মহিউদ্দিন ভাই ফিরে এলেন। মুখ দেখে মনে হলো, ভাল খবর আছে। চেয়ারে বসে বললেন,

‘আরেক কাপ চা হোক, ভাল খবর আছে।’

‘খবরটা কী?’ জিজ্ঞেস করে আফসান।

‘আমেনা ফোন করেছিলেন। বেনজীর ভুট্টো গতকাল রাতে ফিরেছেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। আগামী কাল বিকেলে অ্যাপয়ন্টমেন্ট।’

একদিকে ভালই হলো। পরশু আফসান চলে যাবে জরুরী কাজে ঢাকা আর আমরা লাহোর। আগামীকাল বেনজীরের সাক্ষাতকারে তা হলে আফসানও থাকতে পারবে।

সদর থেকেও করাচী বিশ্ববিদ্যালয় বেশ দূরে। করাচীতে এক জায়গা থেকে যখন আরেক জায়গার দিকে রওনা দিই, তখন মনে হয় পথ যেন আর ফুরাবে না। যাচ্ছ তো যাচ্ছই, করাচী বিশ্ববিদ্যালয় আর চোখে পড়ে না। এগারোটাৰ দিকে বিশ্ববিদ্যালয় চোখে পড়ুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টা দিকে এখন গড়ে উঠছে ডিফেন্সের আবাসিক এলাকা। এখনও ফাঁকা ফাঁকা। তার মানে, বিশ্ববিদ্যালয় যখন শুরু হয় তখন এ জায়গাটা ছিল শহরের বাইরে, বিরান জায়গা।

পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ইটের প্রাচীরে ঘেরা। গোটা দুয়েক মূল ফটক। বাংলাদেশের বাইরে আরও অনেক জায়গায় দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ঢোকার জন্য আছে নির্দিষ্ট ফটক। পরিচয়পত্র ছাড়া ঢোকা নিষেধ।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে থামানো হলো আমাদের। উদ্দেশ্য জানালাম। প্রধান প্রহরী জানালো, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে এ ধরনের কিছু তাদের জানানো হয়নি। আমরা জানালাম, গাড়ি রেখে আমরা হেঁটে যেতে পারি কি না? না, তাও সম্ভব নয়। বললাম ফোন করে জানতে। ফোন নষ্ট। আমাদের সঙ্গে ছিলেন অক্সফোর্ডের জাহিরন। তিনি প্রহরীকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, এঁরা মেহমান, অনেক দূর থেকে এসেছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। হয়ত কোন কারণে খবর আসেনি। প্রহরীরা ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে থাকে।

‘কোথাও থেকে একটা ফোন করলে হয়,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

আমরা ফোনের খোঁজে বের হই। খানিক পর একটা মার্কেটের মতো চোখে পড়ে। ফোনও পাওয়া যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিভাগে কেউ ফোন ধরে না। এদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পেরিয়ে গেছে। আমরা এবার দু'নম্বর গেটের দিকে রওনা হই। সেখানেও একই জবাব, ঢোকা যাবে না। হাল ছেড়ে দেয়ার মতো ব্যাপার।

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখলে হয়,’ বলি আমি, ‘শেষ চেষ্টা।’ ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা।

ফের মূল গেটে ফিরি। আবার অনুরোধ। এবার বোধ হয় প্রহরীদের মায়া হয় বা বলা যেতে পারে, নিশ্চিত হয় যে, এঁরা জেনুইন। বহিরাগত সন্ত্রাসী নয়। অনুমতি দেয় আমাদের ভেতরে যাবার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু ভবন। প্রতিটি ভবনের গায়ে বিরাট করে বিভাগের নাম লেখা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ খুঁজে নিতে খুব সময় লাগল না। চেয়ারপার্সন তালাতের রুমে চুকে দেখি তিনি বেরুবার তোড়জোড় করছেন। আমাদের দেখে অবাক হলেন, বললেন, ভেবেছিলেন আমরা আসব না। অনেককে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করার পর সবাই চলে গেছেন। তালাত কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, আমাদের প্রবেশের অনুমতি কেন পৌঁছায়নি। যাঁরা তখনও বিভাগ ছেড়ে যাননি এমন দু'তিনজন শিক্ষককে পেলেন তালাত। এমফিলের কয়েকজন ছাত্রও পাওয়া গেল। সেমিনার রুমে আমরা বসলাম।

তালাত নাজারিয়াতের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মোটাসোটা হাসিখুশি মহিলা। তাঁর তরুণ সহকর্মী খালেদ মাহমুদ। সহযোগী অধ্যাপক। আরও এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচিত হলাম, নামটি মনে নেই। আমার পাশে বসেছিলেন শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক। থুতনিতে খানিকটা দাঢ়ি। বাঙালী-ই মনে হচ্ছিল কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তালাত পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘উনি বাংলা বিভাগের।’

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ পুরনো, কিন্তু এখনও চালু আছে জেনে বিস্মিত হলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ছাত্র কয় জন?’

এ প্রশ্নে যেন তিনি খানিকটা অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, ‘একজন’।

‘শিক্ষক?’

‘একজন।’

এসব প্রশ্নে যে তিনি খুশি হচ্ছেন না, তা বুঝতে পারছিলাম। আমি নেহাঁ কৌতুহলের বশেই জানতে চাইছিলাম। কিন্তু পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় বিভাগটি এখন উপহাসের বস্তু। সেজন্য ভদ্রলোক হয়ত ক্ষুঁক হচ্ছিলেন। অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, ‘কদিন আছেন করাচী?’

জানালেন, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেশেই অর্থাৎ বাংলাদেশে ছিলেন। ১৯৭২ সালে চলে এসেছেন।

‘বাংলাদেশের কোথায় আপনার বাড়ি?’ জিজ্ঞেস করি আমি।  
‘নোয়াখালী।’

তারপর তাঁর সম্পর্কে আমার আগ্রহ কমে যায়। না, তিনি নোয়াখালীর বলে নয়। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশে ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছায় করাচী চলে এসেছেন। তারপর ধরাধরি করে হয়ত এ বিভাগে চাকরি পেয়েছেন। সুতরাং তিনি কোন পক্ষের লোক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মহিউদ্দিন ভাই সবাইকে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললেন। ঠিক হলো, প্রত্যেকে নিজের বক্তব্য বলে যাবেন। দরকার হলে প্রশ্ন করা হবে।

খালেদ মাহমুদ বললেন, ‘আমি সবার আগে বলতে চাই। কারণ আমাকে দুটোর মধ্যে বাসায় পৌঁছুতে হবে। কীভাবে শুরু করব বলুন।’

‘১৯৭১ সালের কথা মনে আছে আপনার?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘কেন হলো ১৯৭১?’

‘ঐ সময় আমার বয়স ২০। সুতরাং সাবকন্টিনেন্টে কী হচ্ছে, আমার অজানা ছিল না।’ যেন তৈরী ছিলেন এমন প্রশ্নের জন্য খালেদ মাহমুদ। ‘বাংলাদেশে যা হয়েছে তা হলো এক কথায় ম্যানহ্যান্ডলিং। প্রয়োজন ছিল সেখানে রাজনৈতিক সমাধান কিন্তু চাপিয়ে দেয়া হলো সামরিক সমাধান।’

‘পটভূমিকা কী ছিল বলে মনে হয় আপনার?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘পটভূমিকা বেশ বড়, তা আপনারা জানেন।’ বললেন খালেদ, ‘আমি দু’একটা উদাহরণ দিই। ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে আমি নিজে ছিলাম ঢাকায়। মেহার ইন্ডাস্ট্রির অর্ধেক মালিক ছিলাম আমরা। তখন দেখেছি, বাঙালীদের দেখা হতো নিচু চোখে। তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হতো। ছয় দফা ছিল জনপ্রিয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চাবিকাঠি। ব্যক্তিগতভাবে, আমার মনে হয়, ছয় দফা মেনে নেয়া উচিত ছিল। এটি হতো একটি অভিজ্ঞতা।’

‘হিন্দুরা নাকি পাকিস্তান ভাসার জন্য দায়ী?’ জিজ্ঞেস করে আফসান।

‘এটি কোন কাজের কথা না,’ উত্তর দিলেন খালেদ, ‘আসল কারণ হলো, পাঞ্জাবী আমলাতন্ত্র, পশ্চিম পাকিস্তানী একনায়কতন্ত্র প্রত্যক্ষ।’

‘তাহলে দায়ী কে পাকিস্তান ভাসার জন্য?’ প্রশ্ন করি আমি।

‘দেখুন, শেখ মুজিব যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন তখন তাঁকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিল। ক্ষমতা যে হস্তান্তর করা হয়নি, তার জন্য দায়ী জেনারেল ইয়াহিয়া ও ভুট্টো। ২ মার্চ ভুট্টো এখানে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে কথা আমার মনে আছে। ভুট্টো বলেছিলেন—

মানলাম, বাংলাদেশ সতরে বছর ধরে এক্সপ্লয়েটেড হয়েছে। এখন তারা ক্ষমতায় এলে আমরা সতরে বছর এক্সপ্লয়েটেড হব। কেন? কিন্তু,’ একটু দম নিয়ে বললেন

খালেদ, 'সতেরো বছর পশ্চিম পাকিস্তানের তো এক্সপ্রেসেটেড হওয়ার কথা নয়, তা সম্ভবও ছিল না। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, হতো। হলে সেটা হতো পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতিপূরণ। আপনাদের মনে আছে কি না জানি না। মুজিব একবার এসেছিলেন ইসলামাবাদ। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, ইস্ট! চারদিকে পাটের গন্ধ পাঞ্চ। অর্থাৎ পাটের টাকা দিয়ে ইসলামাবাদ তৈরি হয়েছে।'

একটানা কথা বলে থামলেন খালেদ। মনে মনে তাঁর প্রশংসা না করে পারছিলাম না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে দোষারোপ করছেন সে কারণে নয়, স্পষ্টভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য বলছিলেন। নৈর্ব্যক্তিক যেন বিষয়টা খুব অ্যাকাডেমিক। এবং এমন একজন এসব বলছিলেন, যাঁর সম্পত্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে, এখন যা নেই। খালেদ ফের শুরু করলেন, 'পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তানকে যুদ্ধের সময় ডিফেন্ড করার ব্যাপারেও সিরিয়াস ছিল না। এটা ছিল একটা শো মাত্র। এমনও হতে পারে, যা আমি প্রমাণ করতে পারবো না তা হলো, অন্তিমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে পাকিস্তান, ইত্তিয়া এবং আমেরিকা একটা সমরোতায় পৌছেছিল। তা হলো, পশ্চিম পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে। সে কারণে দেখি, পশ্চিম পাকিস্তানে ইত্তিয়ার আক্রমণ ছিল সীমিত। সবশেষে বলবো, যদি আলাদা হওয়ার দরকার ছিল, তাহলে তা শাস্তিপূর্ণভাবেই হওয়া উচিত ছিল এবং তা করাও যেতো।'

'২৫ মার্চ ঢাকায় কী হয়েছিল আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'জানি', নির্বিকারভাবে বললেন খালেদ, 'আগেইতো বলেছি, আমাদের ব্যবসা ছিল সেখানে। আমরা করাচী চলে এলেও আমার কাজিনরা ছিল। সেগুলো ধ্রংস হয়ে গিয়েছিল। আমার আত্মীয়-স্বজনরা পালিয়ে এসেছিল।'

এমন সময় এক ছাত্র বিস্কিটের একটা প্লেট ও ঠাণ্ডা কোকা-কোলা নিয়ে এলেন। খালেদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে যেতে হবে। পরে না হয় এক সময় আলাপ হবে।' তিনি চলে গেলেন। ঠাণ্ডা কোকে চুমুক দিতে দিতে মহিউদ্দিন ভাই টেপ রেকর্ডারটা এগিয়ে দিলেন তালাত নাজারিয়াতের দিকে। বললেন, 'প্রশংসলোতো শুনেছেন। এবার আপনি বলুন।'

'দেখুন', বললেন তালাত, 'পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পেইনফুল মনে হয়েছে। নেতারা যদি বিবেচক হতেন, তাহলে ব্যাপারটা এড়ানো যেত।'

'সেটাতো অন্য ব্যাপার', বলি আমি, 'কিন্তু কারণগুলোতো বিচার করতে হবে।'

'তা ঠিক', বললেন তালাত, 'ধর্মন ছয় দফার কথা। আমি জানতাম ছয় দফা পাকিস্তানকে দুর্বল করবে, সে কারণে দেশের জন্য তা মঙ্গলজনক নয়। সমস্ত বিষয় নিয়েই রাজনীতিবিদরা আলোচনা করতে পারতেন। হয়ত তাহলে নিষ্পত্তি হতো। তবে এখানে একটি মত ছিল যে, আওয়ামী লীগ আলোচনায় বসত না। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে তো পিসফুল পার্টি হতে পারত।'

‘হয়ত’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘কিন্তু আপনিতো জানেন, আওয়ামী লীগ সব সময় আলোচনার পথেই এগিয়েছে। দ্বিতীয়ত গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থান কোথায় হওয়া উচিত ছিল বলে আপনি মনে করেন?’

‘হ্যাঁ, আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিল’, বললেন তালাত।

‘২৫ মার্চ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘২৫ মার্চের পর পত্রিকা পড়েই যা জেনেছিলাম। পুরো খবর তখনও পাইনি’, জানালেন তালাত, ‘একদিন দেখলাম, আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। খবরটি আমাকে ক্ষুঁক করে। কিন্তু রক্তপাতের বিষয়টি তখনও জানতে পারিনি। পরে আঞ্চলিক-স্বজন, রেডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন বিবরণ শুনেছি এবং শিউরে উঠেছি।’

আড়চোখে একবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন মহিউদ্দিন ভাই। দুটো বেজে গেছে। নিচয়ই আলোচনার মুড়ে কেউ নেই। তাই বোধ হয় তালাতের কথা শেষ হতেই ২৩ বছরের তরুণ এমফিল গবেষক ও মর শরিফের দিকে তাকিয়ে বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘ইয়াংম্যানদের বক্তব্য শোনা যাক। পুরো বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।’

‘দেখুন, আমাদের তো তখন জন্মই হয়নি। তবুও বই পড়ে, শুনে যা জেনেছি, তাতে মনে হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তান এক্সপ্লয়েট করেছে পূর্ব পাকিস্তানকে এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্রের চর্চা ছিল না। তাছাড়া দেশটি ছিল ভৌগোলিকভাবেও বিচ্ছিন্ন। তবে এ ধারণা অনেকের বন্ধনূল যে, ইতিয়া সব সময় সুযোগ খুঁজেছিল এবং তা সে পেয়েওছিল।’

‘আপনার কী মত?’ একই বয়সী নঙ্গী আহমদকে জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘এক কথায় যদি বলতে হয় তাহলে বলব, পাকিস্তানের ফিউডাল কালচার এ ঘটনার জন্য দায়ী। পাওয়ার স্ট্রাকচার ছিল ফিউল লর্ডদের দখলে। তারা তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান ক্ষমতা পেলে সে আধিপত্য রাখা যাবে কি না তাতে সন্দেহ ছিল। সে কারণেই পাকিস্তান ভেঙেছে।’

‘আপনার মত?’ নুসরাত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘পাঠ্য বইয়ে পড়েছি’, জানালেন নুসরাত, ‘শেখ মুজিব সেপারেশন চেয়েছিলেন এবং ইতিয়া তাতে হেল্প করেছে। এখন নিজে পড়াশোনা করে জেনেছি, পাঠ্য বইয়ে যা লেখা ছিল, তা ঠিক নয়। আমার মতে ১৯৭১ সালে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত ছিল, যা রাখা হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিল আওয়ামী লীগকে। তবে এ কথাও মনে হয়, যেভাবে পশ্চিম পাকিস্তান এক্সপ্লয়েট করেছিল পূর্ব পাকিস্তানকে, তাতে ১৯৭১ সালে না হলেও এক সময় না এক সময় ইষ্ট পাকিস্তান আলাদা হয়ে যেতই।’

॥ ১৪ ॥

করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসার পথে ভাবছিলাম, সত্যিই কি পাকিস্তানের নতুন জেনারেশন অন্যভাবে চিন্তা করছে? গত এক দশকে পাকিস্তানের নতুন জেনারেশনের অনেকের সঙ্গে বিদেশে আমার দেখা হয়েছে। প্রাথমিক আলাপে একটা আড়ষ্টতা থাকে। একটু ঘনিষ্ঠ হলে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালে? আমরা ঠিক জানি না। এ বিষয়ে কি কোন বইপত্র দিতে পারবেন? অনেকের কাছে বিষয়টি হয়ত বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। জাপানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক তরঙ্গকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা কি জানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তা হিটলার থেকে কম নৃৎস ছিল না? তারা জানিয়েছে, এ বিষয়ে তাদের কিছুই জানা নেই। বিদেশ কেন, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম কতটুকু জানে মুক্তিযুদ্ধের দুঃখ-বেদনা?

অবশ্য, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা যে মতামত দিলেন, তার অন্য আরেকটি দিক থাকতে পারে। হয় তারা মোহাজের, নয় সিঙ্ক। মোহাজেররা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। ছিল পাঞ্জাবী শাসকদের পক্ষে। এখন তারা বুঝছে পাঞ্জাবী শাসক কী জিনিস! আর সিঙ্কিরাতো বহুদিন থেকেই পাঞ্জাবীবিরোধী। ‘জয় সিঙ্ক’ আন্দোলন তার প্রমাণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত তারা ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীকে অন্যভাবে বিচার করছে।

বিকেলে কোন সাক্ষাৎকার পর্ব নেই। তাই ততো টেনশন ছিল না। ফিরতে ফিরতে বিকেল তিনটা। ভেবেছিলাম হোটেলের রেস্তোরাঁয় খাবার পাওয়া যাবে না। গাড়ি থেকে নেমে তাই ঝুঁমে না গিয়ে সোজা রেস্তোরাঁয় চলে গেলাম। রেস্তোরাঁ বক্স হওয়ার পথে। আমরা নিয়মিত খন্দের। তাই বেয়ারারা আবার বিরস মুখে খাবার অর্ডার নিয়ে গেল। লাঞ্চ শেষ হতে হতে চারটা।

ঝুঁমে ফিরতেই আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব আবদুর রহিমের ফোন।

‘সব প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো?’

‘আছে।’

‘আপনাদের জন্য মাছ কিনতে গেছিলাম মুসা কলোনীতে,’ জানালেন তিনি, ‘সবাই মানা করেছিল। ওখানে গেলে নাকি জান নিয়ে ফেরা মুশকিল। আমি জান নিয়ে তো ফিরেছিই, তার ওপর খুব সন্তায় ভাল ঝই এনেছি।’

আমরা রহিম সাহেবকে মানা করেছিলাম এই আয়োজন করতে। এক সপ্তাহের মধ্যে উনি বাসা বদলাবেন। এখনও থিতু হয়ে বসেননি। করাচীর অফিসে উনি একা। বলা যায় ওয়ান ম্যান অ্যাবেসী। তিনি বাধা মানেননি।

‘আখতার হামিদ খান সাহেব আসবেন’, জানালেন রহিম, ‘সোহরাওয়ার্দীর নাতনি আর চুন্দিগড় ও লিয়াকত আলী খানের ছেলেও আসবেন। ডন সম্পাদককেও বলেছি।’

‘আমার ইন্টারেন্স তো আগেই জানিয়েছি’, বললাম আমি, ‘ইন্টারেন্স শুধু আখতার হামিদ খানকে দেখা।’

আমার গ্রামের বাড়ি বৃহত্তর কুমিল্লায়। ছেলেবেলা থেকেই আমি আখতার হামিদ খানের নাম শুনেছি। এ ধরনের মানুষ চিরকালই কম ছিল আর এখন তো বিরল। ১৯৩৬ সালে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ভারতবর্ষের ঈর্ষণীয় সেরা চাকরি আইসিএস-এ। কিন্তু ১৯৪৫ সালে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেন চাকরি ছেড়ে দিলেন? লিখেছেন তিনি, ‘ব্রিটিশ শিক্ষকদের কাছ থেকে আমার শেখার আর কিছু ছিল না। *I needed a different kind of apprenticeship*। সেজন্য চাকরি ছেড়ে দিলেন। তিনি লিখেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ শাসন ও ইনসিটিউশনগুলোর ক্ষয় হচ্ছিল। সুতরাং তিনি সেই ‘ডাইং সিসটেমে’র অংশ থাকতে চাচ্ছিলেন না।

আইসিএস থাকার সময় আখতার হামিদ খান আল্লামা মাশরেকির অনুসারী ছিলেন। তাঁর মেয়েকেও বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু আইসিএস ত্যাগের পর মাশরেকি বা দার্শনিক নিঃসের ভক্ত আর তিনি থাকেননি। তিনি বলেছেন ‘*The superman without compassion*’ আর তিনি থাকতে চাননি। গরিব লোকেরা যখন হজ্জুর বলে পায়ে পড়ত তখন তিনি লজ্জা পেতেন। স্বদেশীদের জেলে পাঠালে বিবেকের দংশন হতো। তখন তাঁর মনে হয়েছিল এই *Supermanship* আসলে ভাওতাবাজি। তিনি অন্য ধরনের জীবন চেয়েছিলেন, যে জীবন হবে *a life free from fear and anxiety, a calm and serene life, without turmoil and conflict.*’ তখন তিনি সুফিবাদের দিকে ঝুঁকলেন।

চাকরি ছেড়ে আখতার হামিদ আলিগড়ে দু’বছর শ্রমিকদের সঙ্গে থেকেছেন, শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন। তারপর দিল্লীর জামিয়া মিলিয়ায় পড়িয়েছেন। এরপর আসেন কুমিল্লায় ভিট্টোরিয়া কলেজের প্রিসিপাল হিসেবে। আবদুর রহিম বলেছিলেন, তাঁরা যখন ছাত্র, তখন দেখেছেন আখতার হামিদ উদ্বাস্তুদের তালা বানানো শেখাচ্ছেন যাতে তারা উপার্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এলে বিখ্যাত কুমিল্লা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। আখতার হামিদ খানকে নিযুক্ত করা হয় এর পরিচালক। এতোদিন পর যেন মনের মতোন কাজ খুঁজে পেলেন আখতার হামিদ খান। বাকিটুকু ইতিহাস যা এদেশের প্রায় সবাই জানা।

সন্ধ্যায় আবদুর রহিমের বাসায় পৌছে দেখি অতিথিদের অনেকেই চলে এসেছেন। সবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো। একজন পুরনো আইসিএস অফিসারও ছিলেন।

সবার শেষে পরিচয় হলো আখতার হামিদ খানের সঙ্গে। লম্বা, বয়স আশির ওপর বা ছুই ছুই কিন্তু এখনও স্বাস্থ্যবান। চোখে শুধু ভারী চশমা। কথা বলেন ধীরে। সঙ্গে স্তৰী সফিক ও কন্যা আয়েশা। কুশল বিনিময়ের পর বললাম, ‘আমি আপনার বইটি দেখেছি। এখনও কেনা হয়নি।’ আমার কথা থামিয়ে বললেন, ‘আপনার জন্য এক কপি নিয়ে এসেছি।’ পাকিস্তানের ‘অক্সফোর্ড’ তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ—‘ওরাসী পাইলট প্রজেক্ট’ রেমিনিসেন্স অ্যান্ড রিফ্লেকশন’ প্রকাশ করেছে। এছে ওরাসী প্রজেক্ট ও তাঁর কিছু আত্মজৈবনিক রচনা সঞ্চলিত হয়েছে। বললেন, ‘পারলে দু’এক লাইন লিখে দিয়েন।’ বইয়ের সঙ্গে ওরাসী সম্পর্কিত কিছু রিপোর্টও দিলেন। এখানে বলে রাখা ভাল, বাংলা তিনি বোঝেন এবং এখনও কিছু বলতে পারেন। জিজেস করলেন, ‘ওরাসী গেছেন। চলে আসুন কালকে।’

‘ওরাসী যেতে চেয়েছিলাম’, অপরাধীর সুরে বললাম, ‘কিন্তু, সময় করতে পারিনি। তা’ ছাড়া চলে যাচ্ছি পরশু। দু’এক ঘণ্টার জন্য ওরাসী যেতে চাই না।’

‘তা ঠিক’, বললেন আখতার হামিদ, ‘দিন দুয়েক না হলে ওরাসী যেয়ে লাভ নেই।’

উল্লেখ্য যে, উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে এখন ওরাসী পরিচিত। করাচীর ঘনবসতিপূর্ণ এক বন্তি এলাকা ওরাসী। আখতার হামিদ খানের চেষ্টায় সেই ওরাসী এখন পরিচ্ছন্ন ও স্বনির্ভর হয়েছে। বিশেষ করে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে যে কাজ তিনি করেছেন তা দেখার মতো। এত কম খরচে এ ধরনের কাজ ভাবা যায় না এবং বন্তিবাসীরা পুরো কাজটি সম্পন্ন করেছে তাদের খরচে। বললাম, ‘এবার শুনেছি ম্যাগাসাইসাই পুরক্ষার আপনাকে দেয়া হচ্ছে।’ শুনে শুধু হাসলেন। পুরক্ষার এখন তাঁর কাছে এ বয়সে অর্থহীন। কারণ গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি যে কাজ করেছেন তাঁর জন্য কয়েকবার তাঁর পুরুষ্ট হওয়ার কথা।

‘ওরাসী আপনি শুরু করলেন কিভাবে?’

‘বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলে আমি চলে এলাম পাকিস্তান’, থেমে থেমে নিচু গলায় বললেন তিনি, ‘দু’ দুবার মোহাজের হলাম। হয়ত পাপ করেছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, পেশোয়ার এ্যাকাডেমিতে আবার কুমিল্লা মডেলে কাজ শুরু করব। কিন্তু আমার বন্ধু শোহেব সুলতানকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। ভুট্টো তখন ঘোষণা করেছেন, এটি হচ্ছে নতুন পাকিস্তান। তখন বুঝলাম, এই নতুন পাকিস্তানে কুমিল্লা প্রোগ্রাম, গ্রাম-উন্নয়ন, থানা সেন্টার, কৃষক সমবায় যেগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আইয়ুব খান ও হার্ভার্ড বিশেষজ্ঞরা, তাঁর কোন স্থান নেই। ষাট বছর বয়সে আঁস্তাকুড়ে নিষ্কিঞ্চ হলাম। সেখান থেকে হঠাতে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে রিসাইকেল করার জন্য উন্নয়ন প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক বানিয়ে দিল। পাঁচটি পরিত্ন বছর কাটাবার পর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশী ছাত্র আমাকে ক্লান্ত করে তুলল। ডেরা গুটিয়ে ফিরে এলাম করাচী যা আসলেই বিভিন্ন রকমের

বাস্তুহারাদের আশ্রয়কেন্দ্র- শহর। ভাবলাম, বাকি কয়েকটি বছর সুফি সাহিত্য পড়ে নিরিবিলি কাটিয়ে দেব। ১৯৮০ সালে বিসিসিআই ব্যাংকের আগা হাসান আবেদী ও ইবন হাসান বার্নি দেখা করে বললেন, ‘আমার সময়ের অর্ধেক যেন আমি ওরা�ঙ্গী পাইলট প্রজেক্ট ও বাকী অর্ধেক মৃত্যু প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করি।’

ওরাঙ্গীর আয়তন প্রায় ৮০০০ একর। প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রায় এক লক্ষ ঘরে বাস করে। এখানে আছে মোহাজির, বিহারি, বালুচি, সিঙ্কি, পাঠান, বাস্তুহারা। প্রায় সবাই শ্রমিক। ১৯৬৫ সালে এ বন্ডির আবাদ। আগা হাসান আবেদীকে আখতার হামিদ বলেছিলেন, এ প্রকল্প শেষের কোন নির্ধারিত সময় থাকবে না, কোন নির্দিষ্ট টার্গেটও থাকবে না। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। শুধু খরচের হিসাব জমা দেবেন বিসিসিআই ফাউন্ডেশনে। আবেদী তাতেই রাজি হলেন। আখতার হামিদ খান আবার কাজ শুরু করলেন। আজ সেই পাইলট প্রজেক্টটি বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

‘কাজ এখন শুরু করলেন এবং পরে প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী ছিল?’ জিজেস করি আমি।

‘আসলে যেহেতু এটি সরকারী কোন অর্থানুকূল্যে হয়নি সেজন্য আমি মুক্ত ছিলাম।’ বললেন আখতার হামিদ খান, ‘প্রথম কাজটা হলো বিশ্বাস অর্জন করা ও বিষয়টি তাদের শেখানো। আমি যেহেতু শ্রমিকও ছিলাম এক সময় সেজন্য তাদের ভাব বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আসলে সমস্যাটা হয় পরে। যখন প্রকল্প সফল হতে শুরু করল যখন জাতিসংঘ সাহায্য করতে চাইল। তারা পাঠাল উপদেষ্টা। এখন সমস্যাটা হচ্ছে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন এবং তাই প্রয়োগ করতে চান। প্রথম দিকে তাঁদের উপদেশ আমার কাজে আসত না। তাঁরা জোর করতেন। পরে দেখা যেত তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের ক্ষেত্রে কাজ করছে না। এক সময় তাঁদের উপেক্ষা করে নিজেদের মতই কাজ করতে লাগলাম এবং সফল হলাম। উপদেষ্টারাও এক সময় বিদায় নিলেন।’

‘আমাদের দেশেও সেই একই অবস্থা। চাপিয়ে দেয়া উপদেষ্টাদের হাত থেকে বাঁচা যাচ্ছে না। এমনও আছে ভবঘুরেকে এনে উপদেষ্টা বানানো হয়েছে।’

আখতার হামিদ খান হাসলেন। পার্টিতে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। আমাকেও উঠতে হলো। আরেকজন আইসিএস ছিলেন। তাঁর সঙ্গে খানিক কথা বললাম। লিয়াকত আলী, চুন্দিগড়ের ছেলে, সোহরাওয়ার্দীর নাতনির সঙ্গে আলাপ হলো। তবে তা কুশলাদি বিনিয়য়ের পর খুব একটা এগোল না। কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হলো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আর ফেরেননি। ভালোই আছেন। কোন অভিযোগ নেই। ঘটা আধেক পর আবার ফিরে গেলাম আখতার হামিদ খানের কাছেই। জিজেস করলাম, ‘আপনাদের ক্যাডারে এখন বোধ হয় অনন্দাশংকর রায়ই জ্যেষ্ঠ।’

‘তিনি এখনও বেঁচে আছেন।’ বিস্মিত হলেন তিনি, ‘আমি যখন চাটগাঁয় তখন তিনি জজ ছিলেন সেখানে। তাঁকেও তো তা’হলে আমার একটি বই পাঠাতে হয়।’

‘বাংলাদেশে কি ফিরবেন? ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘জেনারেল জিয়া যখন প্রেসিডেন্ট,’ উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে বললেন তিনি, ‘তখন বলেছিলেন, ঢাকায় ফিরতে। আমি কী কাজ করতে চাই তাঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি বললেন, ডিসিদের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমি বললাম, তা’হলে আর আমার দরকার কী, আপনিই করতে পারেন।’

‘এখন না হয় চলে আসুন।’ বললাম আমি।

‘জেনারেল এরশাদ আমাকে নাগরিকত্ব দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, যেভাবে কাজ করতে চাই সেভাবেই হবে। আমি তখন গিলগিটে একটি প্রকল্প শুরু করেছি। একেবারে ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন কুমিল্লায় ডিরেক্টর ছিলেন হাসনাত আব্দুল হাই। আমি জানালাম, আমি তিন-চার মাস পর পর আসতে পারি কাজ বুঝিয়ে দিতে ও বুঝে নিতে। কিন্তু এ ব্যাপারে বোধ হয় হাসনাত আব্দুল হাই রাজি ছিলেন না। তাই প্রস্তাবটি ঢাকা পড়ে যায়।’ বোঝা গেল, করাচী ছেড়ে এ বয়সে তিনি আর নড়বেন না।

খাবার ডাক পড়ল। অল্প সময়ে রহিম দশ্পতি বিশাল আয়োজন করেছেন। অতিথিরা খেতে কেউ কার্পণ্য করলেন না। আমি এতক্ষণ যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁদের কারও সঙ্গে সৌজন্যবশত ১৯৭১ নিয়ে আলাপ করিনি। খেতে খেতে আলাপ হলো, বাওয়ানী পরিবারের একজনের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনাদের তো কিছু ব্যবসা ছিল ঢাকায়।’

‘হ্যাঁ,’ বললেন তিনি, ‘আমরা সেগুলি ফিরে পেয়েছি। আমার বাবা ঢাকায়ই থাকেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি বলতেন, করাচী তাঁর ভালো লাগে না। ঢাকাতেই তিনি আরাম পান।’

‘তা পাকিস্তানের হালচাল কী?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘আপনি বুঝেন না,’ মুরগীর রান চিরুতে চিরুতে বললেন তিনি, ‘ত্বরান্বিত বাকী নেই। আপনারা স্বাধীন হয়ে খুব ভাল করেছেন।’

ছিলেন? অক্সফোর্ড থেকে আমেনা বলেছিলেন, ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী ১৯৭১ সালে ছিলেন সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক। তার মানে, ১৯৭১ সম্পর্কে তাঁর কাছে বেশ কিছু খবরাখবর থাকতে পারে। আমেনা আরো জানিয়েছিলেন, তিনি ইদানীং কলামন্ লিখছেন, একটি বইও বেরিয়েছে। আমি ডেপুটি হাই কমিশনার আদুর রহিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে গত এক মাসের পত্রপত্রিকার ফাইলটি খুঁজে নিই। দেখি, ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে বেশ কিছু লেখা লিখেছেন। ‘ডিফেন্স জার্নাল’ নামে একটি সাময়িকপত্রও সম্পাদনা করেন। সম্প্রতি তাঁর একটি বইও বেরিয়েছে, নাম- ‘দি মিলিটারি ইন পাকিস্তান: ইমেজ অ্যান্ড রিয়ালিটি’।

ইতোমধ্যে ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর বইটি সংগ্রহ করে পড়ে ফেলি। বইয়ের শুরুতেই এক প্রাঞ্জ ব্যক্তির মন্তব্য উন্মৃত করেছেন- “Countries which worship armies tend to use armies.”। ভাবি, যখন কেউ সেনাবাহিনীতে থাকে তখন কেন একথা মনে রাখে না?

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর বইটি তথ্যবহুল। ১৯৭১ সাল সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। তাঁর বইটি পড়লে সাক্ষাৎকারের আর তেমন প্রয়োজন পড়ে না। মোদ্দা কথাটা জানা যায়। তবুও একটা কিন্তু থেকে যায়। সাক্ষাৎকারের সময় এমন অনেক কথা অনেকে বলে ফেলেন যা হয়ত তিনি লিখতেন না।

করাচীতে আজ আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারের দিন। সকালে ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর সঙ্গে এবং বিকেলে বেনজীর ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। কাল, আফসান চলে যাবে ঢাকা। আমরা আগামীকাল থাকব। পরের দিন সকালে চলে যাব লাহোর।

গতকাল হাই কমিশনের ডিনার সেরে ফিরেছি দেরীতে। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর বাসায় যেতে হবে ১১টায়। সকালে তাই নাস্তা সারতে সারতে বেজে গেল ৯টা। মহিউদ্দিন ভাই বেরিয়ে গেলেন কিছু খালি ক্যাসেট আর ব্যাটারি কিনতে। আমি কাছে ধারে ঘুরে ফিরে সদরের পুরনো চেহারাটা ভাবার চেষ্টা করলাম। জাফরি কাটা ব্যালকনিসহ পুরনো কিছু অট্টালিকা নজরে পড়ল। দু’একটি ঘিঞ্জি গলিতে এখনও আগেকার করাচীর স্বাদ পাওয়া যায়।

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর বাড়িও ডিফেন্স আবাসিক এলাকায়। তিনি পুরনো অফিসার। জমি পেয়েছেন ডিফেন্সের প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে। তখন হয়ত জায়গাটি অভিজাত ছিল। এখন পুরনো ঘিঞ্জি এলাকা, অনেকটা ওয়ারীর মতো। তাঁর বাসা খুঁজে পেতে বেশ সময় লাগল। ১১টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, পৌছলাম আধ ঘণ্টা পর।

দরজায় কলিং বেল টেপার পর শান্ত্রী গেল খবর দিতে। তারপর দরজা খুলে দিল। সামনে লন। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। দোতলায় ‘ডিফেন্স জার্নাল’ ও তাঁর অফিস। নীচে বোধ হয় থাকেন।

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী আন্তরিকভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি ‘পিআরম্যান’, জানেন কীভাবে কী করতে হয়। আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁর লেখা কিছু কাটিং ও বইটি এগিয়ে দিলেন। জানালেন, ‘ডিফেন্স জার্নাল’-এও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমি যেহেতু তাঁর সাম্প্রতিক লেখাগুলি পড়েছি সেহেতু যেসব বিষয়ে আগ্রহ দেখালাম না। মহিউদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আগেই আলাপ হয়েছিল। আমরা তাঁর থেকে এমন কিছু বিষয় জানতে চাছিলাম যা বইতে নেই।

প্রথম পনেরো মিনিট নানাবিধ আলাপ-আলোচনার পর হঠাতে মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা, ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী, আমরা এখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি, পাকিস্তানীরা এক সময় পূর্ব পাকিস্তানকে লায়াবিলিটি ভেবে এসেছে?’

‘এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই,’ দৃঢ়ভাবেই বললেন সিদ্দিকী, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে, ‘একেবারে গোড়া থেকেই এ ভাবনা ছিল। আমি একটা উদাহরণ দিই। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান স্বাধীন হলো। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষ বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তানের স্বষ্টা, গুর্বন্ত জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ দিল্লী থেকে ঢাকা না গিয়ে করাচী গেলেন কেন?’

সত্যিই তো ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করিনি। জিন্নাহ ঢাকা গেলেন এক বছর পর এবং গিয়েই বাঙালীদের সংস্কৃতিতে আঘাত হানলেন। ‘তা’ হলে, জিজ্ঞেস করি আমি, ‘আপনি কী বিশ্বাস করেন হিন্দুরা প্রভাবাব্ধিত করেছে বাঙালীদের? বাঙালীদের তারাই উক্ষেছে স্বাধীনতার জন্য? আপনাদের এখানে অনেকে তা বিশ্বাস করে।’

‘এগুলি একেবারে বাজে কথা,’ বললেন সিদ্দিকী, ‘আমি শুনেছি এবং অনেকে লিখেছেনও যে, হিন্দু শিক্ষকরা বাঙালী তরুণদের প্রভাবাব্ধিত করেছে— এগুলোর কোন মানে হয় না। আমার তো মনে হয়, বাংলাদেশ কখনও সেভাবে সেপারেশন চায়নি।’

‘আপনি সিদ্দিক সালেকের বইটি পড়েছেন?’ জিজ্ঞেস করল আফসান।

সিদ্দিক সালেকের ‘উইটনেস টু সারেভার’ মুক্তিযুদ্ধের ওপর কোন পাকিস্তানীর লেখা বোধ হয় প্রথম বই। ব্রিগেডিয়ার জানালেন বইটি পড়েছেন কিন্তু সালেক সম্পর্কে দেখলাম তাঁর মনোভাব বিরূপ। তিনি জানালেন, সালেক তাঁর অধীনে কাজ করেছেন। ঐ বইতে এমন অনেক তথ্য আছে যা সঠিক নয়। তিনি জিএইচকিউকে খুশি করার জন্য বইটি লিখেছিলেন। পুরস্কৃতও হয়েছিলেন। তার প্রমাণ চট্টগ্রাম সব প্রমোশন। পরে জেনারেল জিয়াউল হকের সঙ্গে প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত হন। সিদ্দিক সালেকের বই সম্পর্কে পাকিস্তানে এমন মন্তব্য অনেকেই করেছেন।

‘আপনিতো নীতিনির্ধারকদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।’ জিজ্ঞেস করি।

‘হ্যাঁ, আমি জড়িত ছিলাম জিএইচকিউর সঙ্গে। ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন-এর ডি঱েন্টের পদে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল অর্থাৎ সামরিক শাসনের ঐ সময়টায় সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় প্রচারের কাজ আমাকে করতে হয়েছে। সে কারণে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।’

‘মার্চ মাসে ঢাকায় ছিলেন আপনি?’ জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘হ্যাঁ, ছিলাম,’ বলেন ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী, ‘ঢাকায় গিয়েছিলাম ১৬ মার্চ। ফিরেছি ১ এপ্রিল। ২৫ মার্চ ঢাকায় ছিলাম।’

‘কি হয়েছিল ২৫ মার্চ?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘২৫ মার্চ রাতে দেখলাম, ‘দি পিপল’ আফিস জুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আমাকে অবশ্য পাবলিক রিলেশনস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রাত্তাঘাটে ২৬ মার্চ লাশ পড়েছিল। কার্ফু তুলে নেবার পর লোকজন পালাচ্ছিল শহর থেকে।’

বোঝা গেল-এর বেশি তিনি কিছু বলতে চাইছেন না।

‘জেনারেল উমর ও আরও অনেকে বলছিলেন,’ বললাম আমি, ‘যে, তাঁরা ২৫ মার্চ ঢাকায় থাকা সত্ত্বেও তেমন কিছু দেখেননি বা তেমন কিছু জানতেন না।’

‘এটা কী বিশ্বাসযোগ্য,’ বললেন সিদ্দিকী, ‘জেনারেল উমর ওয়াজ পার্ট অফ ইট। তিনি সব কিছুই জানতেন। আমাকে ২৫ মার্চের ঘটনার পর বলেছিলেন, ‘আরে মন খারাপ করে আছ কেন? চিয়ার আপ। জেনারেল জ্যাকবও বলেছেন, ‘উমর ওয়াজ ইয়াহিয়াস ব্রাদার।’

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর সচিব এ সময় চা নিয়ে এলেন। চা খেতে খেতে আমরা সাধারণভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ে আলাপ করতে লাগলাম। সিদ্দিকী পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করছিলেন, চাকরিতে থাকাকালীন সেসব করার সাহস নিশ্চয় তাঁর ছিল না। তাঁর মতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সব সময় শৌর্যবীর্যের একটি মিথ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তারাই ইতিহাসের সৃষ্টা-এ কথাটাই তুলে ধরতে চেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, তাতে সে সফল হয়নি। জনসংযোগের প্রধান হিসাবে ১৯৭১ সালে তাঁকে জেনারেলদের এ্যাবসার্ড সব পরিকল্পনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, একটা সময় বাস্তবতার সঙ্গে তারা যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছিল। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী রণকৌশলেরও কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তাঁর মতে ‘affordable defence is good defence.’। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহিউদ্দিন ভাই প্রশ্ন রাখলেন, ‘১৯৭১ সালে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, আর এখানকার মানুষ কিছু জানল না, এটা কেমন কথা?’

‘দেখুন’, বললেন সিদ্দিকী, ‘ঘটনাটা ছিল এরকম। টিক্কা খান ভেবেছিলেন ২৫ মার্চের এ্যাকশনে ১০ এপ্রিলের মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এ ধারণা তাঁর কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক রাজনীতিবিদ ও জেনারেলও তাই মনে করতেন। তাঁরা মানুষের ক্ষেত্রে গভীরতা বোঝে নি। ভুলটা ছিল সেখানে। অন্যদিকে মিলিটারি এ্যাকশনের বিরুদ্ধে এখানে কোন অর্গানাইজড প্রটেস্ট হয়নি। হলে, ঘটনা এত দূর গড়াত না।’

‘আপনি জেনারেল নিয়াজীর বইটি পড়েছেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি, ‘নিয়াজী বা তাঁর বই সম্পর্কে আপনার মতামত কী?’

‘আমি সে সময় ঢাকায় প্রায়ই যেতাম। আমার কাজই ছিল তা। বিদেশী রিপোর্টারদের সামলানো, জিএইচকিউ যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে পৃথিবীকে বোঝানো ইত্যাদি। নিয়াজীর সঙ্গে তখন আমার দেখা হতো। তাঁকে আমি সর্বশেষ দেখি পহেলা অস্ট্রোবর। নিয়াজী ভাবত সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে। নিয়াজী ‘like a fool he was, thought he was in control’, যেটি ছিল হাস্যকর। ২১-২২ নবেম্বর ভারত আক্রমণ করল। আমরা যে সব সিচুয়েশন রিপোর্ট পাছিলাম সবই ছিল হাস্যকর।’ একটু থামলেন তিনি। আমি লক্ষ্য করলাম, অন্য আরও অনেকের মতো তিনি বিষয়টিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসাবেই মূলত দেখছেন। ‘১১ ডিসেম্বর’, আবার শুরু করলেন তিনি, ‘জেনারেল গুল হাসান আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, ইন্ট পাকিস্তান ইজ লস্ট। আমি স্টান্ড হয়ে গেলাম যদিও জানতাম তা সময়ের ব্যাপার মাত্র।’

‘রণবিদ হিসাবে নিয়াজী কেমন?’ আফসান জিজ্ঞেস করে। ‘নিয়াজী একজন মেজর হিসাবে ভাল, জেনারেল হিসাবে ওয়ার্থলেস’, তাঁর চাঁচাছোলা উত্তর, ‘দেখুন, জেনারেল নিয়াজী ও জ্যাকবের বই দু’টি আমি পড়েছি। দু’জনের বলার ধরনটি একই রকম। দু’জনেই যা করেছেন, একাই করেছেন, সুপারম্যানের মতো। তাঁদের সুপিরিয়ররা কিছুই নন। একজন জেনারেল কী এ ধরনের উক্তি করতে পারেন?’

‘রাও ফরমান আলীর বইটি আপনি পড়েছেন কী না জানি না’, বললাম আমি, ‘তাঁর বই পড়ে মনে হয় তিনি কিছুই জানতেন না, অথচ গণহত্যার পুরো সময়টা তিনি সেখানে ছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?’

‘তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের চার্জে মেজর জেনারেল। সেখানে তিনি জানবেন না কিন্তু কোন ঘটনা ঘটবে এটা সম্ভব ছিল না। ফরমান ইজ দ্য ম্যান যে হয়ত বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপার জানত। I never trusted him. He always weared a mask, ruthless.’।

‘আর ভুঁটো?’

‘তিনি চাহিলেন শুধু ক্ষমতা আর ক্ষমতা। আর কোন বোধ ছিল না তাঁর। আর্মির সমর্থন ছিল তাঁর প্রতি। আর্মি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে আর ভূট্টো ছিলেন তাদের মুখ্যপাত্র। ফ্যান্টাস্টিক সব কাহিনী বলতেন তিনি— ট্যাংক নিয়ে তিনি লড়বেন ইত্যাদি। হি ওয়াজ এ ডিজাস্টার পার এক্সেলেন্স।’

॥ ১৬ ॥

বেনজীর ভূট্টোর অফিস থেকে জানানো হয়েছে সন্ক্যার সময় তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। দুপুরের মধ্যে বিগেডিয়ার সিন্দিকীর সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে এসেছি। পড়ত বিকালে আমরা আবার বেরোলাম করাচী দেখার জন্য। পুরনো ক্লিফটন এলাকায় খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। তারপর এলাম নতুন ক্লিফটনে। বেনজীর ভূট্টো এখানেই থাকেন স্বামীর সঙ্গে।

সন্ক্যার ঠিক আগে পৌছলাম বেনজীরের বাসায়। মূল গেটে সেপাই-শান্ত্রী দাঁড়িয়ে। তারপর খানিকটা ‘নো-ম্যানস ল্যান্ড’র মতো জায়গা। এরপর আরেকটি ফটক। শান্ত্রী জানাল, এদিক দিয়ে আমাদের যেতে দেয়া হবে না। পিছনের দিকে একটি ফটক আছে। সেটি দিয়ে আমাদের ঢুকতে হবে।

পিছনের ফটকে গেলাম। বাইরে কয়েকজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। তারপর জেলখানার মতো উঁচু এক প্রাচীর। বাইরে গাড়ি পার্ক করে শান্ত্রীদের নাম বলতে হলো। ভিতর থেকে খবর এল আমাদের যেতে দিতে। ছোট একটি গেট খুলে গেল। আমরা ভিতরে ঢুকতেই একজন অপেক্ষা করার ঘরটি খুলে দিল। আমরা তিনজন, আমেনা সাঙ্গী ও তাঁর স্বামী ভিতরে বসলাম। লক্ষ্য করলাম, এ ঘরে রাখা আছে একটি ক্যামেরা। অন্যান্য জায়গায়ও থাকতে পারে। বেনজীর ভূট্টো তখনও ফেরেননি। মিনিট পনেরো পর জানা গেল তিনি ফিরেছেন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বেনজীরের এক সহকারীর সঙ্গে রওনা হলাম। সরু দুয়েকটি করিডর পেরিয়ে মনে হলো মূল বাড়ির পিছনে এলাম। পাশে এক চিলতে লন। গাছের ফাঁকে পাখির খাচা। বন্দী পাখিরা কিচির মিচির করছে। বাড়ির সামনের পোর্টিকোতে চলে এলাম। মূল দরজায় ঢুকতেই দেখি বেনজীর দাঁড়িয়ে। সহাস্যে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ভিতরে নিয়ে বসালেন আমাদের। প্রকাশনার সূত্রে হয়ত তাঁর সঙ্গে আমেনার খানিকটা আলাপ আছে। তাই আমেনার কাছে প্রকাশনা জগতের কিছু খবর জানতে চাইলেন। পাকিস্তান কেমন লাগছে জানতে চাইলেন আমাদের কাছে। তারপর হঠাৎ দুর্নীতি বিষয়ে বলতে লাগলেন।

একটি বিষয় লক্ষণীয়। বেনজীর কথা বলতে ভালবাসেন। একবার কথা শুরু করলে তাঁকে থামান মুশকিল। অনগ্রহ বলে যেতে থাকেন যতক্ষণ না তাঁর মনে হয় শ্রোতা কনভিন্সড হয়েছে। তিনি অবশ্য উচ্চ স্বরে বলেন না।

আমি লক্ষ্য করছিলাম, যে বেনজীর আমাদের সামনে বসে আছেন সে বেনজীর এখন অসম্ভব সঙ্কটের মুখোমুখি। পাশে তাঁর স্বামী, সন্তান, আঞ্চীয়-স্বজন কেউ নেই, অথচ এ বেনজীরকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। অসম্ভব পরিপাটি, আবেগপূর্ণ গলায় কথা বলে চলেছেন। কিন্তু মনে হবে না তা বিদ্রেষপ্রসূত। বেনজীরের মূল বক্তব্য ছিল, তাঁকে বা তাঁর স্বামীকে এখন করাপশনে জড়িয়ে ফেলার যে চেষ্টা চলছে তা রাজনৈতিক। ঐদিনই করাপশনের চার্জে ধরা হয়েছে পাকিস্তানের স্টীল কর্পোরেশনের প্রধানকে কোটি কোটি টাকা আঞ্চাতের জন্য। বেনজীর তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন। কোথাও কোথাও ইঙ্গিত করা হয়েছে তাঁর সঙ্গেও যোগ ছিল বেনজীরের। একথা উঠতেই তিনি বললেন, ‘একটা দেশে কত সরকারী কর্মচারী বদলি হয়, নিযুক্ত হয়, প্রধান মন্ত্রী কী তার সব জানেন না মনে রাখেন? আচ্ছা সে কথা বাদ দিই। এ লোকটির আমলে স্টীল কর্পোরেশন কত লাভ করেছে তা কেউ বলছে না। আগে তো এই কর্পোরেশন ছিল শ্বেতহস্ত।’ তিনি কী বলতে চাইছিলেন যে, করাপশন থাকবেই। যে করাপশন করছে সে যদি নিজে টাকা মেরে দেশকে কিছু দেয় তা হলেও লাভ! ঠিক বুঝলাম না।

তৃত্য এ সময় রূপোর ট্রেতে করে দামী গ্লাসে সরবত নিয়ে এল। সরবত খেতে খেতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য বললাম। সানন্দে তিনি সম্মতি জানালেন। বলে রাখি, টানা এক ঘন্টারও বেশি কথা বলেছেন বেনজীর, আমরা প্রশ্ন করার তেমন সুযোগ পাইনি বা করার প্রয়োজনও ছিল না। এখানে শুধু তাঁর মূল বক্তব্যটিই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

‘আচ্ছা, ১৯৭১ সাল সম্পর্কে কী আপনার কিছু মনে পড়ে?’— মহিউদ্দিন ভাই শুরু করলেন।

‘১৯৭১ সালে ছিলাম আমি ছাত্রী। বললেন বেনজীর, বাংলাদেশ এ সময় স্বাধীন হয়। আমার বাবা হন প্রধান মন্ত্রী। সেনাবাহিনী আমার বাবাকে প্রধান মন্ত্রী হতে দিতে চায়নি। কিন্তু মানুষ রাস্তায় নেমে এলে আর তারা সাহস করেনি।

আমার বাবা বলেছিলেন, ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, শেখ মুজিব সবকিছুর মূল। তাঁকে আগে হত্যা না করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। এ ভুল না হলে পাকিস্তানের এ দশা হতো না। বাবা বলেছিলেন, শেখ মুজিবকে হত্যা করা ঠিক হবে না। তিনি বাঙালীদের নেতা। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের সঙ্গে হয়ত একটা সেতুবন্ধন গড়ে উঠতে পারে। তিনি না থাকলে সে কাজটি কঠিন হবে।

আমার বাবা ক্ষমতা নেয়ার পর দেখা করলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। বললেন, আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। এরপর তাঁরা কোলাকুলি করলেন। সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালেন। বাবা তাঁকে যা বলেছিলেন তার সারাংশ হলো: যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন অনুরোধ, এমন কিছু একটা করুন, যাতে পাকিস্তানকে একত্রে রাখা যায়। শিথিল একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশনও হতে পারে। শেখ মুজিব বলেছিলেন, তিনি সে চেষ্টা করবেন, তবে তার আগে দেশে ফিরে তাঁকে সব জানতে হবে। বাবা বলেছিলেন, কনফেডারেশন হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতি মেনে নেবেন এবং কনফেডারেশনের শীর্ষ পদ যদি বাঙালীরা ভোটে জেতে তাও মেনে নেবেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, সোজা ঢাকা না গিয়ে যাতে তিনি লভন হয়ে যান, সেখানে খানিকটা ভাবনা-চিন্তার অবকাশ তিনি পাবেন। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকা ফিরেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে বিবৃতি দিলেন। দেখুন, আমাদের প্রজন্মের অনুভূতি হলো, উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল যদি কনফেডারেশনের সূত্রেও গাঁথা হয় তা'হলেও তা হবে উভয় দেশের কল্যাণের প্রতি এক ধাপ এগোনো। আমরা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে একটা সমরোতায় আসতে চাই, যে বৈরী ভাব আছে তা ঘেড়ে ফেলতে চাই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালীর পুঁজীভূত ঘৃণা ছিল যার কারণ অনুমিত অভিযোগ। অনুমিত হামলার। যুদ্ধ বড় নোংরা জিনিস তা গৃহ্যুদ্ধ বা বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধ, যা-ই হোক না কেন। যুদ্ধের সময় অনেক কদর্য ঘটনা ঘটে, যা অনিবার্যভাবে ক্ষতের দাগ রেখে যায়।

বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা যে সময় একটা সমরোতায় পৌছতে চাছিলাম সে সময় পরিবেশও আমাদের অনুকূলে ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানেও বাঙালীদের অনুমিত নিষ্ঠুরতা নিয়ে আবেগানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় সুযোগ আসে ইসলামী সংযোগের। বাংলাদেশকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করার ও শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পাকিস্তানকে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র অনুরোধ জানায়। আমার মনে আছে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবকে মাঝে রেখে আমার বাবা ও গান্দাফী এবং আরাফাত উঠে দাঁড়ান। জনতা তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দন জানায়।

এ সময় অনেক বিতর্কিত ইস্যু ছিল। ৯০,০০০ বন্দী সৈনিককে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একটি দর কষাকষির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছায়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে পাওনা সম্পদের একটি ইস্যু ছিল, যা এখনও অমীমাংসিত। বাংলাদেশ বিহারীদের আটকে পড়ার ব্যাপারটিও ছিল।'

'পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বী এই বিহারী ও বাংলাদেশের দায়দেনা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?' অনেকক্ষণ পর মহিউদ্দিন ভাই একটা সুযোগ পেলেন প্রশ্ন করার।

'আমি প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর', আবার ঝাড়ের বেগে শুরু করলেন বেনজীর, 'আমার মনে হয়েছে, নতুন এক প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে, যারা পাকিস্তান সম্পর্কে অনেক

কিছু জানে না। এদের জন্য বাংলাদেশে। পাকিস্তান সমজাতীয় কোন দেশ নয়। সেজন্য জাতিগোষ্ঠীগত প্রচুর আবেগ-অনুভূতি রয়ে গেছে। সুতরাং বিহারীদের এখানে পুনর্বাসিত করতে হলে আগে ভালভাবে একটি আদমশুমারি করতে হবে এবং বাংলাদেশেও বিহারীদের একটি আদমশুমারি করতে হবে। আর পাকিস্তানের জাতিগত সমস্যার কারণে সব বিহারীকেই পাকিস্তান পুনর্বাসিত করতে পারে না। সেজন্য ওআইসির আওতায় একটা সমাধানে আসতে হবে অর্থাৎ ওআইসিভুক্ত প্রতিটি মুসলমান দেশই কিছু কিছু বিহারীকে পুনর্বাসিত করবে যাতে চিরদিনের মতো সমস্যাটির সমাধান হয়।

মোট কথা গৃহ্যদ্বৰ্তী ভয়ঙ্কর ক্ষত থাকলেও দু'দেশের জনগণের পরম্পরের প্রতি রয়েছে ভালবাসা। আমার মনে হয়েছে, দু'দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলা উচিত।'

'বাংলাদেশের তা মনে নাও হতে পারে,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি বিশ্বাস করি', বললেন বেনজীর, 'দু'টি দেশই এখন উপলব্ধির দিক থেকে পরিণত। আমরা স্বীকার করি, বাংলাদেশের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। আপনাদের দেশের মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং নিজ নিজ স্বার্থ উভয়কেই দেখতে হবে। তবে বিভিন্ন মাধ্যমে, যেমন মতবিনিময়, ভ্রমণেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে। ১৯৮৫ সালে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার লন্ডনে দেখা হয়েছে। আপনাদের প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের দু'জনের বয়স ছিল তখন কম এবং আবেগ, উত্তেজনাও ছিল বেশি। এরপর আবার আমাদের দু'জনের দেখা হয়েছে, তখন তা যথেষ্ট প্রশংসিত।'

বেনজীরের কথায় ছেদ পড়ল। পরিচারক নাস্তা নিয়ে হাজির। 'এই কেকটি ঘরে তৈরী', চকলেট কেকটি দেখিয়ে বললেন বেনজীর, 'আর কিছু না খান, এটা খান।' নিজেই কেক কেটে সবার প্লেটে তুলে দিলেন। খাবারের পর চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন, 'দেখুন, আমাদের দু'টি দেশের ওপর দিয়েই অনেক বাড়োপটা গেছে। ডিস্ট্রেক্টরের শাসন ছিল দু'দেশে। আবার দু'টি দেশই গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন হয়েছে।'

'কিছুদিন আগে ঢাকায় গিয়েছিলেন নওয়াজ শরীফ', বলল আফসান, 'তিনি বলেছেন, '৭০-এর নির্বাচনী রায় মেনে নিলে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হত না। আবার অনেকে বললেন, পিপিপির কারণেই সেই নির্বাচনী রায় মানা যায়নি। আপনার কি মত?'

'আমি এর ব্যাখ্যা দিছি', বললেন বেনজীর, 'ছয় দফা দাবির আড়ালে ছিল স্বাধীনতার দাবি, তা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতও তাই চেয়েছিল। ছয় দফা মানলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকত না।'

দ্বিতীয়ত সন্তরের নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ দু'ধরনের রায় দিয়েছিল। একটি ছিল ছয় দফার পক্ষে, অন্যটি ছয় দফার বিরুদ্ধে। সুতরাং দুই পক্ষের সমরোতার প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়ত ১৯৭০ সালে পূর্বাঞ্চলে সত্যিকার অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। মওলানা ভাসানী নির্বাচনে যাননি, ফলে শেখ মুজিব যে নির্বাচনে জিতেছিলেন তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না।'

'নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের', বললাম আমি, 'এ কমিশন ছিল কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত তো আর শেখ মুজিবের ছিল না। যে সব অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলোতেই শুধু নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হয়েছিল।'

'আমার বক্তব্য, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। আজ যদি পাকিস্তানে নির্বাচন হয় এবং নওয়াজ শরীফ নির্বাচনে যান এবং আমি না যাই তা হলে কি তা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে? মওলানা ভাসানী নির্বাচনে যাননি, তাই তা চলে যায় আওয়ামী লীগের অনুকূলে।'

'নির্বাচন হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।' খানিকটা উত্তেজিত হয়ে জানাই আমি।

'পশ্চিম পাকিস্তান তা মেনে নিতে অঙ্গীকৃতি জানায়', বললেন বেনজীর।

'একটি ম্যাডেট নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে একটি দল', জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, 'আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা তা মানতে গরবাজি হয়। তাহলে মি. ভুট্টো কি ধরনের সমরোতা চেয়েছিলেন?'

'তার ব্যাখ্যাও দিছি', বললেন বেনজীর, 'ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। কায়েদে আওয়াম (ভুট্টো) বলেছিলেন ঐ ধরনের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। অনেকে ভুলে গেছেন কিন্তু আমি ভুলিনি যে কথা, তা হলো পার্লামেন্টে যাবেন না এ কথা ভুট্টো কখনও বলেননি। তিনি দর কষাকষির জন্য সময় চেয়েছিলেন।'

'কি ধরনের সমরোতা তিনি চেয়েছিলেন', ফের প্রশ্ন করেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি বিদেশ থাকাকালীন তাঁর 'দি প্রেট ট্র্যাজেডি' প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এর বিবরণ আছে।'

'বইটি আমি পড়েছি', গঞ্জির স্বরে জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, 'সামরিক বাহিনীর অনুকূলে ছিল যুক্তিগুল। তাছাড়া 'ট্র্যাজেডি' কথাটার মধ্যে ছিল নিষ্ঠুর পরিহাস।'

এ মন্তব্য শুনে মুখের একটি রেখাও বদলাল না বেনজীরের। বললেন, 'ট্র্যাজেডি হয়ত ছিল দু'দেশের জন্যই কিন্তু ঐটেই ছিল ঐ সময়কার অভিমত।'

'পিপিপি ছয় দফার সাড়ে পাঁচ দফা মেনে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন ঐ সময় মি. ভুট্টো', বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'অর্থচ কেউ জানে না। শেখ মুজিবের সঙ্গে উনি কি ধরনের সমরোতা চেয়েছিলেন?'

‘তিনি চেয়েছিলেন শেখ মুজিব ছয় দফায় অনড় থাকবেন না। কারণ পাকিস্তান তা হলে পাঁচটি দেশে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত মুক্তিবাহিনী ঐ সময় গোটা ঢাকা নিজেদের কজায় নিয়ে এসেছিল, পাকিস্তানের অস্তিত্বই হয়ে পড়েছিল বিপন্ন।’

‘কোন্ সময়ের কথা বলছেন আপনি’, জিজ্ঞেস করি আমি, ‘১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের?’

‘বিদ্রোহীদের ওপর সেনাবাহিনীর এ্যাকশন শুরু হওয়ার সময়।’

‘কিন্তু সামরিক কমান্ডার সে সময় বলেছিলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক’, বলি আমি।

‘বাবা মার্চ মাসে আলোচনার জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। যে হোটেলে তিনি ছিলেন মুক্তিবাহিনী তা সীল করে দিয়েছিল’, জানালেন বেনজীর।

‘সে সময় মুক্তিবাহিনী ছিল না, ওরা ছিল পাকিস্তানী’, জানাই আমি।

‘ওরা পাকিস্তানী?’ খানিকটা বিব্রত হয়ে বললেন বেনজীর, ‘আমাদের ধারণা ছিল তারা মুক্তিবাহিনীর। আসলে আমি বলতে চাই পাকিস্তানী সৈন্যরা উধাও হয়ে গিয়েছিল আর...’

‘আপনি আওয়ামী লীগের সমর্থকদের কথা বলছেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘তা নয়’, মনে হলো বেনজীর একটু কনফিউজড, ‘আমি সশস্ত্র সামরিক লোকজনের কথাই বলছি।’

‘এরকম সশস্ত্র সামরিক লোকজনের অস্তিত্ব তখন ছিল না’, শান্ত স্বরে আমি জানাই।

বিব্রতবোধ করেন বেনজীর। কিন্তু একই স্বরে বললেন, ‘আমাকে তখন যা বলা হয়েছিল এখন তাই আপনাদের বলছি। আমাদের ধারণা ভুল হতে পারে, কিন্তু আপনাদের ওখানে যে এক ধরনের স্বায়ত্ত্বশাসন চলছে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। অনেকে ভেবেছিলেন, সামরিক এ্যাকশন নেয়া হলে দম ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে। কিন্তু কি হয়েছিল তা আমরা জানতে পারিনি।’

‘কোথায় ছিলেন তখন?’ জানতে চান মহিউদ্দিন ভাই।

‘দেশের বাইরে।’

‘তাহলে তো সংবাদ মাধ্যম আপনার নাগালের মধ্যেই ছিল।’

‘ঐ সময়ের যে বর্ণনা আমি দিছি তা আমার আঞ্চীয়-স্বজনের ধারণা। এখন যা বলব, তা হয়ত আমার ধারণা। তবে সবার আগে আমার বাবার কথা শেষ করি।

১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে বাবা প্রথম সামরিক এ্যাকশনের অবসান ও সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানান। তারপর ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্ক আসেন পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে। সেখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ঢাকার পতনে আগ্রহী। তার পরের ঘটনাতো জানেনই।’

বেনজীর কিন্তু এতক্ষণ একটানা কথা বলেছেন, বিন্দুমাত্র থামেন নি। এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলেন। বোৰা যাচ্ছিল, পাকিস্তান ভাঙ্গায় তাঁর বাবার অবদান সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। সূতরাং এ প্রসঙ্গ এলেই তাঁর মাঝে এক ধরনের ডিফেন্স মেকানিজম কাজ করে অর্থাৎ তাঁর পিতার ভূমিকা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা। তাঁর দীর্ঘ ভাষণের অতি সংক্ষিপ্তসারই মাত্র আমি এখানে উল্লেখ করলাম। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ‘আমার বাবা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালীদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে, সেই ভাষা প্রশ্নের সময় থেকে। জানেন, আমি যখন ছোট তখন আমরা থাকতাম রাওয়ালপিণ্ডিতে। আমাদের কাছাকাছি থাকতেন খাজা শাহাবুদ্দীন ও বগড়ার মোহাম্মদ আলী। আমরা প্রায় যেতাম সেখানে, তাঁরাও আসতেন। তাঁরা আমার মাকে বলেছিলেন আফসোস করে, ‘জানো নুসরাত, ওরা আমাদের পাকিস্তানী মনে করে না। কিন্তু কেন? আমরা তো অন্য সকলের মতোই পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছি, অথচ সবাই এমন ভাব করে যেন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক!'

আমাদের স্কুলগুলিতেও ঘূরিয়ে ফিরিয়ে একই ধরনের কথা বলা হতো; বাঙালীরা ভাত খায়, ছোটখাটো। আমরা গম খাই, আমরা লম্বা চওড়া। বর্ণবিদ্যৈ মনোভাব একেবারে। ছোট হলেও আমি বুঝতাম, এ ধরনের মনোভাব অন্যায়। বড় হয়ে বুঝলাম বাঙালীরা কি বলতে চায়। প্রধান মন্ত্রী হয়ে আমি তা উপলব্ধি করেছি। সেটি হলো, আমার মতো অন্য দশজনও পাকিস্তানী। আমার শৈশবে যা শুনেছি আর বুঝিনি তা আমাকে এখন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। আমার মনে হয়েছিল, পাকিস্তান যদি ভাসে, তাহলে ভাঙ্গবে পশ্চিমের হঠকারিতার জন্যই। বাঙালীরা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। তারা এক লোক এক ভোট চায়, আমরা তা দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। এ কারণেই গোলযোগটা শুরু হয়।’

‘জেনারেল নিয়াজীর বইটা আপনি পড়েছেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘না, পড়িনি’, বললেন বেনজীর, ‘তবে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট পড়ে মনে হয়েছে, তা জেনারেলের অনুকূলে ছিল না। জেনারেল নিয়াজীর ধারণা, মানুষ পুরনো কথা ভুলে গেছে।’

‘আপনারা হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করলেন না কেন? আপনি নিজেও তো দু’বার ক্ষমতায় ছিলেন।’ জিজ্ঞেস করে আফসান।

‘কেউ তেমন দাবি জানায়নি।’

‘হৈ চৈ হলে কি প্রকাশ করতেন?’

‘ক্ষমতায় যাওয়ার পর কমিশনের একটি রিপোর্ট পাইনি। জানি না জেনারেল জিয়া রিপোর্টগুলো নিয়ে কী করেছেন? আমার বাবা রিপোর্টটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু জেনারেলরা আপত্তি করে।’

‘আগামীতে ক্ষমতায় গেলে কি তা প্রকাশ করবেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘রিপোর্টটি পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘আচ্ছা, বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসাবেও তো আপনি রিপোর্টটি প্রকাশের দাবি তুলতে পারেন,’ বলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘অবশ্যই তা করতে পারলে খুশি হব। বললেন বেনজীর, ‘কারণ আমার বিশ্বাস, প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে জনসাধারণের একটি বোঝাপড়া হওয়া দরকার। হামুদুর রহমান কমিশন ছিল এক স্বাধীন নিরপেক্ষ কমিশন। রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ না করা ঐতিহাসিকদের জন্য এক ধরনের বিপর্যয়।’

ঘটাখানেক পেরিয়ে গেছে। আমরা সাক্ষাতকারের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সার্ক বিষয়ক কিছু প্রশ্নের পর বেনজীর নিজেই বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, ‘তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমাকে তিনি মেহও করতেন। আমাকে তাঁর অটোগ্রাফ করা ছবিও দিয়েছিলেন।’ তারপর একটু থেমে যা বললেন, তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললেন, ‘সেই রাতের কথা মনে পড়ে, যেই রাতে শেখ মুজিব মারা গেলেন। আমরা তখন পিস্তিতে প্রধান মন্ত্রী ভবনে থাকতাম। আমার বয়স তখন খুব বেশি হলে ২০। বাবা আমাদের ঘূম থেকে ডেকে তুললেন, বললেন, ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। শেখ মুজিবকে তাঁর লোকরাই হত্যা করেছে।

আমরা সারা রাত জেগে ছিলাম। এখনও এই রাতের ঘরের নীরবতা মনে পড়ে। পরে খবর পাওয়া গেল সপরিবারে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সবাই তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করলাম। পাকিস্তানী হিসাবে তাঁর সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি থাকলেও তিনি ছিলেন এক স্বাধীন দেশ ও জাতির আন্দোলনের নেতা। নীতিবাদী ব্যক্তি হিসাবে তিনি ব্যাপক শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। মৃত্যুর মুখেও ছিলেন অবিচল। আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসাবে তাঁর জন্য ছিল সবার অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি ছিলেন দেশ ও জাতির জনক। আর জাতির জনকের পরিণতি যদি এই হয়, তাহলে তেমন পরিস্থিতি আমাদের জন্য শুভ হতে পারে না।’

॥ ১৭ ॥

লাহোরে বসন্ত আসন্ন এবং লাহোরে বসন্ত মধ্যে। লাহোর প্রথম গিয়েছিলাম তিনি দশক আগে। বয়স তখন বিশও হয়নি। কিন্তু লাহোরে বেশ আনন্দ করেছিলাম এটা মনে আছে। তখনও দিল্লীর লাল কেল্লা, জামে মসজিদ দেখিনি। কিন্তু লাহোরের জামে মসজিদ, শালিমার গার্ডেন দেখে আমরা বিস্মিত। তখন কত অল্পেই না তুষ্ট হতাম! বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। আমার ভাল লেগেছিল লাহোরের পুরনো

অলিগলি আর মল রোড। নতুন শহরের মাঝে দিয়ে বয়ে গেছে পরিচ্ছন্ন ক্যানাল, দু'পাশে বৃক্ষ শোভিত। সেটিই পরিচিত মল রোড নামে।

বেনজীর ভুট্টোর সাক্ষাতকার সেরে সদরের এদিক-সেদিক এক আধটু ঘূরতে বেরলাম। প্রতি শহর থেকে একটি পুতুল ও একটি পটারি কেনা আমার শখ। করাচিতে এই এক ঘণ্টা সময় পেলাম। দোকানপাট বন্ধ হওয়ার পথে। মূলতানী কাজের একটি পোর্সেলিন আর বেলুচিস্তানী পাথরের একটি ফুলদানি কিনলাম। তারপর ফিরে এলাম।

আগামীকাল দুপুরে যাব লাহোর। আফসান সকালে ঢাকার পথে রওনা হয়ে যাবে দিল্লী। মহিউদ্দিন ভাই বেশ উৎফুল্ল। লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমিতির ছিলেন সভাপতি। তাঁর পুরনো অনেক বন্ধু-বন্ধব এখনও লাহোরে।

প্লেন থেকে বোঝা যায় কখন পাঞ্জাবের সীমানায় পৌছলাম। কারণ আর কিছু নয়, সবুজের সমারোহ। লাহোর বিমানবন্দর যত এগিয়ে এল সবুজ আরও ঘন হলো। প্লেন থেকে নেমেই মনে হলো, লাহোরে বাহার আসন্ন। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সবখানে একটা তাজাভাব।

বিমানবন্দর থেকে বেরতেই দেখি এক বয়ক লোক, মহিউদ্দিন মহিউদ্দিন বলে চিৎকার করেছেন। প্রথমে মহিউদ্দিন ভাই একটু থমকে গিয়েছিলেন। তারপরই দু'জন কোলাকুলি শুরু করলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন মহিউদ্দিন ভাই। কে? নাম বখতেয়ার, সুলের সহপাঠী। তাঁর বাল্যবন্ধু। খুব অসুস্থ, থাকেন কানাডায়। 'আমার চলে যাওয়ার কথা ছিল গতকাল,' জানালেন তিনি। 'কিন্তু পরশু তাসনিম জানাল তুমি আসছ। যাওয়া ক্যানসেল করে দিলাম। শরীর ভাল না, আর দেখা হয় কিনা কে জানে!'

তাসনিম তাঁদের পুরনো বন্ধু, সিএসপি। এখন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস একাডেমীর পরিচালক। গাড়ি পাঠিয়েছেন তিনি এয়ারপোর্টে। আমরা থাকব একাডেমীর অতিথিশালায়।

গাড়িতে যেতে যেতে পুরনো দু'বন্ধু পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করছিলেন। কে কোথায় খোঁজ নিছিলেন। এর মধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে, প্রচুর মানুষ আঘাতিত দিয়েছে, দু'দেশের সম্পর্কও মধুর নয়, কিন্তু সুল-কলেজ জীবনের বন্ধুত্বকে তা স্পর্শ করেছে বলে মনে হলো না। আমরা সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে পৌছলাম। ভাবলাম, এই সেই একাডেমী, যেখান থেকে পাকিস্তান শাসন করার জন্য মানুষ তৈরি করা হতো এবং যাদের অধিকাংশই অবস্থান নিত সাধারণ মানুষের বিপরীতে।

তাসনিম নূরানী সুদর্শন। প্রথম দেখায় চলচ্ছিত্রের নায়ক বলেই মনে হবে। কয়েকদিন আগে ছিলেন ফয়সলাবাদের কমিশনার। ইসলামাবাদে মন্ত্রণালয়ের ভার

দিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; স্ব-ইচ্ছায় তিনি থেকে গেছেন এখানে, কারণ তাঁর বাবা-মা থাকেন এখানে। চাকরিটিও নিরিবিলি নির্বাঙ্গুট। তাঁরা তিনি বন্ধু আবার চা খেতে খেতে ঘট্টাখানেক আড়ডা দিলেন।

নিজেদের রূমে এসে মাত্র স্যুটকেস খুলছি এমন সময় আমজাদ এসে হাজির। অঞ্জফোর্ডের লাহোর প্রতিনিধি। ঝকঝকে যুবক। চোখে মুখে কথা বলেন, আবার বিনয়ও দেখার মতো। লাহোরে তিনি আমাদের গাইড ও ফিলসফার।

লাহোরে আমরা কী করব তাই নিয়ে আলোচনায় বসলাম। লাহোরে আসার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য জেনারেল নিয়াজীর সাক্ষাতকার গ্রহণ। তারপর আছে তাহেরা মাজহার আলী ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ। আমজাদ জানালেন, জেনারেল এখন লাহোর নেই। কিন্তু তাঁর তো লাহোর থাকার কথা। কারণ আমরা মাসখানেক আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি এবং করাচী থেকেও তা কনফার্ম করা হয়েছে। আমজাদ বললেন, চিন্তার কারণ নেই। তিনি ফিরবেন। এর অর্থ, ইসলামাবাদে কাজ সেরে আমাদের আবার লাহোর ফিরতে হবে। তারপর দিল্লী।

আমরা জানালাম, বিকাল থেকেই আমরা কাজ শুরু করতে চাই। করাচী থেকে সুহায়েল লারি বলেছিলেন, লাহোরের প্রথ্যাত আইনজীবী রাজা কাজেমের সঙ্গে দেখা করতে। করাচী থেকেই আমজাদকে তা জানিয়েছিলাম। আমজাদ বললেন, বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে। পরের দিন থেকে তাহেরা মাজহার আলী, মুবাশ্বির হাসান, খালেদ আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। লাহোরে থাকব আমরা দিন চারেক, এর মাঝে যে ক'জনকে পারা যায়! আমজাদ মোবাইল ফোনে রাজা কাজেমের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত। আমজাদ বললেন, ‘ফিকর মাঝ কিজিয়ে।’

বিকাল চারটার দিকে এলেন আমজাদ। রাজা কাজেম থাকেন গুলবার্গে। লাহোরের অভিজাত এলাকা। বলা হতো, ঘুরের টাকা দিয়ে গড়ে উঠেছে এ এলাকা। রাজা কাজেম লাহোরের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের একজন। কিন্তু এখন বয়স হয়ে গেছে, প্র্যাকটিসেও তেমন উৎসাহ নেই। সঙ্গীত ভালবাসেন। একটি একাডেমী করেছেন। মেয়েদের একটি স্কুল করেছেন। সেই সব নিয়েই থাকেন।

আমজাদ গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইলে কথা বলছেন। বই বিক্রির সঙ্গে যে এরকম ঝকঝকে যুবক জড়িত থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। কারণ আমি বাংলাবাজারে আমাদের প্রকাশকদের দেখতে অভ্যন্ত। বোর্মা গেল ব্যবসা বাঢ়াতে গেলে কী করতে হয়। মহিউদ্দিন ভাই পুরনো লাহোর চেনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই ৩০/৩৫ বছর আগের লাহোর তো আর এখন নেই। আমি শুধু মনের কোন অংশ দিয়ে গেলে চিনতে পারি। দুপুরেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পুরনো বৃক্ষগুলো সবুজ, সতেজ। ভেজা মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর সবখানে ভেজা

মাটির গন্ধ একই রকম। নাম-না-জানা ফুলের গন্ধের ঝলক পাওয়া যাচ্ছে মৃদু বাতাসে। সম্মাট জাহাঙ্গীরের গড়া লাহোর। এ লাহোর দিল্লীর কাম্য, পাকিস্তানের হৎপিণ। লাহোর ভারতবর্ষের ভাগে পড়েনি দেখে চন্দ্রিগড় গড়া হয়েছিল সেখানে।

রাজা কাজেমের বাড়িটি পুরনো। বেশ বড়সড় বাড়ি। না, গেটে এই প্রথম কোন সেপাই-শাস্ত্রী দেখলাম না। রাজা কাজেম গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক মক্কেলকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছেন। আমজাদ নিজের পরিচয় দিয়ে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজা কাজেম বললেন, ‘আসুন আসুন, আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।’ আমজাদ বললেন, ‘আপনারা কথা বলুন, ঘট্টাখানেক পর এসে আমি আপনাদের নিয়ে যাব।’

রাজা কাজেম নিতান্ত কেজো ভঙ্গিতে আমাদের ড্রাইংরুমে নিয়ে চললেন। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য জানালাম, সুহায়েল লারির কথাও বললাম। রাজা বললেন, ‘আসলে আমি তেমন কিছু জানি না, আর এসবের সঙ্গে আমি তেমন যুক্তও না।’

‘কিন্তু, শুনেছি আপনি পিপিপির নীতিনির্ধারকদের একজন ছিলেন।’

‘না, সে অর্থে নয়। পিপিপির শাসনতত্ত্ব সংক্রান্ত একটি কমিটির সদস্য আমি ছিলাম। তা ছাড়া কিছু নয়। তবুও আপনারা যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন। যতটা পারি জবাব দেব।’

মূল সাক্ষাতকারে যাওয়ার আগে আমরা খুচরো আলাপ করছিলাম। আসলে রাজা কাজেম সম্পর্কে আমাদের তেমন কিছু জানা নেই। কিছু জানা যায় কিনা সেই চেষ্টাই করছিলাম।

কাজেম জানালেন, তিনি মোহাজের। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান চলে আসেন। অনেক কষ্টে পড়াশোনা শেষ করেছেন। আগে থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। যুক্ত ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে। ১৯৫২-এর দিকে পার্টির সঙ্গে মতবিরোধ হয় কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হয়নি। ১৯৭৩ সালেও ছিলেন পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক। এখন অবশ্য এগুলি থেকে দূরে। ‘তাহলে পিপিপির সঙ্গে নিজেকে জড়ালেন কীভাবে?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আসলে সে অর্থে আমি জড়াই নি,’ সিগারেট ধরিয়ে বললেন রাজা কাজেম। ‘১৯৭০-এর দিকে ড. মুবাশির হাসানের পাল্লায় পড়ে পিপিপি’র সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি তবে নামকা ওয়াস্তে। ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম না। আমি আইনজীবী, চাচ্ছিলাম কোন কিছুর সঙ্গে যাতে সম্পর্ক থাকে, সমাজের সঙ্গে একটা যোগাযোগ থাকে। আমার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেটি হলো র্যাডিক্যাল লেফটের। আইনজীবীর পেশাটি ছিল আমার বাণিজ্যিক। ভুট্টোও সে সময় আমাকে চাপ দিছিলেন দলে যোগ দেয়ার জন্য।’

‘আপনি কী জানেন তখন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে কি ঘটেছিল?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘না, আমি জানি না সেজন্য দুঃখিত,’ বললেন রাজা কাজেম, ‘পূর্ব পাকিস্তানে একবার বোধ হয় দু’তিন দিনের সংক্ষিপ্ত সফরে গিয়েছিলাম। তাই সেখানকার আন্দোলন, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমার সামান্য। এখানে পত্র-পত্রিকায় যা ছাপা হতো তাই পড়ে যা জেনেছি।’

অবাক লাগছিল, একজন সচেতন পশ্চিম পাকিস্তানীর, তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান অংশ সম্পর্কে অনুভূত দেখে— যিনি কী না আবার র্যাডিক্যাল লেফটিন্ট! সেই সব পাকিস্তানীর সঙ্গে কথা বলে আমার একটা ধারণা বন্ধমূল হয়েছে যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের ব্যাপারে যতটা উৎসাহী, আবেগপ্রবণ ছিল পশ্চিমারা তা ছিল না। তারা মনে করত, পশ্চিম পাকিস্তানই হচ্ছে পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান এ্যাপেনডিক্স। রাজা কাজেমের মন্তব্য সে ধারণা আরও দৃঢ় করল।

‘তারপর?’

‘আমার ধারণা সম্পর্কে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম পাকিস্তান টাইমসে। শেখ মুজিব পল্টন ময়দানে ঐ সময় একটি ভাষণে তা উল্লেখ করেন। পাঞ্জাবী শভিনিজম-এর কথা বলেছিলেন। আমি যদূর জানি ভাষণটি ছিল রেহমান সোবহানের লেখা। পাকিস্তান টাইমসে আমার প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই এ মন্তব্য করা হয়।’

‘কিন্তু মূল ঘটনাটি কি ছিল?’ মহিউদ্দিন ভাই জিজেস করলেন।

‘খুব সম্ভব সেটি ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি। ভুট্টো মাত্র ঢাকা থেকে ফিরেছেন। এ সময় শাসনতাত্ত্বিক কমিশনের একটি বৈঠক হয়। ভুট্টো ছিলেন সভাপতি। মাহমুদ আলী কাসুরি, রফি রাজা, নাসিম আকবরসহ বারো তেরোজন উপস্থিত ছিলেন। আমি বারো-তেরো পৃষ্ঠার একটি খসড়া নিয়ে উপস্থিত হই। আমি সরাসরি ভুট্টোকে বলেছিলাম, আপনার ভূমিকায় আমি খুশি নই। কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাদের দু’জনার মধ্যে বাকবিতঙ্গ চলে। আমার স্ট্যান্ড ছিল ’৪৭ পরবর্তী সময়ের আলোকে দু’অংশের আর এক সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা কম। সুতরাং হয় দফা আমরা মানব না কিন্তু আলাদা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের একমত হওয়া উচিত। কেননা সেটাই হবে শোভন কাজ।’

‘তারপর?’

‘দাঁড়ান, চা এসে গেছে। চা টা খেয়ে নিন।’

চা খেতে খেতে রাজা কাজেম জানালেন, তাঁর ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী বিদেশ থাকে। তিনি একাই থাকেন এখানে আর সমাজসেবা করেন। ১৯৪২ সালে যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন স্বাধীন ভারতের দাবিতে স্কুলে প্রথম ধর্মঘট করেছিলেন। ’৪৬ সালের শেষ অবধি ছিলেন মুসলিম লীগে। লক্ষ্মীর অধিবাসী ছিলেন তাঁরা। ১৯৪৭-এর পর চলে আসেন পাকিস্তান।

‘দেখেন,’ বললেন তিনি, ‘আমি ফ্রাঙ্কলি আমার মতামত জানাব। আমি এ সরকারের ব্রিফধারী নই। কারণ পাকিস্তানে আমাকে চারবার জেলে যেতে হয়েছে।

প্রথম ১৯৫০ সালে, শেষবার ১৯৮৫ সালে। আমাকে ভারতীয় এজেন্ট, কেজিবির এজেন্ট, নাস্তিক—অনেক কিছু বলা হয়েছে।'

'আচ্ছা মি. কাজেম,' বলি আমি, 'পুরনো কথায় ফিরে যাই। ১৯৭০-৭১-এ আপনি আলাদা হয়ে যাবার কথা বলছিলেন। আসলে কি আপনি দু'টি ভিন্ন স্বাধীন জাতির কথা বলছিলেন?'

'একজাকটলি,' বললেন তিনি, 'দু'টি স্বাধীন দেশ। কিন্তু ভুট্টো বার বার বলছিলেন, না তা হতে পারে না। আমি দর কষাকষি করছি। শেখ মুজিব আমাকে এক ইঞ্চি ছাড় দিলে আমি তাকে এক মাইল ছাড় দেব। আমি বললাম, এগুলো কিছুই হবে না। এখন অনেক লোক এতে ইনভলভড হলে কোন একমত্যে পৌছা যাবে না। কিন্তু সবাই নীরব ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আমি টাইমসে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম।'

'১৯৭১ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি আগেই বলেছি,' কাজেম জানালেন, 'আমার পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে ধারণা কম ছিল। আমার তখন মনে হয়েছিল, মুক্তিবাহিনীর ব্যাপার-স্যাপার বোধ হয় ঠিক নয়। আমার কেন, এখানকার অনেকেরই সে মত ছিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, আসলে বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একটি উত্থানেরই ব্যাপার।'

আমার হঠাৎ মনে হলো, বাংলাদেশে চৰম বামপন্থী দলগুলি ও তাই মনে করত। এর কারণ কী অধিক তত্ত্ব চর্চা যার ফলে বাস্তবের সঙ্গে এদের সম্পর্ক রহিত হয়ে যায়?

'আপনার কি মনে হয়', প্রশ্ন করলেন মহিউদ্দিন ভাই, 'পাকিস্তানের শাসকচক্র অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলার?'

সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না রাজা কাজেম। তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু এ নিয়ে লেখার যোগ্যতা এখনও ওখানে কেউ অর্জন করেনি। এ বিষয়ে আরও লেখালেখি হতে বছর বিশেক সময় লাগতে পারে।'

'পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করি আমি, 'অনেকের ধারণা, এ অবস্থার জন্য পরিকল্পনা কমিশনও খানিকটা দায়ী।'

'আপনি যা বলছেন তার কোন প্রমাণ নেই এমন কথা আমি বলব না,' বললেন রাজা কাজেম। 'হ্যাঁ, এটা ঠিক পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের অনেক ক্ষমতাই ছিল। কিন্তু এটাও তো মানতে হবে যে, এটি ছিল ক্ষমতাচক্রের একটি হাতিয়ার, আলাদা কোন প্রতিষ্ঠান নয়।'

'আসলে আপনি স্পষ্টভাবে কি বলতে চান?'

কয়েক মুহূর্ত নিচুপ থাকলেন কাজেম। আবার একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, '৪৭-এর পর এখানে ক্ষমতা বলয়ের আলাদা একটি স্থাপনা গড়ে ওঠে। কথা ছিল না এ স্থাপনা বেলুচিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান শাসন করবে। কিন্তু আদতে পাঞ্জাবীদের নিয়ে এ ধরনের একটি ক্ষমতা কাঠামোই গড়ে ওঠে। এরা

লালিত উপনিবেশিক ঐতিহ্যে এবং বিচ্ছিন্ন জনগণ থেকে। এরা পাকিস্তানের সব কিছুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তান এ কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। আজ বেলুচিস্তান বা সীমান্ত প্রদেশেও একই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে।'

'তার পরিণাম কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?' জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

'এসবে আমার আগ্রহ নেই।' জানালেন রাজা কাজেম ক্যাজুয়ালি, 'এদের যুক্তিতে আমার আস্থা নেই। আমি উপমহাদেশের মানুষ। আমি পাকিস্তানী ঠিক আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি একজন উপমহাদেশীয়। আমি যখন পাকিস্তান বলি তখন এর জনগণকে বোঝাই, এর ক্ষমতা কাঠামোকে নয়। এ কারণেই আমাকে ভারত বা সোভিয়েতের এজেন্ট বলা হয়।'

'আপনি কি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ঐ ধরনের কোন কনসেপ্টের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে,' বললেন কাজেম, 'আমি দেখছি এ উপমহাদেশ সব সময় অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বর্তমান যে বিভাগ দেখছেন তা সাম্প্রতিক। আমি উপমহাদেশের যে কোন জায়গায় যাই নিজেকে আগন্তুক মনে হয় না, এমন কি বাংলাদেশেও নয়। কিন্তু বার্মায় পা দিলেই আগন্তুক মনে হবে। ওয়ালী খান সীমান্ত প্রদেশকে পাখতুনিস্তান নামে ডাকতে চান। তিনি যেই নামেই ডাকুন না কেন, উপমহাদেশের তাতে কিছুই আসে যায় না। আমার কথা হলো, দয়া করে আর দেশ বাঢ়াবেন না। সবাই মিলে একটা দেশই রাখুন। তবে আমি এটাও জানি, সংক্রিতিগতভাবে অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আবার অনেক কিছু সম্ভব নয়।'

এরপর আমরা রাজা কাজেমের সমাজহিতকর প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করি—যা! এ রচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। ঠিক সময়ে আমজাদ লতিফও হাজির হন। রাজা কাজেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা মল রোড ধরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াই। আমজাদ বলেন, 'চলুন, আমার অফিসটাও দেখবেন।'

ক্যাভেলরি গ্রাউন্ডে আমজাদের অফিস। এখানেও করাচীর মতো অবস্থা। এসব আবাসিক এলাকা সেনাবাহিনীর। আর কোথাও না হলেও পাকিস্তান এই জায়গীরদার প্রথাটি বেশ চালু রেখেছে। ছোট একটি বাড়ি নিয়ে আমজাদের অফিস। এখান থেকে আমজাদ পাঞ্জাবে অক্সফোর্ডের কেনাবেচাটা দেখেন। ব্যবসা ভালই চলছে, জানান আমজাদ। আমরা চা খেতে খেতে লাহোরের প্রোগ্রাম ঠিক করি। জেনারেল নিয়াজীকে না পাওয়া গেলে আমরা সাক্ষাতকার নেবো ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ড. মুবাশ্বির হাসানের, তাহেরা মাজহার আলী আর সাংবাদিক খালেদ আহমদের।

আমরা যে বিষয়ে কথা বলতে চাই, লাহোরে সে বিষয়ে কথা বলার মতো লোক আর নেই। কাল থেকে ‘রেন্ট-এ কার’ সার্ভিসের একটি গাড়ি থাকবে আমাদের সঙ্গে।

সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে যাবার জন্য বেরুলাম। দেখি, আকাশ জুড়ে কালো মেঘ পুরো আবহাওয়াই নমিত করে দিয়েছে। যেন ঘোর বর্ষা। পথ চলা শুরু হতে না হতেই বৃষ্টি, তুমুল বৃষ্টি, মনে হয় যেন বাংলাদেশের কোন শহরেই আছি।

॥ ১৮ ॥

মুবাশ্বির হাসানও থাকেন গুলবার্গে। গতকাল রাতে আমজাদ আবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি সকালে অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য। মহিউদ্দিন ভাই আবার তাঁর ছোট ভাইকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলেন রাতে। এক সময় তিনি তাঁদের সহকর্মী ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন।

রাতে থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। সকালে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, সব বৃক্ষ সবুজ, পরিচ্ছন্ন। এলাকাটা নিয়ুম। রোদের হালকা আভা দেখা যাচ্ছে চারদিকে। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে মুবাশ্বির হাসান সম্পর্কে ভাবার চেষ্টা করছিলাম। গত কয়েকদিন সাক্ষাতকার নিতে নিতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মাথায় সব সময় সাক্ষাতকারের বিষয়টিই ঘূরপাক খায়। শহর, দুষ্টব্য, মানুষজন কিছুই চোখে পড়ে না। এর একটি কারণ হতে পারে এই যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ তিনটি—বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে জানি কিছু লেখালেখি হয়েছে কিন্তু পাকিস্তানের দিকটি একেবারে অজানা। প্রায় তিন যুগ পর তারা নিজেদের কথা বলছে যা এক ধরনের কনফেশন। ফলে বিষয়টির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছি।

ড. মুবাশ্বির হাসান খুব সম্ভব প্রকৌশলশাস্ত্রে পিএইচ.ডি।। রাজনীতিতে ভুট্টোই তাঁকে নিয়ে আসেন। ভুট্টোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৭১ সালে ভুট্টোর সঙ্গে ঢাকায়ও এসেছিলেন। ভুট্টো ক্ষমতায় গেলে অর্থমন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। বেনজীর ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর বাবার সমর্থকদের মেলেনি। তাঁদের অনেকে বেরিয়ে এসেছিলেন দল থেকে। মুবাশ্বিরও। তিনি এখন পিপলস পার্টির এক ভগাংশের নেতা।

বেশ বড় জায়গা নিয়ে মুবাশ্বিরের পুরনো বাড়ি। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শীর্ণ, সৌম্য চেহারা। বোৰা যায়, বয়স হয়েছে, সত্ত্ব পেরিয়েছেন হয়ত। আমাদের ভিতরে নিয়ে বসালেন।

ড্রাইং রুমটি খুবই সাধারণ, এলামেলো এবং অযত্নের ছাপ সবখানে। আমাদের রাজনীতিকদের রুমের মতোই। দেয়ালে কিছু পাখির ছবি, বাঁধানো, ইলেকট্রিক

হিটারের পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এসব পাখির ছবি কি আপনার তোলা?’ সলজ্জ ভঙ্গিতে ড. হাসান স্থীকার করলেন। পাখি দেখা, পাখির ছবি তোলা তাঁর শখ। কেন জানি না, আমার হঠাতে মনে হলো হিটারের সহচর হিমলারের শখ ছিল মুরগি পোষা। মুবাশির ১৯৭১ সালে ভুট্টোর অন্যতম নীতিনির্ধারক ছিলেন বলেই কি একথা মনে হলো, জানি না।

ইতোমধ্যে গুছিয়ে মহিউদ্দিন ভাই আমাদের আসার উদ্দেশ্য বলেছেন, এ বিষয়ে বলতে বলতে আমরা এক ধরনের দক্ষতা অর্জন করেছি। ড. মুবাশিরও উদ্যোগটির প্রশংসা করলেন। মহিউদ্দিন ভাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন যা তিনি সবার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলেন, ‘১৯৭১ সালে ভুট্টো আওয়ামী লীগের সঙ্গে কি ধরনের সমরোতায় পৌছতে চাচ্ছিলেন?’

‘আমাদের ধারণা ছিল,’ নিচু স্বরে থেমে থেমে বললেন মুবাশির, ‘পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি হলো ওপনিবেশিক, পূর্ব পাকিস্তানকে যা পুঁজির বাজারে পরিণত করেছে। এটা ঠিক যে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্বের উপকার ভোগ করছিলাম। আপনাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না, ১৯৭০ সালে আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে এর উল্লেখ ছিল। নির্বাচনের আগ থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি ছয় দফার বিষয় যেন নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে না থাকে। আর আমরা তো ছয় দফার সাড়ে পাঁচ দফাই মেনে নিয়েছিলাম। আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে ছয় দফা থেকে তাদের সরে আসার কোন উপায় ছিল না। অন্যদিকে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করি পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারির আগ পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল, জেনারেল ইয়াহিয়ার লক্ষ্য হবে কৃটচালের মারফতে প্রধান দু'টি দলকে দমন করা।’

‘ইয়াহিয়া এ ধরনের কাজ করবেন বলে আপনাদের ধারণা হলো কেন?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘এদের শাসনের চরিত্রই এ রকম’, বললেন, মুবাশির।

‘আমার তো মনে হয়,’ বেশ গভীর স্বরে জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘ভুট্টোও সামরিক শাসকদের আপনজন ছিলেন, তাই না?’

‘এ্যা, হ্যাঁ, তাই,’ প্রথমে একটু দ্বিধা থাকলেও পরে বেশ নিশ্চিত ভঙ্গিতেই জানালেন মুবাশির, ‘তবে, এটাও ঠিক, পাকিস্তানী সামরিক শাসন ব্যবস্থায় এছাড়া অন্য কোন ধারণাও ছিল না। সে সময় কম্পিউটারে ওয়ার গেমের একটা ছক সাজিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। যদি ইয়াহিয়া এটা করে, আমরা সেটা করব। এক পর্যায়ে আমি সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, ইয়াহিয়া দু'টি রাজনৈতিক দলকেই খতম করবেন। এ গেমের ফলাফল ভুট্টোকে জানানো হয়।’

‘এটা কি জানুয়ারি আলোচনার পর পর?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘হ্যাঁ, ঠিক তার আগে’, বললেন মুবাশির, ‘ইয়াহিয়া খান এ রকম কিছু করতে পারেন এ রকম একটা ধারণা ভুট্টোর সব সময় ছিল। তবে, আমরা ঠিক বুঝতে

পারছিলাম না, তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোন সমরোতায় পৌছেছেন কিনা বা পৌছতে যাচ্ছেন কিনা?’

‘আপনাদের কি মনে হচ্ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা রফা হচ্ছিল?’ আবারও প্রশ্ন করি আমি।

‘এ রকম একটা ঘটনা তখন ঘটছিল’, জানলেন মুবাশির, ‘আসলে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোন সমরোতায় পৌছাচ্ছিলেন কিনা বা অনিবার্য কোন ঘটনার প্রস্তুতি চলছিল কিনা সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তবে বলা যেতে পারে, বহু আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে সেনা পাঠানো হচ্ছিল, এর অর্থ সেখানে কিছু একটা ঘটবে।’

‘তা’হলে সেনাবাহিনী জানত তাদের পরে কোন অভিযানে নামতে হতে পারে।’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলাম। ২৪ শে মার্চ খবর পেলাম আওয়ামী লীগ নেতারা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে সই করতে যাচ্ছেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবের সঙ্গে আমরা বসতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারিনি। আমার মনে পড়ে মোস্তফা খারকে পাঠানো হয়েছিল একটি বৈঠকের অনুরোধ জানিয়ে। কোন ফল হয়নি, এমন কি প্রেসিডেন্ট হাউসে শেখ সাহেবকে লনের এক পাশে নিয়ে গিয়েছিলেন ভুট্টো কথা বলার জন্য। কিন্তু ফলাফল কি হয়েছিল আমার জানা নেই।’

‘আসলে ভুট্টো কি ধরনের সমরোতা চাচ্ছিলেন?’ আবার পুরনো প্রশ্নে ফিরে গেলেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘একটি দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তারা পার্লামেন্টে যেতে তৈরী, আলোচনাও চলছে, তা হলে ব্যাপারটা কি?’

‘আমার ধারণা’, বললেন মুবাশির, ‘ভুট্টোর একটা ভয় ছিল। যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে এবং প্রথম দিনেই শাসনতত্ত্ব পাকা হয়। কারণ আমরা তো জানতাম না, শাসনতত্ত্বে কি ছিল। সেনাবাহিনীও শাসনতত্ত্ব মানত না। তাই আমরা চাচ্ছিলাম আগে আলাপ-আলোচনা হোক, নইলে বিশ্বজ্ঞালা, নৈরাজ্য দেখা দেবে।’

‘আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ চায়নি’, বললাম আমি, ‘পূর্ব পাকিস্তানের কেউ কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসুক। পাকিস্তানে তো এখন নওয়াজ শরীফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসন করছেন, বেনজীর ভুট্টো তো সেই রায় মেনে নিয়েছেন। আপনারাই এক পাকিস্তানে বিশ্বাস করেননি। না হলে, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে কেউ কিভাবে ক্ষমতায় যেতে চায়? আপনারা চাচ্ছিলেন, শাসনটা আজীবন পাঞ্জাবীরাই চালাবে।’ বেশ ছোটখাটো একটা লেকচার দিয়ে ফেললাম। মুবাশির হাসান মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কি উত্তর দেবেন একবার ভাবার চেষ্টা করলেন। তারপর আবার ধীর স্বরে বললেন, ‘আপনি যা বলছেন তা নতুন কিছু না। পাকিস্তানের ইতিহাসই এ রকম।

সব সময়ই পূর্ব পাকিস্তানকে ক্ষমতা থেকে বাধিত করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে এর শুরু। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের পর কি হলো? তমিজউদ্দিন খান মামলা জিতলেন। কি হলো? সামরিক শাসন এল। প্রফেসর সাহেব, আপনি ভুট্টোকে নন্দ ঘোষ বলতে চাইছেন; আমি বলব, পাকিস্তানের সব শাসকই এ ধরনের আচরণ করেছে। পাকিস্তানে কখনও সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যায়নি অন্তত পূর্ব পাকিস্তানীরা যে ধরনের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত।’

‘মোস্তফা খার যদি মুজিব-ভুট্টো বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারতেন তা হলে ভুট্টো কি চাইতেন?’ মনে হচ্ছিল মহিউদ্দিন ভাই এর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্ন করেই যাবেন।

‘ভুট্টোর আশঙ্কা ছিল’, বললেন মুবাশির, ‘নতুন শাসনতন্ত্র দেশকে দ্বিখণ্ডিত করবে। সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।’

‘পিপিপি আসন পেয়েছিল ৮০টি। তা’হলে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত কি ছিল?’

‘ওটা ভুট্টোর ধারণা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ধারণা।’

‘ভুট্টো কি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগভাগি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলেন?’

‘ক্ষমতার ভাগভাগি হতো তবে প্রধান মন্ত্রী হতেন শেখ মুজিব।’

‘সেটা কোন্ ধরনের ক্ষমতার ভাগভাগি?’

‘তিনি এমন এক ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা চাচ্ছিলেন যার আওতায় পাঞ্জাব আর সিঙ্কুতে তিনি ক্ষমতায় থাকবেন। কেন্দ্রে অবস্থান নেবেন বিরোধী দলের।’

মনে হলো, এটিই ছিল মূল কথা। জিতি আর হারি, ক্ষমতা দিতে হবে এইটাই ছিল ভুট্টোর খায়েস। মুবাশির হাসান এতক্ষণে যেন আসল কথাটি বলতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমি বললাম, ‘এক পেয়ালা চা হোক।’ যেন স্বন্তি পেলেন এ ভঙিতে ড. হাসান উঠে ভিতরে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এলেন। চা আসা পর্যন্ত আমরা ভুট্টো-পরবর্তী পাকিস্তান নিয়ে খানিকক্ষণ আলাপ করলাম। আসলে চা খেতে খেতে তাঁকে সহজ করতে চাচ্ছিলাম— যাতে তিনি না ভাবেন আমরা অথবা আক্রমণাত্মক। চায়ে শেষ চুমুক দিয়েই মহিউদ্দিন ভাই হঠাতে জিজেস করলেন, ‘ইয়াহিয়া খান যখন জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করলেন তখন কি আপনার মনে হয়েছিল পিপিপি ও ইয়াহিয়ার মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে?’

‘সমস্যা হচ্ছে এই যে’, বললেন মুবাশির, ‘ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ যে চক্র ছিল তাতে আমি ছিলাম না। ফলে অনেক কথাই আমি জানি না।’

‘কারা ছিলেন সে চক্রে?’ জিজেস করি আমি।

‘মোস্তফা খার, রহিম ও রফি রাজা।’

‘কিন্তু রফি রাজা তা অঙ্গীকার করেছেন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই। ‘তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে।’

‘রফি রাজা ছিল ভুট্টোর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ’, অবিচলিতভাবে উত্তর দেন মুবাশির। ‘মোস্তফা খারও তাই। বলা যেতে পারে খার ছিলেন আরও ঘনিষ্ঠ।’

‘আপনি নীতিনির্ধারকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন’, বলি আমি।

‘বলছেন বটে’, বললেন মুবাশির, ‘কিন্তু আমি ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। জানুয়ারি মাসে যে বৈঠক হয় তাতে আমি ছিলাম না। শেখ মুজিবের সঙ্গে পিপিপি’র নেতাদের যে বৈঠক হয় তাতে আমি ছিলাম না। ঢাকায় গঙ্গায় যে নৌবিহার হয় তাতেও আমি ছিলাম না। তবে, পূর্ব পাকিস্তানে যখন সামরিক অভিযান হয় তখন আমি ছিলাম।’

‘লারকানা পরিকল্পনাটি কি?’ মহিউদ্দিন ভাই জানতে চান। এটি তাঁর ফেডারিট প্রশ্ন। ‘আমার মনে হয় এবং অনেকে ইঙ্গিতও করছেন যে, লারকানায় ভুট্টো-ইয়াহিয়ার একটা আঁতাত হয়েছিল। আপনি খোলাখুলি আমাদের বলতে পারেন।’ আশ্বাসের সুরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমার মাথায় একেবারেই আসে না যে, ভুট্টো ভাবতে পেরেছিলেন পাকিস্তান দু’ভাগ হওয়া উচিত’, বললেন মুবাশির।

‘আচ্ছা, আমরা শুনেছি,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘সে সময় এখানে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, বাঙালীদের ডাঙা মেরে ঠাঙা করে দেয়া যাবে। রফি রাজা বলেছেন, ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে, অনেকে ভেবেছিল সামরিক শাসন জারি হোক সব ঠিক হয়ে যাবে। এ ধারণা থেকেই হয়ত অপারেশন সার্ট লাইটের সৃষ্টি অর্থাৎ সামরিক এ্যাকশনের পর যখন সবাই ঠাঙা হয়ে যাবে তখন ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে দর কষাকষিতে বসবেন এবং শেখ মুজিব তখন অনেক ছাড় দেবেন।’ মহিউদ্দিন ভাইয়ের কথা শেষ করলাম আমি।

আমাদের দু’জনের দিকেই তাকালেন তিনি। বোঝা গেল এসব প্রশ্ন তাঁকে অঙ্গীকৃত করে দিচ্ছেন তখন উপায় কী। ড. হাসান বললেন, ’৭১ সালের জুলাইয়ের দিকে ভুট্টো আমাকে বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমাকে গাড়িতে করে প্রেসিডেন্ট হাউসে নিয়ে যেতে পারবেন? ইয়াহিয়া খান তখন করাটীতে। তো আমি গাড়ি চালিয়ে ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট হাউসে নিয়ে গেলাম। ভুট্টো গেলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাক্ষাৎ শেষে ভুট্টো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ডাক্তার সাহেব, দেশকে বাঁচানো যাবে বলে আপনি মনে করেন?’ আমি বললাম, ‘মনে হয় না।’ তিনি বললেন, ‘আমার মনে হয় সংব। রাজনীতি যথাযথ হলে দেশকে বাঁচানো সংব।’

আমাদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এটি নয়। কিন্তু ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, আমাদের ধারণা ভুল নয়।

‘১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ তো আপনি ঢাকায় ছিলেন,’ জিজ্ঞেস করলাম আমি, ‘অপারেশন সার্ট লাইট সম্পর্কে কী জানেন?’

‘আমরা আশঙ্কা করছিলাম,’ বললেন মুবাষ্ঠির, ‘যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বিকেল চারটার দিকে ইন্টারকন্টিনেন্টালের ১০ তলা থেকে দেখলাম রেডিও স্টেশনে সৈন্য আসছে। ভুট্টোকে গিয়ে বললাম আলামত ভালো মনে হচ্ছে না। বোধ হয় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে জানালা দিয়ে তিনিও এ দৃশ্য দেখলেন। এখানে বলে রাখা ভালো, পিপিপির জে. এ. রহিম ছাড়া কেউ সামরিক এ্যাকশনের পক্ষে ছিলেন না। এ ঘটনার দিন দু’য়েক আগে রহিম এসে ভুট্টোকে বললেন, প্রেসিডেন্টকে আপনার বলা উচিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া। ভুট্টো চিৎকার করে বললেন, রহিম, আমাকে দিয়ে এ কাজটা হবে না। তোমার যখন এত খায়েশ তখন তুমই প্রেসিডেন্টকে গিয়ে তা বলো। রহিম বললেন, ঠিক আছে, আপনি ব্যবস্থা করেন। মুস্তাফা খারকে বললেন ভুট্টো সব ব্যবস্থা করতে। রহিম গিয়ে কথা বললেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে। তাঁরা কী আলোচনা করেছিলেন তা জানি না, কারণ রহিম তা শুধু ভুট্টোকেই জানিয়েছিলেন। ভুট্টো তখন ঠাট্টা করে বলতেন, রহিম মনে করে ইয়াহিয়ার মত বদলানো যেতে পারে। তাই আমি জোর গলাতেই বলব পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য ভুট্টোর আলাদা কোন পরিকল্পনা ছিল না।’

মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘ড. মুবাষ্ঠির, আপনি বলেছিলেন যে, আপনারা ছয় দফার মধ্যে সাড়ে পাঁচ দফাই মেনে নিয়েছিলেন। ব্যাপারটা কি?’

এর উভয়ে মুবাষ্ঠির হাসান একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একবার উঠে গিয়ে একটি বইও নিয়ে এলেন। উদ্ধৃতি দিলেন সে বই থেকে। তাঁর মূল বক্তব্য যতটুকু বুঝলাম তা হলো, পাঞ্জাবীরা অনেক আগে থেকেই ভিন্ন ধরনের একটি ফেডারেশন চেয়েছিল যার মধ্যে মুসলমানত্ব বা বাংলার কোন স্থান ছিল না। কারণ পাঞ্জাবীরা বাঙালীদের কোন কাজের না বলে মনে করত। এর একটি অর্থ হতে পারে যে, বাঙালীরা ইসলামাবাদের সঙ্গে থাকল কী থাকল না তাতে পাঞ্জাবীদের কখনও কিছু আসে যায়নি।

‘পুরনো কথাই ফিরে আসি,’ বললাম আমি, ‘২৬ মার্চ আপনি ফিরে আসেন করাটী। তারপর আপনি কী জানতেন কী ঘটছে বাংলাদেশে?’

‘না, কিছুই জানতাম না।’

‘পুরো নয় মাস বাংলাদেশে কী ঘটছে তার কিছুই জানতেন না!’

‘না, আসলে কিছুই জানতাম না। প্রফেসর রেহমান সোবহান পলিসি ডায়ালগ থেকে একটি বই বের করেছেন যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা এসব কিছুই জানতাম না।’

‘এর অর্থ কী?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘গত ২৪ বছর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের কথা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত আমি কী করেছে এগুল আমরা জানতাম না।’

‘ড. মুবাষ্ঠির’, বললাম আমি, ‘আপনি পিপিপি’র একজন নেতা, একজন পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারী, আর আপনি বলছেন কিছু জানতেন না। এটা কতোটা বিশ্বাসযোগ্য?’

‘না, আমি কিছুই জানতাম না।’ মুবাষ্ঠির হাসানের গলা দ্বিধাহীন।

‘পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনে এ ব্যাপারে আলাপ চলছিল,’ আবারও বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আইয়ুব খানও তা স্বীকার করছেন। এসব আলোচনা তো খোলাখুলিই হচ্ছিল। আর পাকিস্তানের একজন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বলছেন তিনি এসব কিছুই জানতেন না। আশ্চর্য!’

‘দেখেন,’ বললেন মুবাষ্ঠির হাসান, ‘সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদিতেই আটকে ছিলাম। অর্থমন্ত্রী হয়েছিলাম বটে কিন্তু আর্থিক বিষয়ে তেমন জ্ঞান ছিল না। আর সেই মন্ত্রিত্ব শেষ হয়ে যায় মার্শাল-ল’র সঙ্গে সঙ্গেই।’

‘২৫ শে মার্চের পর কি আপনি কাগজ-টাগজ পড়তেন না,’ জিজ্ঞেস করি আমি, ‘বিবিসি টিবিসি শোনেননি? ড. মুবাষ্ঠির, আপনিতো পাকিস্তানের একজন সাধারণ নাগরিক নন।’

‘না, আসলে আমি কিছুই জানতাম না,’ আবারও নাছোড়বান্দার মতো বললেন মুবাষ্ঠির হাসান।

‘ব্যাপারটা কতো অন্তর তাই না?’ মন্তব্য করলেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘ট্রানজিটোর তখন ঘরে ঘরে। বিদেশী পত্র-পত্রিকা আপনারা পাচ্ছেন, অথচ পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, তাঁরা কিছুই জানতেন না।’

‘কথাটা সত্য।’

বোৰা গেল, যেভাবেই প্রশ্ন করি না কেন, উত্তরের হেরফের হবে না। হয়ত এটা ভেবেই মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার কি কখনও মনে হয়েছে পাকিস্তান ভাগার ব্যাপারে আপনার দলের একটা ভূমিকা ছিল?’

‘এখন অনেক কিছু আমরা জানতে পারছি,’ বললেন মুবাষ্ঠির, ‘এখন আমার মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের সৃষ্টি ছিল আশ্চর্য! কিন্তু আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মানুষ যে মূল্য দিয়েছে এর জন্য তার কোন দরকার ছিল না। এটা কোন আনন্দের বিষয় নয়। আমি একটি বই লিখছি, তাতে দেখাব যে, তখন আমরা আমাদের দলের জন্য খারাপ কিছু আশঙ্কা করছিলাম। কে জানত যে, নরক নেমে আসবে মাটিতে।’

‘আপনার কী মনে হয়, এখনও এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রকাশ করা হচ্ছে না,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘কিন্তু ইতিহাসের স্বার্থে যা প্রকাশ করা উচিত।’

‘দেখেন,’ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন মুবাষ্ঠির হাসান, ‘বিজয়ের পিতৃত্বের দাবিদার অনেকেই, পরাজয়টা হলো এতিম। ওসব ঘটনা কখনও জানা যাবে না।

তবে, এটা বলা যায় যে, এ ঘটনা মানবেতিহাসের অন্যতম ট্রাজেডি। কিন্তু মুশকিল হলো, এ থেকে কেউ শিক্ষা নেয়নি। পাকিস্তানেতো নয়ই, এমন কি ভারত, শ্রীলঙ্কাতেও নয়। এ শিক্ষাটি হলো, আর্থ-সামাজিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকেন্দ্রায়ন। ব্রিটিশ আমলের রেখে যাওয়া আমলাতন্ত্র থেকে যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হয় বা এ পদ্ধতির বদল না হয়—তাহলে শান্তি আসবে না। এ পদ্ধতিটি হলো দাগী আসামী। আর রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদির অভাবতো আছেই।'

'আছা, সবশেষে একটি প্রশ্ন', বলি আমি, 'কাগজে তো নিশ্চয়ই দেখছেন যে, বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে। আপনি কি মনে করেন, ক্ষমা চাওয়া উচিত?'

'আমি মনে করি বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত এক শ' বার।' বেশ উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন ড. মুবাশ্বির হাসান, 'তবে, কেবল ক্ষমা প্রার্থনা অর্থহীন। আমরা প্রতারকদের মতো ইসলামের কথা বলি। বলি ইসলাম হচ্ছে, এক্য নির্ধারণের উপাদান। তাহলে সে এক্য কোথায়?'

## ॥ ১৯ ॥

ঢাকায় বসে আমরা পাকিস্তানে কাদের সঙ্গে কথা বলব, তার তালিকা তৈরি করেছিলাম। এ বিষয়ে অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। একটি নামের কথা প্রায় সবাই বলেছিলেন, তিনি হলেন তাহের মাজহার আলী। পাকিস্তানের এক সময়ে বিখ্যাত সাংবাদিক মাজহার আলী খানের স্ত্রী। তিনি অবশ্য উপমহাদেশে নিজের কর্মকাণ্ডের জন্যই পরিচিত। তবে তাঁর আরেকটি পরিচয় আছে। এক সময়ের বিখ্যাত ছাত্রনেতো তারেক আলী তাঁর পুত্র।

তাহের মাজহার আলী লাহোরেই থাকেন। মুবাশ্বির আলীর সঙ্গে যেদিন কথা বললাম, সেদিন বিকালেই তাহের মাজহার আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। আমজাদ আমাদের জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে আমাদের তাহেরার বাসায় পৌছে দিতে চান। বিকালে আমজাদ এলেন তার গাড়ি নিয়ে। যখন তাহেরার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম তখন দেখি হালকা মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ, অর্থ সকালে যখন ড. মুবাশ্বির হাসানের বাসায় যাই এবং দুপুরে ফিরে আসি, তখন ছিল কড়কড়ে রোদ।

১৯৭১ সালে সামরিক বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা যে ক'জন পাকিস্তানে করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাহের মাজহার আলী অন্যতম। তাঁর এই ভূমিকার কথা আমাদের অজানা নয়। ম্যালে নতুন কিছু তাঁকে জিজ্ঞেস করার ছিল না। কিন্তু আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানাতে চাচ্ছিলাম।

মহিউদ্দিন ভাই বললেন, বছর কয়েক আগে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি দল আসে পাকিস্তানে একটি সেমিনারে যোগ দিতে। তিনি নিজেও ছিলেন ঐ দলের সদস্য। সেমিনারের শেষ দিন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে ১৯৭১ সালের কর্মকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত। সভাপতি এ প্রস্তাব পেশে রাজি নন। তখন তাহেরা মাজহার আলী জোর করে মঞ্চে উঠে বলেন, পাকিস্তান যা করেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

ড. মুবাশ্বির হাসানের সাক্ষাৎকার নিয়েও আমরা আলোচনা করছিলাম। যে লোকটি ভুট্টোর নীতিনির্ধারকদের একজন ছিলেন, তিনি কিনা জানেন না ১৯৭১ সালে কী ঘটেছিল বাংলাদেশে! এর চেয়ে এ্যাবসার্ড বিষয় আর কী হতে পারে!

তাহেরা মাজহার আলীর বাসার সামনে পৌছুতেই আমার হঠাত মনে হলো, মুবাশ্বির প্রায়ই বলছিলেন, মুস্তাফা খার ছিলেন ভুট্টোর ঘনিষ্ঠজন। খারতো লাহোরেই থাকেন। তাঁর সঙ্গে একবার মোলাকাত করা যায় না? মহিউদ্দিন ভাইকে বলতেই তিনি বললেন, ঠিকই তো একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? আমজাদ বললেন, খারের ফোন নাস্বার তাঁর কাছে আছে। মোবাইলে ফোন করা হলো খারকে। পাওয়া গেল। প্রথমে আমজাদই কথা বললেন। অক্সফোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে বোৰ্বা গেল লাহোরের এলিট মহলের সঙ্গে তাঁর অন্ন বিস্তর চেনাশোনা আছে। এরপর মহিউদ্দিন ভাই কথা বললেন। খার এক কথায় রাজি। জানালেন, আগামীকাল সন্ধ্যায় তিনি অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য। তবে আসার আগে যেন একটু ফোন করে আসি। ফোন শেষ হলে আমরা তাহেরা মাজহারের বাড়ির গেট খুললাম।

পাকিস্তানে আমি যত জনের বাড়িতে গেছি তাঁদের মধ্যে একমাত্র তাহেরা মাজহারের বাড়িটি আমার কাছে সত্যিকার অর্থে বাড়ি মনে হয়েছে বা এমনও হতে পারে, আমি সব সময় এ ধরনের একটি বাড়ির কথা ভেবেছি। ছোট একতলা বাড়ি। এক পাশে সবুজ লন, লনের এক কোণায় একটি বটগাছ, মাঝারি আকারের। বাড়ির দরজায় চুকতেই এক পাশে গান্ধারার পাথরের একটি ভাস্কর্য। গেট খুলে চুকলেই ছোট একটি স্পেস, দেয়ালে ফলক চিত্র। ড্রাইংরুমে ফায়ার প্লেসে গান্ধারার ফ্রিজ, ফার্নিচার, ভাস্কর্য। তারপর খোলা বারান্দা। এক কোণে কয়েকটি চেয়ার। পাশে টেবিলে আফ্রিকার কাঠের ভাস্কর্য, দেয়ালে পেইনিংটিং।

তাহেরা মাজহারের বয়স হয়েছে বটে কিন্তু এখনও কর্মচক্ষেল। হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বারান্দায় গিয়ে বসলাম। শান্ত বাড়ি। কারণ তিনি থাকেন একা। স্বামী মারা গেছেন বেশ কিছুদিন আগে। ছেলে বিদেশে। তাহলে সময় কাটে তাঁর কীভাবে? তাহেরা অনেকগুলো সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এখন তিনি ডেমোক্র্যাটিক উইমেন্স এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। জেনারেল জিয়াউল হকের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন ‘উইমেন্স এ্যাকশন ফোরাম’। সেটির

তিনি সদস্য। ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিল, উইমেন ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের সদস্য। ফলে সারাটা দিন ব্যস্ততাতেই কাটে, তাছাড়া লোকজনের আনাগোনা তো আছেই।

আমরা চা খেতে খেতে এসব সংগঠন ও পাকিস্তানের নারী সমাজ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এক পর্যায়ে মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘১৯৭১ সালে, বাংলাদেশে যখন নারীরা নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন পাকিস্তানের মহিলাদের ভূমিকা কী ছিল?’

‘নারী সমাজের কথা বলছেন, পাকিস্তানের,’ তাহেরো বিদ্রূপের সুরে বললেন, ‘আমি লাহোরের কথাই বলি। ঘটনার দিন দুয়েক পর ঢাকায় কী ঘটেছে জানতে পারলাম। লাহোরে খুব বেশি হলে আমরা ১২/১৩ জন মনে করেছিলাম যা ঘটেছে তা অন্যায়। এবং এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কী করা যায় তা নিয়ে মানুষজনের ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। আমি আমার সাতজন, হ্যাঁ, মাত্র সাতজন সহকর্মী নিয়ে মলে মিছিল করে প্রতিবাদ সভা করলাম। এর আগে প্রায় সবাই আমাকে এ কাজটি করতে মানা করেছিল। এ সাতজন কারা? সাধারণ শ্রমজীবী। আমাদের মহল্লার তথাকথিত অশিক্ষিত মহিলা। এদের একজন তার বক্তৃতায় কবিতার মতো করে বলেছিল; বলে তাহেরো চোস্ট উর্দুতে কয়েকটি পঞ্জিক আওড়ালেন। কয়েকটি শব্দের অর্থ বুঝলাম না। কিন্তু যতটুকু বুঝলাম তা হলো ঐ মহিলা বলেছিলেন—কোন বাঙালী রমণীর খোপা থেকে যখন তুমি ফুল উপড়ে ফেল তখন মনে হয় আমার চুল থেকেই তা উপড়ে ফেলা হলো...

তাহেরো কবিতার পঞ্জিক শেষ করে একটু দম নিলেন। তারপর শুরু করলেন, ‘কিন্তু কুইন মেরি কলেজের ছাত্রী বা ‘আপার ক্লাসে’র মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরকম। তাদের কথাবার্তা তখন অবিশ্বাস্য মনে হতো!’

‘যেমন?’

‘যেমন, তাদের প্রথম কথাই ছিল, যা হবার তা হয়েছে। এগুলো নিয়ে ভাবার কী আছে। কফি পার্টি বা অন্যান্য আসরে মহিলারা এমন সব কথা বলতেন, যা এক কথায় জঘন্য। আমি বা আমার সমমনা কেউ এ ধরনের আসরে উপস্থিত হলেই ব্যঙ্গ করে বলা হতো, এই যে তেনারা এসেছেন।’

‘তারা কী বলতেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘তারা বলতেন’, বললেন তাহেরো, ‘আমরা আগুন্তুক, দেশপ্রেমী নই। পাকিস্তানের ব্যাপারে আপনাদের একটা কথা বলি— এ দেশে যদি কেউ সত্যি কথা বলে তা হলে তাকে আনপেট্রোয়টিক হিসাবে নিন্দা করা হবে। কারণ এদেশে সরকারই ঠিক করে কে দেশপ্রেমী বা কে দেশদ্রোহী। এতে জনগণের কোন ভূমিকা নেই। একটা ঘটনার কথা বলি। সে সময় সেনাবাহিনীর হত্যকাণ্ডের আগে লাহোরে ভুট্টো একটি জনসভা করেছিলেন, সে সভায় আমিও ছিলাম। ভুট্টোর আগে অনেকেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

মিয়া মোঃ আলী কাসুরির কথা মনে আছে? ভুট্টো বললেন, ঢাকায় পরিষদের সভায় যে যোগদান করবে, তার ঠ্যাং ভেঙে দেয়া হবে। মনে খটকা লাগলো। ভুট্টো চতুর লোক, এ ধরনের মন্তব্য কেন করছেন? একটু চিন্তা করতেই বুঝলাম, ভুট্টো কথাটা কাসুরি বা ঐ মতের সমর্থকদের উদ্দেশে বলছেন। এরা মনে করতেন পরিষদের সভায় ঢাকা যাওয়া উচিত। ভুট্টো কথাটা বলছেন সেনাবাহিনীর উদ্দেশে। ঐ সময় সেনাপতিরা কী চিন্তা করছে, ভুট্টো তা জানতেন।'

'তা হলে কি আপনি বলতে চান,' বললাম আমি, 'ভুট্টো সেনাপতিদের প্রিয়পাত্র হয়ে তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করতে চাইছিলেন?'

'ক্ষমতার খেলাটা ভুট্টো বুঝতেন। তিনি বুঝেছিলেন এ সময় যা চলছে, তা হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এখানকার ক্ষমতাবানরা চাছিল না, বাঙালীরা ক্ষমতায় আসুক।'

'আপনারা যে প্রতিবাদ করেছিলেন তার আর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?' জানতে চাইলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'এ ঘটনার পর,' বললেন তাহেরা, 'আমাদের মাফ চাইতে বলা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। ঐ সময় এ কথা বলাও ছিল ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তো, আমাদের বারবার বলা হলো ক্ষমা চাইতে। আমি বললাম, আজ যদি আমরা ক্ষমা চাই তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানরা কী ভাববে আমাদের সম্পর্কে? ভাববে যে সত্য বলার কারণে ক্ষমা চেয়েছি। আমরা ক্ষমা চাইব না।'

এ সময় চা এল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, আঁধার হয়ে আসছে চারদিক। লনের বটগাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম সেই সাত মহিলার কথা, যাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ঢাকার হত্যাকাণ্ডে। চা খেতে খেতে অন্যান্য বিষয়ও আলোচনা চলে আসছিল, বিশেষ করে তাঁর ছেলে তারেকের কথা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হত্যাক্ষেত্রে ও পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়াউল হকের বিরোধিতা করায় তাঁকে দশ বছর পাকিস্তান আসতে দেয়া হয়নি। তিনি জানালেন, তিনি যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন, তখন অনেকে তারেকের মা হিসাবে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে এবং এতে তিনি বেশ গর্ববোধ করেছেন। এক পর্যায়ে আমি তাঁর সংগ্রহ দেখতে চাইলাম। খুশি হয়ে তিনি বললেন, 'চলুন', বিভিন্ন ঘর ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ দেখতে লাগলাম। অধিকাংশই গান্ধারা নির্দর্শন। তাহেরা জানালেন, 'যে জিনিস আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আজ তা পাঁচ লাখ টাকা। এখন আর কিছু কেনার উপায় নেই।' টেরাকোটা একটি মাথা দেখে চমৎকৃত হলাম। তাহেরা বললেন, 'তক্ষশীলায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে জমি চষার সময় এই মাথাটা পাওয়া গেছে।'

তাঁর শিল্পসংগ্রহ দেখে, চা খেয়ে আমরা আবার আলোচনায় বসলাম। মহিউদ্দিন ভাই এবার নির্দিষ্টভাবে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

‘অধিকাংশই সে সময় সেনাবাহিনীকে সমর্থন করেছে,’ বললেন তাহেরা মাজহার, ‘শুধু সে সময় নয়। সব সময়ই। আইয়ুব খান যখন ক্ষমতা দখল করলেন এবং পাকিস্তান টাইমস নিয়ে নেয়া হলো, তখন সব পত্রিকা সাধুবাদ জানিয়েছিল। আমি বলব আমাদের সংবাদপত্র সব সময় ন্যূনত্বজনক ভূমিকা পালন করেছে। তারা এই ধারণারই সৃষ্টি করেছে পাঞ্জাবীরা হচ্ছে পাকিস্তানের ঠিকাদার এবং তারাই ঠিক করবে কে দেশদ্রোহী এবং কে দেশদ্রোহী নয়, অথচ পাকিস্তান হওয়ার পর পরই পাঞ্জাবীদের ভাষার জন্য সবাই তাদের নিন্দা করত। বলত, পাঞ্জাবী যে বলে সেতো হিন্দুস্থানী। পাকিস্তানীরা বলবে উর্দু। পাঞ্জাবীরা এখন বলছে তাদের মাতৃভাষা উর্দু, যা সত্য নয়। পাঞ্জাবীরা হচ্ছে এরকম মানসিকতার মানুষ।’

‘আছা, আপনিতো ঢাকায় গিয়েছিলেন,’ জিজেস করি আমি, ‘কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আপনার?’

‘ঢাকায় আমি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে গিয়েছিলাম এবং নিজেদের জন্য খুব লজ্জাবোধ করেছি। বাংলাদেশে যখন গেছি তখন পুরনো বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কেউ আলাপ করতে চায়নি। এক মহিলা বলেছিলেন, তাহেরা, আমি তখন প্রেগনেন্ট। ১৫০ মাইল পেরিয়ে বর্ডারে পৌছেছি। আমার সন্তানটি মারা যায় সেখানে। দেখুন, এটি হলো অনুভবের বিষয়। পাকিস্তানে অনেকেরই এ অনুভবটা ছিল। কিন্তু, বিরাট সংখ্যক মানুষ তখনই বিশদভাবে এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানত না। আমি বাংলাদেশে গিয়ে প্রথমেই তাই এ বর্বরতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।’

॥ ২০ ॥

আইএ রহমান পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। তাঁর খ্যাতির অন্য কারণ হলো, তিনি পাকিস্তানের প্রথাসিদ্ধ সাংবাদিকতায় গা ভাসিয়ে দেননি। যেখানে প্রতিবাদ করার সেখানে প্রতিবাদ করেছেন। চাকরিচ্যুত হয়েছেন, দমে যাননি। রহমান এখন পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা কারও অজানা নয়। আর মানবাধিকার কমিশনে জড়িত থেকে কী গণহত্যা সমর্থন করা যায়?

তাহেরা মাজহার আলীর সঙ্গে যে কারণে আমরা দেখা করেছিলাম, আইএ রহমানের সঙ্গেও সে কারণে দেখা করতে চাচ্ছিলাম। সাক্ষাতকার নেয়াটা মূল উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাঁরা তো গণহত্যা সমর্থন করেননি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষেই ছিলেন।

লাহোরে প্রথম দিনের পরই জেনেছিলাম, মানবাধিকার কমিশনের অফিস এখানেই এবং আইএ রহমানও এখানে থাকেন। তখনিই আমাদের ‘পরিচালক’ আমজাদকে বলেছিলাম, তাঁর কাছ থেকে একটা সময় নিতে। আইএ রহমান সানন্দে সময় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সকাল দশটা-এগারোটার দিকে যেতে।

আমাদের খুব একটা তাড়া নেই আর। লাহোরে সাংবাদিক খালেদ আহমদের সঙ্গে আলাপ করব আর বাকি আছেন মোস্তফা খার। খার আজ আবার টেলিফোন করতে বলেছেন।

সকালে আমরা বেক্রলাম টুকটাক কেনাকাটা করতে। তারপর ড্রাইভারকে মানবাধিকার কমিশনের ঠিকানা ধরিয়ে দিলাম। আমজাদ আজ সঙ্গে নেই। তিনি থাকলে সময় নিয়ে ভাবতে হয় না, কারণ লাহোর তাঁর নখদর্পণে। খুব পুরনো ড্রাইভার না হলে অসুবিধা। আমাদের ড্রাইভারটির বাড়ি ইসলামাবাদ, লাহোরে নতুন। ফলে যা হবার তাই হলো, আইএ রহমানের অফিসে পৌছতে পৌছতে দুপুর বারোটা হয়ে গেল।

পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের অফিসটি দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। লাহোরের পুরনো আবাসিক এলাকায় অফিসটি। আশপাশের স্থাপত্যের সঙ্গে কোন মিল নেই। অনাড়ম্বর, কিন্তু সুন্দর এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রহমান ছেটখাটো একটি বৈঠক করেছিলেন। আমরা যেতেই সেটা মূলতবি করে দিলেন। সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বসালেন। কোন ভূমিকার দরকার হলো না। স্বতঃকৃত আলাপ শুরু হলো। তিনিই বলে যাচ্ছিলেন, আমরা মাঝে মাঝে খেই ধরিয়ে দিচ্ছিলাম।

রহমান বলেছিলেন, ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসার সময়েই তাঁকে ও তাঁর সমমনোভাবাপন্ন কয়েকজন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। তাঁরা তখন ইয়াহিয়াকে যোগ্য উত্তর দেয়ার জন্য একটি পত্রিকাও বের করেছিলেন। ‘যখন নির্বাচন হলো’, বললেন রহমান, ‘তখন ভেবেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) জিতবে। নির্বাচনের ফলাফল এ রকম হলে হ্যাত একটা ব্যালাস থাকবে। কিন্তু পিপলস পার্টির উপান সবাইকে জানান দিল যে, নতুন একটি রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং প্রস্তুত থাকো। আওয়ামী লীগের বিজয়ও এই মেসেজ দিয়েছে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে দলগুলোকে। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপি’র মিটিংয়ে এসব বিষয়ে যথাযথ আলোচনা হয়েছে। অনেকে এ রায় মেনে নিয়েছিল; আবার অনেককে এ রায় মেনে নিতে বলা হয়েছে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তচক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আরেকটা ইমপ্রেশন হচ্ছিল সামরিক জাত্তা ক্ষমতা ছাড়তে চাইবে না বা চাচ্ছে না, যে কারণে তারা দুই নেতার সঙ্গে দুইভাবে আলোচনা করছে বা করতে চাচ্ছে।’

এমন সময় পিয়ন এসে জানাল এক মহিলা রহমানের দর্শনপ্রার্থী। রহমান বললেন তাঁকে আসতে দিতে। লম্বা চওড়া মোটসোটা এক মহিলা ঢুকলেন। সালাম দিয়ে

রহমানকে বললেন, ‘আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি, নিউজলাইনে আপনি অসাধারণ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।’

‘কি বিষয়ে?’ উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম।

‘বাংলাদেশ নিয়ে,’ রহমান জানালেন।

নিয়াজির বইটি বেরুবার পর বাংলাদেশ নিয়ে আবার কিছুটা লেখালেখি শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। নিউজলাইন একটি বিশেষ সংখ্যা বের করেছে এ উপলক্ষ্ম। মূল প্রবন্ধটি লিখেছেন রহমান। পরে নিউজলাইন পড়ে দেখেছি, রহমানের প্রবন্ধটি বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে। তিনি তাঁর নিন্দা করেছেন এবং পাকিস্তানকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারেও বলেছেন, ক্ষমা না চাওয়ার কোন কারণ নেই।

রহমান আমাদের সঙ্গে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যের কথাও বললেন। তারপর মহিলার কথা শুনে আবাক হয়ে গেলাম। কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি জানালেন, তাঁর নাম কুররাতুল আইন বখতিয়ার। করাচীতে থাকেন। মোহাজের পরিবারের মেয়ে। অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়, স্বামী ডাক্তার, সচল। ‘ত্রি সময় আমি ছিলাম সাধারণ এক গৃহিণী,’ জানালেন কুররাতুল, ‘স্বামী-সংসার নিয়ে মগ্ন, বাইরের জগত সম্পর্কে অজ্ঞ। ১৯৭১ আমার জীবনের মোড় ঘূরিয়ে দিল। যেদিন ঢাকার পতন হলো আমি শুন্দি হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এতদিন সবাইর কথা বিশ্বাস করেছি। ঢাকার পতনের খবর বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এর পর ঠিক করলাম ফেস ভ্যালুতে কাউকে আর বিশ্বাস করা যাবে না। এরই মধ্যে ঢাকা থেকে অনেকে ফিরে আসছিল।’ তিনি তাদের খোঁজ-খবর নিছিলেন। মনে হয়, কুররাতুল বিহারীদের পরিবার থেকেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি দু’টি শিশুকে পোষ্যও নিয়েছিলেন। আজ তারা প্রতিষ্ঠিত।

১৯৭১-এর ঘটনা কুররাতুলকে এতো নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি পৃথিবীকে জানতে চাইলেন। কারণ যুদ্ধের ঘটনা তাঁকে মর্মাহত করেছিল এবং মনে হয়েছিল- সুন্দর ঘরবাড়ি সব বেকার। তিনি কলেজে ভর্তি হলেন, তার পর বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজবিজ্ঞানে ডিগ্রী নিয়েছেন। একটি কলেজে পড়ান আর যুক্ত সমাজকর্মের সঙ্গে, যা মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করবে। কুররাতুল জানালেন, ছাত্রীদের নিয়ে তিনি ঢাকা ঘুরে গেছেন, ভাল লেগেছে। বেশ অবাক হলাম এই ভেবে যে, একটি প্রবন্ধের জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাতে এত দূর এসেছেন তিনি। আর ১৯৭১ শুধু আমাদের নয়, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনের ওপর অভিযাত হেনেছে। এ বিষয়ে পরে অবশ্য আরও জেনেছি।

কুররাতুলকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, ‘দেখছেন তো, ক্ষমা চাওয়া নিয়ে কী বিতর্ক হচ্ছে! এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?’

‘মতামত আবার কী।’ দ্বিধাহীনভাবে তিনি উত্তর দিলেন, ‘যা হয়েছে তার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।’

তারপর কুররাতুল আইন বখতিয়ার চলে গেলেন। মহিউদ্দিন ভাই মন্তব্য করলেন, ‘বাহ বেশ তেজী মহিলা।’

‘এ রকম আরও অনেকে আছেন।’ বললেন রহমান, ‘যাঁরা পাকিস্তানের অফিসিয়াল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত নন।’

‘আচ্ছা, আপনি হলেন সাংবাদিক’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আপনি বরং সাংবাদিকদের সম্পর্কেই কিছু বলুন।’

‘শুরু থেকেই সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল নেতৃত্বাচক,’ জানালেন রহমান, ‘সব সময় সংবাদপত্রে থাকত পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে নেতৃত্বাচক মনোভাব। সাংবাদিকরাও একই ধরনের মনোভাব পোষণ করত। পত্রিকায় বাঙালীদের হেয়ভাবে দেখান হতো, প্রচার করা হতো যে, তারা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত। একটি উদাহরণ দিই। পূর্ব পাকিস্তানে আর্মি এ্যাকশনের প্রতিবাদ জানিয়ে লাহোরে ১৮ জন স্বাক্ষর করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ বিবৃতিতে যদূর মনে পড়ে, এয়ার মার্শাল নূর খানও স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পত্রিকা ছাড়া আর কেউ সেই বিবৃতিটি ছাপেনি। আমার এক সহকর্মী আবদুর রব মালিক তাঁর একটি লেখায় বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে দু'বছরের জেল ও জরিমানা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে কী ঘটছে তা কী সাংবাদিকরা জানতেন না? কম-বেশি জানতেন। তার পরও দেখা গেল ঢাকার পতনের পর মিডিয়া ডিসপ্লেয়েড এ মক শক। এই হচ্ছে পাকিস্তানের সংবাদপত্র।’

‘কিন্তু সবাই বলছেন,’ জানাই আমি, ‘গণহত্যার বিষয়ে তাঁরা তেমন কিছু জানেন না বা একেবারেই জানেন না, এটা কিভাবে সম্ভব?’

‘সম্ভব, চোখ খুলে কেউ ঘুমালে কে কী বলবেন?’ বললেন রহমান, ‘শুনুন, গণহত্যার কথা বাদ দিন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করা যাক, বাংলাদেশে আর্মি এ্যাকশন হয়েছিল কি না? হয়েছিল? তাতে মানুষ কি নিহত হয়েছিল? আমি সংখ্যার বিচারে যাব না। একজনও কি মারা যায়নি? গিয়েছিল। আর্মি এ্যাকশনে বাংলাদেশে যদি একজন মানুষও নিহত হয়ে থাকে, তা হলেও সেটি হত্যা এবং অপরাধ। কারণ নিজের দেশের সেনা নিজের মানুষের ওপর কিভাবে শুলি চালাতে পারে বা সে ক্ষমতা তাদের দিয়েছিল কে?’

‘তাহলে ক্ষমা চাওয়াটা যুক্তিযুক্তি’, জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘অবশ্যই।’ সিগারেট ধরাবার জন্য থামলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, থেমে থেমে, ‘হিন্দুদের এবং ব্রিটিশদের তো আমরা ‘দুশমন’ মনে করি। উপমহাদেশে হিন্দু ও ব্রিটিশরা মুসলমানদের হত্যা করেছে— এই তো হলো থিসিস। আমি বলছি, উপমহাদেশে তারা যত না মুসলমান হত্যা করেছে, আমরা অর্থাৎ মুসলমানরা তার চেয়েও বেশি মুসলমান হত্যা করেছি।’

এ রকম দৃঢ় উক্তির পর বলার তেমন কিছু থাকে না। বাংলাদেশ থেকে প্রসঙ্গ চলে যায় ভারত, সার্ক—সাম্প্রতিক বিষয়ে। আমরা মনে করি, সার্কের ভূমিকা শক্তিশালী হওয়া উচিত এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো উপমহাদেশের সে দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। আইএ রহমান তাতে দ্বিমত পোষণ করেন না, বরং এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি যে কথাটি বললেন, তা আমার দীর্ঘদিন মনে থাকবে। আইএ রহমান বললেন, ‘উই আর দি চিলড্রেন অফ হিমালয়াস। আমরা হিমালয়ের পুত্র। হিমালয় থাকবে না আমরাও থাকব না। এটা মনে রেখেই আমাদের সবার আচরণ করা উচিত।’

সন্ধ্যায় আমাদের নেমস্টন্স ছিল সিঙ্কু ক্লাবে। ত্রিটিশ আমলে গড়ে ওঠা সরকারী কর্মচারীদের জন্য এক্সক্লুসিভ ক্লাব। উপমহাদেশে এখনও এ ধরনের অনেক ক্লাব রয়ে গেছে। অবশ্য সরকারী কর্মচারী ছাড়া এলিট মহলের অনেকেও এখন ক্লাবের সদস্য হতে পারেন। এসব ক্লাব এখনও ওপনিবেশিক সংস্কৃতি স্বতন্ত্রে লালন করছে। এক সময়ের আইসিএস সিঙ্কুর প্রাক্তন মুখ্য সচিব এবং পরবর্তীকালে সিঙ্কুর গবর্নর (বা মুখ্যমন্ত্রী ঠিক মনে নেই) আমাদের নিমন্ত্রণ কর্তা। তাসনিম আমাদের নিয়ে চললেন। মহিউদ্দিন ভাই গাড়িতে স্মৃতিচারণ করছেন ছয় দফা ঘোষণার সময়টা। গোলটেবিল বৈঠক যখন চলছে তখন লাহোরে বাঙালী ছাত্ররা বৈঠকের আশপাশে ঘুর ঘুর করছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল তীব্র উত্তেজনা। যে বাড়িটিতে বৈঠক বসেছিল এবং বঙ্গবন্ধু ছয় দফার ঘোষণা দিয়েছিলেন মহিউদ্দিন ভাই তা দেখালেন।

সিঙ্কু ক্লাবে পরিচিত হলাম আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে। এঁরা সবাই মধ্যস্থাটের সিএসপি। এখন অতিরিক্ত সচিব বা পূর্ণ সচিব পদে কাজ করছেন। দু’একজন তৎকালীন বাংলাদেশেও কাজ করেছেন। না, অতীত নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইনি। বর্তমান পাকিস্তানের খোঁজ-খবরই জানতে চাহিলাম। মনে হলো, পাকিস্তান সম্পর্কে সেই ইলুশন আর তাঁদের নেই। মোহাজের ও স্থানীয়দের দ্বন্দ্ব এখন আর জনসাধারণ পর্যায়েই নয়, কর্মকর্তা পর্যায়েও উন্নীত হয়েছে। পাকিস্তানেও এখন আর তা পুরনো আমলের এলিট সার্ভিস হিসাবে পরিগণিত নয়। সেনাবাহিনীর আধিপত্য বিষয়েও তাঁরা অস্তুষ্ট। আগে যেমন সামরিক-বেসামরিক আঁতাত ছিল এখন মনে হলো তাতে ভাঙ্গন ধরেছে। একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো, যিনি গত সপ্তাহে পদত্যাগ করেছেন। সচিব হওয়ার পথে ছিলেন, কিন্তু ততদিন আর অপেক্ষা করেননি।

আরেকদিন রাতেও কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। সিএসপি এখন পরিচিত সিএমজি বা সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রপ নামে। আমরা যাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলাম তিনি সিঙ্কু প্রদেশের। মাত্র চাকরিতে চুকেছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি জানেন। কী ঘটেছিল তখন তাও খুব একটা অজানা নয়। বললেন তিনি, ‘আমার পরিক্ষায় ছয় দফা নিয়ে প্রশ্ন হয়েছিল।

এর ওপর আমি ভাল লিখতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই উত্তরটি দিইনি। কারণ পরীক্ষক যদি পাঞ্জাবের হন, তাহলে হয়ত উত্তর দেখে তিনি অখুশি হতেন এবং অখুশি হলে পরীক্ষা পাস সম্ভব হতো না।’

॥ ২১ ॥

খালেদ আহমদ লাহোর থেকে প্রকাশিত সাংগীতিক ‘ফ্রাইডে টাইমস’-এর সঙ্গে যুক্ত। ‘ফ্রাইডে টাইমস’ যে খুব প্রভাবশালী পত্রিকা তা নয়। তবে শুনেছি পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি লিবারেল, খানিকটা বাঁ ঘেঁষা। এ ধরনের পত্রিকার সার্কুলেশন যে খুব বেশি হবে না তা বলাই বাহুল্য।

আমজাদ এবং আরও কয়েকজনকে দেখলাম খালেদ আহমদ সম্পর্কে উচ্ছিসিত এবং সবার একটা শৃঙ্খলার ভাব আছে তাঁর সম্পর্কে। আমজাদ ঠিক করেছিলেন, সকালটা আমাদের ফ্রী থাকুক, দুপুরে খালেদকে বলবেন অফিফোর্ডে আসতে। সেখানে আলাপ করা যাবে।

সেই সিডিউল অনুযায়ী আজ সকাল বেলাটা আমাদের ছুটি। আমরা ভেবেছিলাম, মোস্তফা খারকে পাওয়া গেলে আজ সকালে অনির্ধারিত একটি সাক্ষাতকার নিয়ে নেব। গতকাল রাতে এ কারণে মহিউদ্দিন ভাই খারকে ফোন করেছিলেন। খারের বাসা থেকে জানান হলো জরুরী কাজে তিনি চলে গেছেন ইসলামাবাদ। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। একটি ফোন নম্বর দেয়া হলো খারের বাসা থেকে। ইসলামাবাদে গেলে যেন আমরা সেই নম্বরে ফোন করি।

সুতরাং ভেবেছিলাম সকালে দেরি করে উঠব, তার পর শুয়ে শুয়ে ত্রিলাই পড়ব। কিন্তু খুব ভোরেই মহিউদ্দিন ভাই দরজায় কড়া নাড়লেন।

‘আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, যাবেন আপনি?’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

‘কোথায়?’

‘দাতা দরবার।’

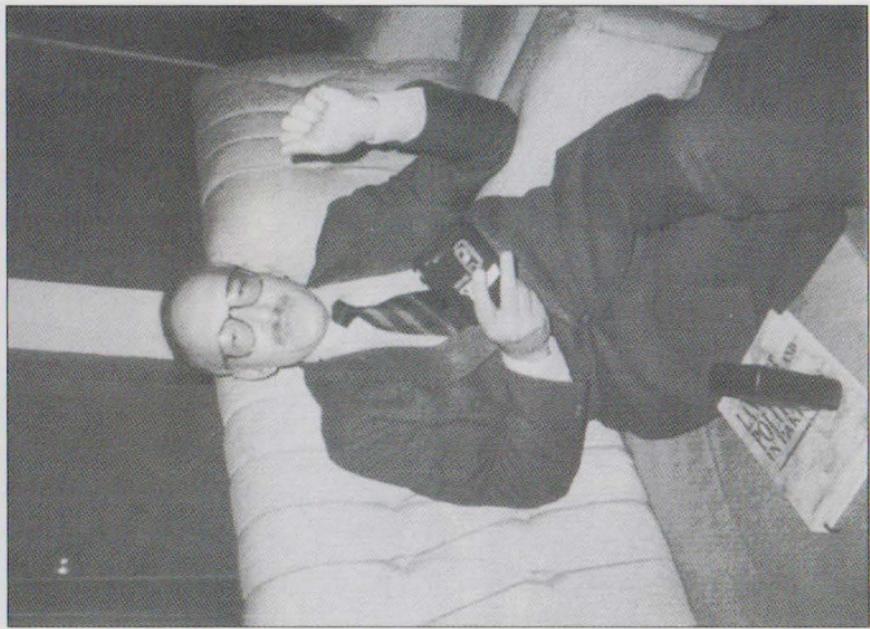
লাহোরের মশহুর পীর হচ্ছেন দাতা সাহেব। আজমীরে যেমন খাজা দরবার, লাহোরেও তেমনি দাতা দরবার। পীর, মাজারে যে আমার খুব একটা ভক্তি আছে তা নয়। মাজারে যেতেও খুব একটা ইচ্ছুক আমি নই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে কোন কারণেই হোক, উপমহাদেশের বিখ্যাত সব মাজার দর্শন আমার হয়ে গেছে। ত্রিশ বছর আগে যখন লাহোর এসেছিলাম তখন দ্রষ্টব্য হিসাবে নিশ্চয় গেছি দাতা দরবারে। কিন্তু এখন আর কিছুই মনে নেই।

তা মহিউদ্দিন ভাইয়ের এ সব বিষয়ে শুন্দাভক্তি যথেষ্ট। দরবারে যাওয়ার জন্য তিনি পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছেন। এই দরবারের প্রতি তাঁর বিশেষ শুন্দার কারণ তিনি জানালেন। যখন তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং এর ছাত্র সংসদের সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন দাতা দরবারে। ছাত্র সংসদে তাঁর জেতার ব্যাপারে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল যে, তিনি বাঙালী। দাতা দরবারে তাঁর অবাঙালী বন্ধুরাই নিয়ে এসেছিলেন। তা ছাড়া লাহোরবাসী সবাই দাতা দরবারে যান মনোকামনা পূরণে প্রার্থনা জানাতে। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, দাতা দরবারে মোনাজাত করে ফেরার সময়ই তাঁর মনের সব দ্বিধা-দন্দন দূর হয়ে গেল। মনে হলো তাঁর প্রার্থনা কবুল হয়েছে। তিনি জিতবেন এবং জিতেছিলেনও।

পুরনো লাহোরের এক গলিতে দাতা দরবার। আমি উপমহাদেশের অনেক মসজিদ, মাজার, তীর্থস্থানে গেছি। একটি বৈশিষ্ট্য সবখানে নজরে পড়েছে। খ্রীস্টনদের চার্চ, গোরস্থান ছাড়া বাকি সব ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনাস্থল ও তীর্থস্থান খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। আজমীর শরীফ বা নিয়ামউদ্দিন, চন্দ্রনাথ পাহাড় বা কালীঘাট সব খানে একই অবস্থা। গ্যাংটক থেকে আরও ওপরে তিক্কতীদের মন্দিরে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম পরিষ্কার হবে। হ্যাঁ, ভিতরে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কিন্তু ঢোকার পথটা নোংরা। এই বৈপরীত্য কেন তা আমার বোধগম্য নয়। দাতা দরবারে যাবার পথটাও যতটা সম্ভব নোংরা। সে সব নোংরা পেরিয়ে মূল মাজারে গিয়ে আমরা প্রার্থনা করলাম। প্রার্থনা শেষে মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘আমার মনে হয় পাকিস্তানে আমাদের আর কোন ঝামেলা হবে না।’ ঝামেলা এক-আধুন্ত যে ছিল না তা নয়, টেনশনও খানিকটা ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। হলেও বিষয়টা অস্বাভাবিক কিছু হতো না, কারণ সিকি শতাব্দী পর আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাছি যা পাকিস্তানে এখনও টাবু।

দাতা দরবারের কাছেই বাদশাহী মসজিদ ও দুর্গ। বললাম, ‘চলুন ঘুরে আসি।’ এখনও টুয়িরিস্টের ভিড় হয়নি। মসজিদ চতুর খালি। সেখান থেকে দেখা যায় মিনার-ই-পাকিস্তান। ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের পাকিস্তান প্রস্তাবের স্মরণে মিনারটি করা হয়েছে। মনে হলো পাকিস্তান প্রস্তাব এক বাঙালীর, বাংলার মানুষই জোরদারভাবে করেছিল পাকিস্তান, এমন কি তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকেই শাসন পরিষদে পাঠানো হয়েছিল মোহাজের লিয়াকত আলী খান ও ইসকান্দার মীর্জাকে। আর সেই পাকিস্তান বাঙালীকে তার প্রতিদান দিয়েছিল গণহত্যা চালিয়ে। না, মিনার-ই-পাকিস্তান দেখার কোন ইচ্ছা আমাদের হয়নি।

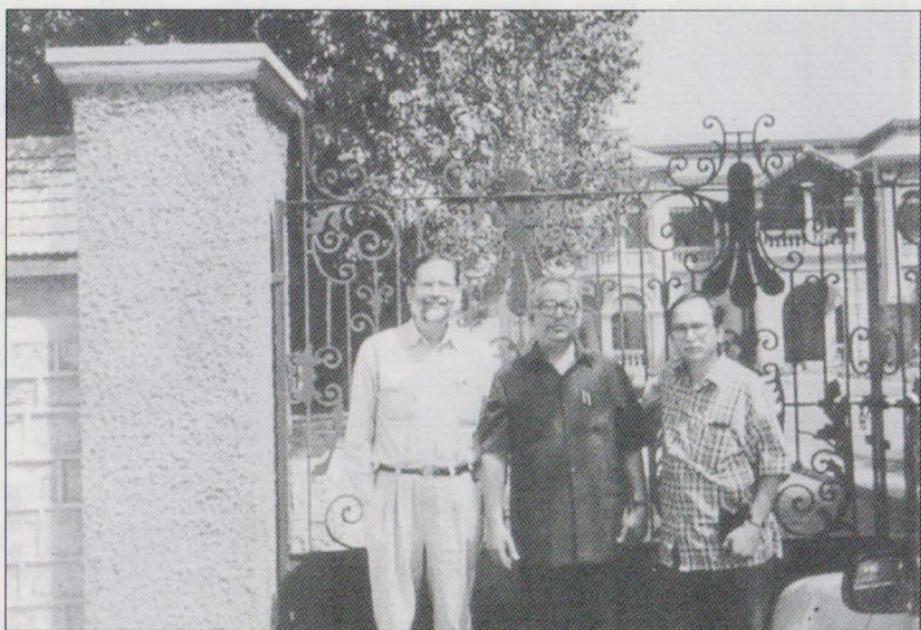
আমরা বরং খিলাম পেরিয়ে গেলাম সম্বাট জাহাঙ্গীরের সমাধি দেখতে। তিনি দশক আগে যা দেখেছিলাম, এখনও তাই আছে, বরং মনে হলো ক্ষয় হয়েছে।



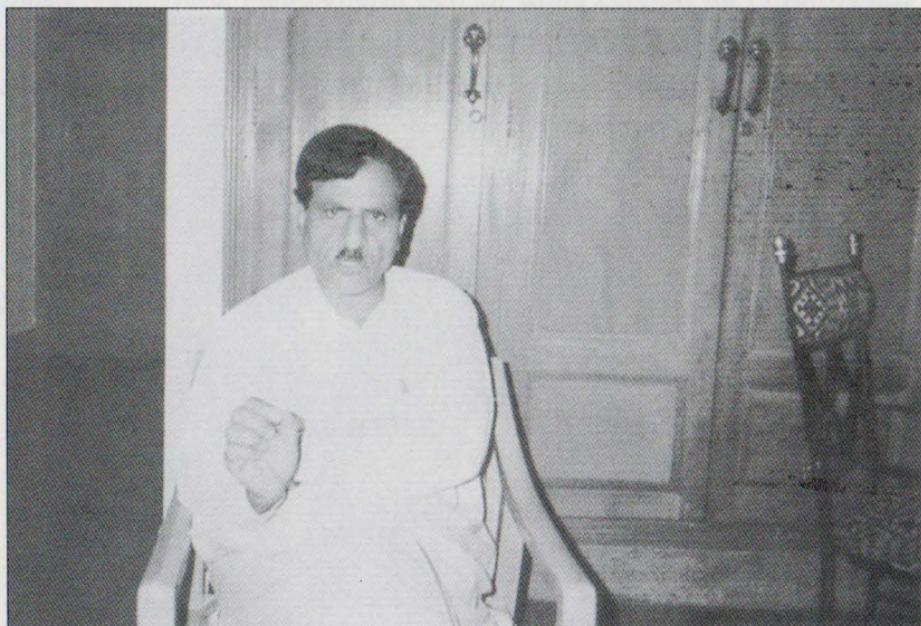
ড. তারিক রফিউ



ডেন. জেনারেল (অব: ) আশীর আবদ্দুল্লাহ খান নিয়াজী



কায়েদে আজম যাদুঘরের সামনে আফসান চৌধুরী, মহিউদ্দিন আহমেদ ও লেখক



কবি আহমদ সেলিম



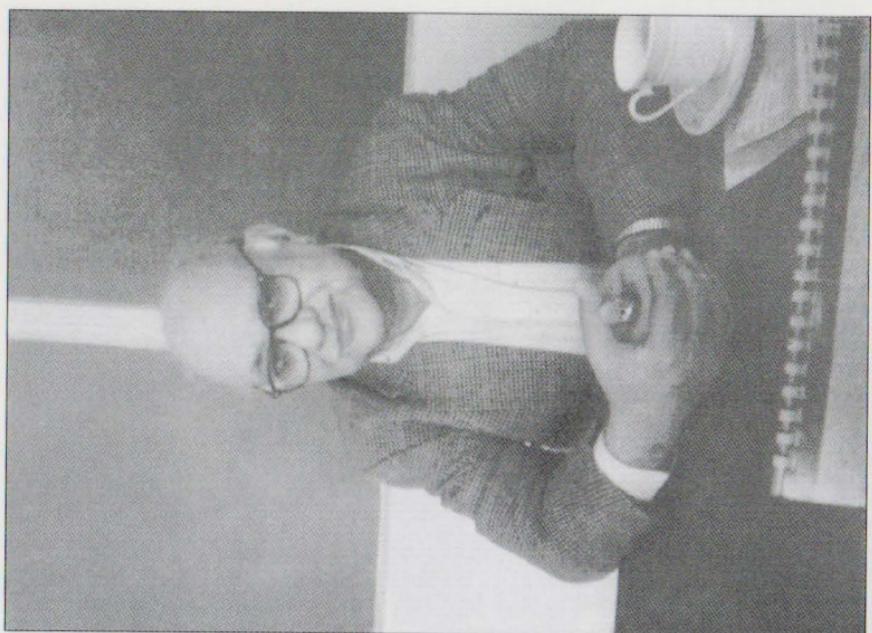
মেরাজ মোহাম্মদ ও আজহার জামি



মহিউদ্দিন আহমেদ ও তাহেরা মাজহার আলী



কর্মজী৭৫ আইন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ



দৈনন্দিন খাগোল মন্ত্ৰণালয়

উন্নতির মধ্যে একটি কিয়ক বসানো হয়েছে যেখানে উচ্চ মূল্যে চা, ঠাণ্ডা পানীয় বা ফিল্যু বিক্রি করা হয়। জাহাঙ্গীরের সমাধি থেকে বেরুলে রাস্তার উল্টো দিকে নূরজাহানের সমাধি। জীর্ণ, সংক্ষারহীন, আগে যেমন ছিল তেমন। নূরজাহানের ইচ্ছা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে কর্তৃপক্ষ। উদ্দেশ্যহীনভাবে আরও কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আসি ঘরে। দুপুরের খাবারটা বিশেষভাবে চোখে পড়ল। শুধু রুটি আর শাক। মহিউদ্দিন ভাই জানালেন, পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের খাবার। দেখা গেল, সিভিল সার্ভিস একাডেমীতে শিক্ষার্থীদের সাধারণ মানুষের খাবারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

দুপুর দুটায় আমাদের পৌছার কথা ছিল অক্সফোর্ড অফিসে। ড্রাইভারটি নতুন, ভুল করল রাস্তা, অক্সফোর্ডে পৌছলাম অনেক দেরিতে। খালেদ আহমদ ঠিক সময়ই এসেছিলেন এবং এই মাত্র অপেক্ষা করে চলে গেলেন। কোথায় যেতে পারেন? বাসায় ফোন করলেন আমজাদ, না বাসায় যাননি। অফিসে যেতে পারেন। তবে এত তাড়াতাড়ি পৌছার কথাও নয়। অক্সফোর্ডে বসে থাকলাম ঘণ্টাখানেক। তার পর খালেদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ফ্রাইডে টাইমসে পৌছতে পৌছতে দেখি বেলা প্রায় ঢলোচলো।

পুরনো লাহোরের এক গিঞ্জি গলির শেষ মাথায় টাইমসের অফিস। এলাকাটি ছিল আগে বইপাড়া। এখন অন্যান্য দোকান স্থান নিচ্ছে বইয়ের। তবে রয়ে গেছে কিছু পত্রিকার অফিস ও দোকান। টাইমসের অফিসে পৌছে খালেদকে দেখে মনে হলো তাঁকে আমি চিনি। তিনিও বললেন, একই কথা। তার পর হঠাতে এক সঙ্গে দু'জনারই একই কথা মনে পড়ল।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় যেসব পরিদর্শক এসেছিলেন নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা দেখতে, খালেদ ছিলেন তাঁদের একজন। ওই সময়ই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, মানবাধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা প্রভৃতি ভাল লেগেছিল। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আমাদের প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পার্টি ও বিএনপি'র কর্মীরা নির্বাচনী বুথ তচ্ছন্দ করে দেয় এবং হিন্দু ভোটারদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। আমি নিজেও অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচাই। নির্বাচন কমিশনে এ নিয়ে আবেদন করা হয়েছিল যা গ্রাহ্য হয়নি। এই সময় খালেদ আহমদ এবং আমরা কয়েকজন ঐ এলাকায় যাই। তিনি হিন্দু ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন, ধর্মস্লীলা প্রত্যক্ষ করেন। ফিরে এসে তিনি প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনও করেছিলেন। এই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, লাহোর এলে যেন দেখা করি। আমার সে কথা মনেই ছিল না। এখন কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গেল। খালেদ আমাকে তাঁর কিছু লেখার কাটিং দিলেন বাংলাদেশ সম্পর্কে। একটি রিপোর্টে ঐ নির্বাচনী অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে। আরেকটি রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে, ১৯৯০ সালের

নির্বাচনের প্রাক্তালে পাক সেনাপতি জেনারেল আসলাম বেগ ঢাকায় এসেছিলেন, সেনাবাহিনীর কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং একজন জেনারেলকে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেছিলেন। উদ্দেশ্য, আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে।

আমরা পরস্পরের খবর নিতে লাগলাম। চা খেলাম। তার পর বললাম, ‘খালেদ, এবার সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক। ১৯৭১ সালে কি করছিলেন আপনি?’

‘সঙ্কটের যখন শুরু,’ বললেন খালেদ, ‘তখন আমি মঙ্গোয় পাকিস্তান দৃতাবাসের তৃতীয় সচিব। পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছিল তার পাকিস্তানী ভাষ্যই আমরা পাছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়।’

‘তার পর?’

‘তার পর বদলি হলাম চেকোস্লোভাকিয়ায়। সেখানে রাষ্ট্রদূত ছিলেন বাঙালী আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন পাঞ্জাবী। অদ্রলোক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খুব একটা ভাল ব্যবহার পাননি। এ রকম আরও অনেকে আছেন। যেমন কর্নেল কাইয়ুম। সে অন্য কাহিনী। এসব কাহিনীর শুরু ১৯৪৭ থেকে।’

‘এ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘যখন পাকিস্তান হলো’, বললেন খালেদ, ‘তখন বলা হলো রাষ্ট্রীয় সব কিছু ইসলামী আদর্শ হবে। অন্য পক্ষ থেকে আপত্তি এল। সে সময় বাঙালী রাজনীতিবিদদের হিন্দু নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষতার আওয়াজ তোলেন। ওরা বললেন, ঐ ধরনের আদর্শ অমুসলিমবিরোধী। ঐ সময়ের গণপরিষদের কার্যবিবরণী পড়লে চমৎকৃত হবেন। ঐখানে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা চমৎকার তবে পথটি ছিল পিছিল ও বিপজ্জনক। ঐ সময়ের বাঙালী অনেক রাজনীতিবিদ সম্পর্কে আমার ধারণা ভাল নয়। তবে সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে একটি নতুন মূল্যায়ন করেছি। অতীতে তাঁকে আমরা যে মর্যাদা দিয়েছি এখন মনে হচ্ছে তা থেকে তাঁর আসন অনেক উঁচুতে। এখন মনে হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, তাঁর পথই ছিল সঠিক। পাকিস্তানকে ডানপন্থী বিপর্যয় থেকে তিনি উদ্বারের চেষ্টা করেছিলেন।’

‘নওয়াজ শরীফ বলেছেন’, বলি আমি, ‘১৯৭০-এর রায় বাস্তবায়িত হলে চির ভিন্নতর হতো।’

‘আমি মনে করি না ভিন্নতর কিছুর জন্য পাকিস্তানীরা প্রস্তুত ছিল।’ বললেন খালেদ।

‘আপনি বোধ হয় জানেন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘পরিকল্পনা কমিশনের তৎপরতার বিরুদ্ধে মধ্যমাট থেকেই প্রতিবাদ জানানো হচ্ছিল। কমিশন এ ব্যাপারে নতুন করে নাকি চিন্তা-ভাবনাও করছিল। কিন্তু শাসকচক্র তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বোঝা হিসাবে গণ্য করে বেড়ে ফেলতে চায়। এ ধরনের কোন দলিলপত্র কি দেখেছিলেন?’

‘না, সে সব এখন নেই,’ বললেন খালেদ, ‘পাকিস্তানে এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক কথা আপনি এখন বলতে পারবেন যা আগে বলতে পারতেন না। তবে এ কথাও সত্য যে, আপনি এমন কাউকে পাবেন না যে, পাকিস্তান ভাঙা সম্পর্কে ব্যালাসড ভিউ দিতে পারে। আমাদের বক্ষব্য একটাই ছিল, সব কিছুর জন্য দায়ী হিন্দুস্থান। বাস্তবতা হলো সমস্ত সংগঠনে পাঞ্জাবী আধিপত্য। আবার পাকিস্তানের অন্য প্রদেশে যান, দেখবেন দৃষ্টিপিং অন্য রকম। পাকিস্তানী সামরিক অফিসার হিসাবে ১৯৭০-এ আমি পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লায় ছিলাম। সব কিছু যে বুবতাম তা নয়, তবে অনুভব করতাম, বাঙালীরা ঘৃণা করে পাঞ্জাবীদের। বুবতে পারতাম, সবখানে পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে একটা সূক্ষ্ম প্রতিরোধ আছে যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৭০ সালে।’

‘বিশয়টি আরেকটু বিশ্লেষণ করুন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেনারেলরা ধৰ্ক্ষুত হয়ে ওঠেন,’ বললেন খালেদ, ‘সেনাবাহিনীর মনে হতে থাকে তারা বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে তারা জড়িয়ে পড়ে আফগান যুদ্ধে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। ১৯৭১ সালে পরাজিত সেনাবাহিনীর ইমেজ উদ্ধার। তারা ভাবতে থাকে পরাজিত ভাবমূর্তির ঘেরাটোপ থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। এ ছিল এক ধরনের প্রতারণা যা ক্ষতি করে পাকিস্তানী মানসের। পাকিস্তানের ডানপন্থী মানসিকতা কখনও বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি এবং করেও না। এদের কাছে ১৯৪৭-এর পর আর কোন ইতিহাস নেই। আর এই মানসিকতার কেন্দ্রস্থল পাঞ্জাব। বাঙালীরা যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলেছে তখন পুরো পাকিস্তান তার লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল এই পাঞ্জাব। আর সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবী, যারা ছিল শাসকচক্রের অঙ্গ। তারা এক বিশেষ ধরনের ছকে বাঁধা চিন্তার অধিকারী। পাকিস্তানের কিছু রাজনৈতিক দল তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ঐ শাসকরা সব সময় মনে করেছে আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে ডুবিয়েছে, সুতরাং সে গ্রহণযোগ্য নয়। এখনকার ইতিহাসগুলোতেও সে ধারণাই বিধৃত হয়েছে।’

‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে ভারতীয় এজেন্ট হিসাবে তুলে ধরা হয়,’ বলি আমি, ‘আর বাংলাদেশে হয়ে ওঠেন তিনি নায়ক। আপনি কি মনে করেন পাকিস্তানী শাসকরাই তাঁকে জেলে পুরে, ফাঁসি দিতে চেয়ে এমন জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন যে, তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালীদের অবিসংবাদিত নেতা?’

‘হ্যাঁ, বলতে পারেন,’ বললেন খালেদ, ‘পাকিস্তানের যদি অন্তঃকরণ বলে কিছু থাকে তাহলে তাতে বড় একটা গর্ত ছিল যা ভরাট হয়নি। তাই ভূট্টো যখন জেল থেকে মুজিবকে মুক্তি দেন তখন পাকিস্তানীদের মনে হয়েছিল একজন বিশ্বাসঘাতককে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তার পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্ন এল,

তখনও পাকিস্তানীরা বলল— না। কেন? কারণ মুজিব একজন ‘বিশ্বাসযাতক’। কিন্তু কেউ ভেবে দেখল না যে, এই ব্যক্তিটি বাংলাদেশের সব ভোট পেয়েছেন। হয়ত বাংলাদেশ তাদের পছন্দের নয় কিন্তু সে দেশের নেতা তো শেখ মুজিবুর রহমান। এ দেশের মানুষ কখনও বাস্তবতা স্বীকার করেনি। দেশ বা জাতি যদি ঐক্যবন্ধ হয়ে কোন অবস্থান নেয় তা হলে সে অবস্থান বৈধ। এ সব নিয়ে পাকিস্তানীরা কখনও ভাবেনি।

‘আপনি তো সাংবাদিক,’ বলি আমি, ‘এই সংবাদপত্রের মানস সম্পর্কেই না হয় কিছু বলুন।’

‘পাকিস্তানের সংবাদপত্র জগত দু’ভাগে বিভক্ত,’ বললেন খালেদ, ‘উর্দু ও ইংরেজী এবং কারও সঙ্গে কারও যোগ নেই। ইংরেজী সংবাদপত্রের পাঠক স্বল্প কিন্তু এ পত্রিকাগুলিতে তথ্য আছে, পরিণত চিন্তার ফসল সেগুলি। অন্যদিকে উর্দু পত্রিকাগুলির পাঠক প্রচুর এবং এ সব পত্রিকায় তথ্য বা উপাত্ত কম। এ সব পত্রিকার পাঠকদের কাছে পাকিস্তান ছাড়া আর কোন পৃথিবী নেই। তাদের ধারণা, গোটা পৃথিবীই ইসলামবিরোধী। বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ধরুন। বাংলাদেশ সম্পর্কিত বাস্তবতা বা সত্যিকার ঘটনাগুলো উর্দু পত্রিকায় আসে না। উর্দু পাঠ্য বইগুলো দেখুন। দেখবেন, বাংলাদেশ হচ্ছে ভারতীয় চক্রান্তের ফসল। এদের ধারণা বাঙালীরা যেন এক পশু হিন্দুরা যাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিচ্ছে। অচিন্ত্যনীয় ধ্যান-ধারণা! ফলে পূর্ব পাকিস্তান যে পাকিস্তান থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাতে অবাক হইনি।’

‘তাহলে কি আপনি মনে করেন,’ জিজেস করেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘পাকিস্তানের জন্ম স্বাভাবিক নয়?’

‘না, আমি তা মনে করি না,’ বললেন খালেদ, ‘যেমন মনে করি না, বাংলাদেশের জন্ম অস্বাভাবিক। ভারত বিচ্ছিন্নতার জন্য কংগ্রেস অনেকখানি দায়ী। উপমহাদেশের সকল দুর্ভার্গ্য সেখানে। চলুন, আরেক কাপ চা হয়ে যাক।’

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে আমরা অন্য আলাপ করি। বাংলাদেশ, ১৯৯৬-এর নির্বাচন, পাকিস্তান, ভারত। এর ফাঁকে চা আসে। চা পর্ব শেষ হলে আমি জিজেস করি, ‘১৯৭০-এর পর তো আপনি আবার বাংলাদেশ গেছেন। কোন পার্থক্য কি আপনার চোখে পড়েছে?’

‘১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় গিয়েছিলাম তা তো আপনি জানেন,’ বললেন খালেদ, ‘জন্মের সময় দেশটি ছিল লোকায়ত, ধর্মনিরপেক্ষ। ২০ বছরের সামরিক শাসনের অধীনে থেকে বাঙালী বদলে গেছে। ওদেশের মানুষ আর তেমন ধর্মনিরপেক্ষ নেই যেমনটি থাকবেন বলে আমি ভেবেছিলাম। এর আলামত আমি দেখেছি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণে। এ সময় একটি গ্রামে গিয়ে দেখতে

পাই, সংখ্যালঘু ভোটারদের মারধর করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে আমি তা বলি। লক্ষ্য করি, সত্ত্বভাগ সাংবাদিকের আমার কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না। আরও একটি বিষয় চোখে পড়েছে, তা হলো ভারতবিরোধিতা। ধর্মীয় সংগঠনগুলো বাংলাদেশে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমার কেন জানি মনে হয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অনুকরণের চেষ্টা করছে। এটি ভয়াবহ একটি ব্যাপার। মরার সাধ যদি আপনার জেগে থাকে তবে অবশ্যই তা করতে পারেন। তবে আমার ধারণা, আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে যদিও আওয়ামী লীগ আর ধর্মনিরপেক্ষ মেনিফেস্টোতে ফেরত যেতে পারছে না, বরং আমার মনে হয়েছে আওয়ামী লীগ যেন ইসলাম রক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সক্রিয়তাবাদীরা আছে যেটি পাকিস্তানে নেই এবং এটিই আশার বিষয়।’

‘আর কি বৈশিষ্ট্য আপনার নজরে পড়েছে?’ জিজেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘বাংলাদেশ যখন হয় তখন আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ, ভারতের ৩ শতাংশ আর বাংলাদেশ ছিল বাক্সেট কেস। এখন ভারতের প্রবৃদ্ধি ৬-৭ শতাংশ, আমাদের তিন আর বাংলাদেশের বাড়ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমছে। অর্থনৈতিকভাবে দেশটি মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে তবে দেশটিতে দুর্নীতিও ব্যাপক। খালেদা জিয়ার আমল ছিল দুর্নীতিতে ভরা। যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছিলেন সবাই ব্যবসায়ী এবং এন্দের অনেকেই নাকি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত দেননি। কাজেই বাংলাদেশ বলতে পারি, নিজেকে যোগ্যতা অনুযায়ী তুলে ধরতে পারেনি। আর পাকিস্তান তো ভারতের বাইরে নজর দিতেই পারছে না।’

‘সবশেষে,’ বলি আমি, ‘সাম্প্রতিক কন্ট্রোভার্সি সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই। বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া না চাওয়া নিয়ে একটি বিতর্ক চলছে, এ সম্পর্কে আপনার মত কি?’

‘দেখুন,’ বললেন খালেদ, ‘এ কথা আজ পরিষ্কার করে বলার দরকার যে, যা হবার হয়ে গেছে এজন্য আমরা দুঃখিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিরোধগুলোর নিষ্পত্তি না হতে পারার কারণ, যা হয়ে গেছে পাকিস্তান তার সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এমন এক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা দরকার যে অনুতঙ্গ হতে পারে, অতীতে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখবোধে সক্ষম। এটি অত্যন্ত জরুরী।’

॥ ২২ ॥

জেনারেল নিয়াজী ফেরেন নি ইসলামাবাদ থেকে, অথচ অনেক আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতকারের বিষয়টি ঠিক করা ছিল। আমরা আসার ঠিক আগে তিনি লাহোর ছেড়েছেন। একবার মনে হলো, তিনি আমাদের এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু আমজাদ জানালেন, নিয়াজী আংকেলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। হয়ত কাজে আটকে গেছেন। আমরা দিল্লী ফিরব লাহোর থেকে। সুতরাং আমাদের তো আবার লাহোর ফিরতেই হবে। তখন হয়ত জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে দেখা হবে। মোস্তফা খারও চলে গেছেন ইসলামাবাদ। মনে হচ্ছে, তিনিও এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

দুপুরে আমরা রওয়ানা হব ইসলামাবাদের দিকে, বাসে করে। সুতরাং সকাল বেলাটা ঠিক করলাম, এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরেই কাটাব। আনারকলি বাজারে হাঁটাহাঁটি করলাম কিছুক্ষণ। কিংবদন্তি অনুসারে সম্মাট জাহঙ্গীরের আমলে পতন এ বাজারের। লাহোরে সবচেয়ে পুরনো গমগমে বাজার, আমাদের যেমন চকবাজার। কয়েকটি বইয়ের দোকান ঘুরে ফিরে দেখলাম। এ রকম একটি বইয়ের দোকানে ফের দেখা হলো কুরারুত্তেলের সঙ্গে। তাহের মাজহার আলী ঠিকানা দিয়েছিলেন পাকিস্তান কুটির শিল্পের দোকানে যেতে। খুঁজে বের করলাম দোকানটি। কুটির শিল্প বা হ্যান্ডিক্র্যাফটস-এর অবস্থা আমাদের থেকেও ভাল মনে হলো। দামও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দুপুর দুটোয় রওনা হলাম ইসলামাবাদের দিকে। শহর পেরিয়ে বাস ছুটল হাইওয়ে ধরে। চমৎকার ঝকঝকে হাইওয়ে। এই হাইওয়ে তৈরিতে নাকি বেনজীরের স্বামী জারদারির আগ্রহ ছিল বেশি। কারণ এতে খরচ বেশি, কমিশন বেশি। হাইওয়ের দু'ধারে কাঁটাতারের বেড়া। ভাবলাম, শুধু এই কাঁটাতারের বেড়া লাগাবার ঠিকাদারী যিনি পেয়েছিলেন তিনি নিশ্চয় এখন কোটিপতি। দু'ধারে ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠ। মানুষজন নেই শুধু। পাঞ্জাবের পাঁচ নদী থেকে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ফসলের ক্ষেত্রে ভিতর দুয়েকটি চাষীর বাড়ি। বাড়ি মানে, মাটির (পাথর?) তৈরী পড়োপড়ো কুটির। চারদিকে প্রাচীর। দুয়েকটা খাটিয়া পড়ে আছে চতুরে। পাশে বাঁধা মোষ। চাষীর অবস্থা যে খুবই খারাপ তা দেখেই বোঝা যায়। অনেক সময় মনে হলো, আমাদের চাষীরাও গরিব কিন্তু এতো গরিব বোধ হয় নয়।

আকাশে আজ আবার মেঘ করেছে। দু'পাশ সবুজ, নির্জন, শব্দহীন। আকাশ ছাই রংয়ের। মাঝে মাঝে হালকা নীল। সূর্য ডুবছে, পশ্চিম আকাশ হালকা ছাই, নীল ও কমলা রংয়ে মাখামাখি।

সন্ধ্যার মুখোমুখি হাইওয়ের পাশে এক রেন্টরাঁর সামনে থামল গাড়ি। ছোট রেন্টরাঁ। গরম বিরানি করা হয়েছে। যাত্রীদের অনেকে তাই হুড়োভড়ি করে থাচ্ছে। ব্যবস্থা সব প্রিমিটিভ। আমাদের হাইওয়ে ইনগুলো এর থেকে তের বেশি উন্নত।

অনেক কষ্টে এক কাপ কফি যোগাড় করে ছেট জানালার ধারে বসি। আকাশে আবার মেঘ করেছে। দু'পাশ সবুজ। রেস্টুরাঁর এই অংশটুকু ছাড়া দু'পাশ নির্জন, শব্দহীন, মনুষ্যহীন।

সূর্য ডুবতে এসে পড়লাম পাহাড়ী রাস্তায়। এবার দু'পাশের পাহাড় পাথুরে, কালো, চাঁদ উঠেছে। কালো পাহাড়ে জ্যোৎস্না। খাইবারের পথের ধরনটিও এ রকম। খাইবার গিরিপথে ভ্রমণ একটা অভিজ্ঞতা বটে। ত্রিশ বছর আগে দেখা অন্য একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়। সন্ধ্যার সময় ট্রেন থেমেছে আটক দুর্গের সামনে। দু'পাশে উঁচু পাথুরে পাহাড়। সামনে নদী। বাতাসে শুধু নদীর ডেউয়ের মৃদু শব্দ। পাহাড়ের চুঁড়ায়, আটক দুর্গের চতুরে আগুন জুলানো হয়েছে। প্রহরীরা বোধ হয় আগুন ঘিরে বসে গল্ল করবে। এই পাথুরে পাহাড়, জ্যোৎস্না, নির্জনতা কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দেয়!

সারা বাস শব্দহীন। বাস চড়াই-উৎৱাই ভাঙছে। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘ছাত্র থাকার সময় মাঝে মাঝে আমরা এখানে পিকনিক করতে আসতাম। রাতে জ্যোৎস্নায় বসে গল্ল করতাম। দেখতাম চারদিকে ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে।’ এখন হয়ত গল্ল মনে হতে পারে। কিন্তু এক সময় থর মরুভূমিতে ছেট ছেট রাজ্যের রেল স্টেশনগুলোতে ময়ূরদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। বছর পনেরো আগে রাজস্থানে ঘুরবার সময়ও এ দৃশ্য চোখে পড়েছে। কিন্তু এবার দেখিনি। কারণ রাস্তা বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে লোকালয়।

ইসলামাবাদ পৌছলাম রাত ন'টার দিকে। তখন টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। মহিউদ্দিন ভাই তাঁর পুরনো বন্ধু আনাস ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন। তিনি আমাদের জন্য গেস্ট হাউসে রুম বুক করে রেখেছেন। গেস্ট হাউসের গাড়ি এসেছে আমাদের নিতে।

ইসলামাবাদে আমাদের কাজ বেশি। কারণ নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশই বসবাস করেন ইসলামাবাদে। ১৯৭১ সালে যাঁরা নীতিনির্ধারক ছিলেন তাঁরাও আছেন ইসলামাবাদে, নয়ত পাশের শহর রাওয়ালপিণ্ডিতে। রাতের খাবার শেষ হতেই শুরু হলো বৃষ্টি। যদিও মার্চ মাস, ঠাণ্ডার আবহটা এখনও আছে। আমরা হিসাব করতে বসলাম কতজনের সাক্ষাতকার নেব। রাও ফরমান আলী, বিগেডিয়ার সিন্দিক, এয়ার মার্শাল আসগর খান, সাহেবজাদা ইয়াকুব আলী, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লেঘারি, রোয়েদাদ খান আরও অনেকে। আমরা ঠিক করলাম নির্ধারিত সাক্ষাতকারগুলিতো নেবেই, এছাড়াও যাঁরাই সাক্ষাতকার দিতে রাজি হবেন তাঁদের কাছেই হাজির হব। আগামীকাল সকাল থেকেই কাজ শুরু।

সকাল দশটায় ড. আফতাব আহমদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতকার। পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন সচিব। নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না বটে, তবে এক সময় কাটিয়েছেন ঢাকায়।

ইসলামাবাদ সুন্দর। কিন্তু এ রকম নিষ্ঠুর শহর আমার চোখে পড়েনি। পুরো ইসলামাবাদ বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত এবং প্রতিটি সেক্টর স্বয়ংসম্পূর্ণ। কে কোন সেক্টরে বাস করেন শুনলেই বোঝা যাবে তিনি কোন পদমর্যাদার লোক, তাঁর আয় কত। সরকারী ভবনগুলোও নির্ধারিত একটি সেক্টরে। মাইলের পর মাইল চওড়া সোজা রাস্তা। ইসলামাবাদে বাঁকা কোন পথ নেই। রাস্তার পাশে পাশে অফুরন্ত খালি জায়গা রেখে দেয়া হয়েছে। বাস প্রায় চোখেই পড়ল না। মাইক্রোবাস আছে কিছু। বিভিন্ন সেক্টরে সেক্টরে যাত্রী পরিবহন করছে। লাহোরেও পাবলিক ট্রান্সপোর্টের সংখ্যা নগণ্য বলে মনে হয়েছে। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ব্যাপারে মনোযোগী নয় মোটেই। ধরেই নেয়া হয়, ইসলামাবাদে যিনি থাকবেন তিনি হবেন পদস্থ অথবা ধনাত্য এবং গাড়ি তাঁর থাকবেই। সুতরাং পাবলিক ট্রান্সপোর্টের আর দরকার কি!

ড. আফতাবের বাসায় যেতে যেতে এগুলিই ভাবছিলাম। ইসলামাবাদ এসেছি আমি ত্রিশ বছর আগে। তখন শহরটি মাত্র গড়ে উঠছে। সারা শহর প্রান্তর, মাঝে মাঝে গড়ে ওঠা সেক্টর, শপিং কমপ্লেক্স শব্দটির উদ্ভব হয়নি তখনও। পুরনো রীতিতে রাস্তার পাশেই বসত বাজার। ঐ সময়ের একটি ঘটনা মনে আছে। আমরা ছিলাম সাংসদদের গেস্ট হাউসে। কোন এক সেমিনারে যোগ দিতে ড. কাজী মোতাহার হোসেনও এসেছেন ইসলামাবাদে, উঠেছেন এই গেস্ট হাউসেই। সকালে নাস্তার টেবিলে তাঁর দেখা পেয়ে তো আমরা বিস্তৃত ও মুঝ। কলেজে তাঁর প্রবন্ধ পড়তে হচ্ছে আমাদের। লেখককে দেখতে পাওয়া তখন সহজসাধ্য ছিল না। তিনি বললেন, সকালে ব্যায়াম সেরে তিনি আর বেরহতে পারছিলেন না। কারণ দরজা খুলতে পারছিলেন না। তখন জানালা খুলে কার্নিস বেয়ে তিনি বাগানে নেমেছেন। তারপর এসেছেন নাস্তা খেতে, অর্থ প্রতিঘরে বেডসাইড টেবিলেই রাখা আছে টেলিফোন। সে সময় বেবী মওদুদ থাকতেন ইসলামাবাদ। তাঁর বাবা বিচারপতি মওদুদ তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়ে পদস্থ কর্মকর্তা। বেবী মওদুদ নিজে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর ফলমূল।

সেই ইসলামাবাদ এখন বিশাল, অর্থ ফাঁকা এক প্রাণহীন শহর। ড. আফতাবের বাসায় পৌছে গেলাম ঠিক সময়েই। কারণ ইসলামাবাদে পথ হারানো মুশকিল।

ড. আফতাব টাইস্যুট পরেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বোঝা যায়, খাস পাঞ্জাবী নন, মোহাজের। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প সচিব হিসাবে অবসর নিয়েছেন। বাড়ির সামনে এক ফালি জায়গায় থরে থরে ফুল সাজানো। ড্রাইং রুমে জমকালো সব আসবাবপত্র। পরিচিতির পালা শেষ হতে না হতেই ‘বাক্ষে’ ‘বাক্ষে’ বলে চিৎকার করে উঠলেন। পাঠান এক তরুণ ভৃত্য নিঃশব্দে ঘরে চুকল। ‘জলদি চায়ে লে আও’, বলে আমাদের দিকে মনোযোগ দিলেন।

১৯৬৮-৬৯ সালের দিকে ছিলেন তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। 'বুঝলেন,' বললেন তিনি, 'ঢাকায় কেউ আমাকে টিপিক্যাল ওয়েষ্ট পাকিস্তানী ব্যরোক্যাট মনে করত না।' একথা কমবেশি সব ব্যরোক্যাটই আমাদের বলেছেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হতো, কেউ যদি টিপিক্যাল ব্যরোক্যাট না-ই হন তা'হলে পাকিস্তান ভাগ হলো কেন?

চা পান পর্ব শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকার স্মৃতিচারণ করলেন। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন আপনি নিজেকে টিপিক্যাল ওয়েষ্ট পাকিস্তানী ব্যরোক্যাট মনে করেন না?'

'কারণ আমি খালি বাসা আর অফিসই করিনি।' বললেন ড. আফতাব, 'আমি সবার সঙ্গে মেলামেশা করতাম। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল, আড়ডা হতো। জহুর হোসেন চৌধুরী, আবুস সালাম, শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন আমার বন্ধু।'

'১৯৭১ সালে কি আপনি ছিলেন ঢাকায়?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'না,' বললেন আফতাব, '১৯৬৮-৬৯-এ আমি ছিলাম ঢাকায়। ঐ সময় বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথখার্তায় বুঝতাম যে, একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে সবার মনে। সে সময়ের একটি ঘটনার কথা মনে আছে। ব্রিটিশ কনসালের বাড়িতে এক পার্টিতে আলাপ হলো শেখ মুজিবের সঙ্গে। আমার সঙ্গে ছিলেন বদরুল্লাহ। তিনি বললেন শেখ সাহেবকে 'আপত্তো বহুত বড়া লিডার হ্যায়।'

শেখ মুজিব হেসে বললেন, 'নেহি, সোহরাওয়ার্দি সাব পাকিস্তানকি লিডার হ্যায়, বড়া লিডার, আউর হাম ইহাকা ছোটসা লিডার হ্যায়।' আমার মনে হয়, মুজিব সে সময় রেডি ছিলেন না, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের ঝুলিং জাত্তার বিরুদ্ধে তাঁর করার কিছুই ছিল না।'

'তা হলে পুরো ব্যাপারটি ঘটল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'বাঙালীদের মনে ক্ষোভ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে,' বললেন আফতাব, 'আমার মনে হয় বাঙালীদের আসল ক্ষোভ ছিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের কোন স্থান নেই দেখে এবং সে ক্ষোভ যথার্থই ছিল।'

'১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয় লাভের পর পাকিস্তানী শাসকচক্র তা'হলে ঠিক কাজটি করেনি?' আবারও জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'দেখুন,' অনেকে বলেন, 'ভুট্টো থাকার কারণে বামেলাটা হয়েছিল,' বললেন ড. আফতাব, 'কিন্তু ভুট্টো না থাকলেও কি সমস্যার সমাধান হতো? হতো না। কারণ, ইয়াহিয়া ক্ষমতা ছেড়ে সরে দাঁড়াতেন না। আর মুজিবও সে সময় প্রস্তুত ছিলেন না ক্ষমতা গ্রহণে।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, সামরিক জাত্তা কখনই ক্ষমতা ছেড়ে সরে দাঁড়াবার চিন্তা করেনি।'

‘অনেকটা ভাই !’

‘১৯৭১ সাল সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?’ জিজ্ঞেস করি আমি ।

‘১৯৭১ সাল সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি এমন দাবি করব না । আমি ১৯৬৯ সালের দিকেই ঢাকা ছেড়ে চলে আসি । ১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনেই বাসায় ফোন করলাম । স্ত্রীকে বললাম, রাজিয়াকে ঢাকায় পাঠাবার বন্দোবস্ত কর । রাজিয়া ছিল আমাদের কাজের মেয়ে, বাঙালী । কারণ এর পর অবস্থা আরও খারাপ হবে । রাও ফরমান আলীকে ফোনে বললাম, এয়ারপোর্টে যেন সে একজন বাঙালী অফিসার পাঠায় রাজিয়াকে পৌছে দেয়ার জন্য । কারণ তার কাছে টাকা থাকবে ।’

‘তার মানে’, বললাম আমি, ‘আপনারা আঁচ করছিলেন যে কিছু একটা হবে বা হতে যাচ্ছে ।’

ড. আফতাব এ কথার জবাব দিলেন না । মহিউদ্দিন ভাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাঙালীরা নাকি ভারত বা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিতই হয়ে সব করেছে । এখানকার লোকজনও তো দেখি তাই বিশ্বাস করে ।’

‘পশ্চিম পাকিস্তানের ডানপন্থী প্রেসের রুটিন কাজ ছিল এ কথা রটনা করা যে, হিন্দু বা হিন্দু শিক্ষকরা বাঙালীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সব কিছু ঘটাচ্ছে । এগুলো ঠিক নয় । বাঙালীদের নিজস্ব সত্তা ছিল এবং আছে । সেটা তারা প্রকাশ করতে চেয়েছে । আমিতো ঢাকায় ছিলাম । আমার মনে হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তারা কখনও একাত্ম বোধ করেনি । আমি, আমার পরিবার ঢাকায় ছিলাম । বাঙালী বন্ধু-বন্ধবও আমাদের ছিল । তাঁদের উষ্ণতা, আতিথেয়তা, সহন্দয়তা ভোলার কথা নয় । কিন্তু তবুও আমার মনে হয়েছে পশ্চিমাদের সঙ্গে তারা একাত্ম বোধ করেনি ।’

‘১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কি ঘটেছিল আপনি জানেন ?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি ।

‘বিস্তারিত জানি না,’ বললেন ড. আফতাব, ‘শুনেছি কিছু অত্যাচার হয়েছে । দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কারণে বাঙালীরা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল । তাদের বিরুদ্ধে এমনটি ঘটতেই পারে ।’

ড. আফতাবের সঙ্গে এরপর অন্যান্য বিষয়ে আলাপ হলো । মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তেমন আলাপ আর হয়নি । কারণ যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষভাবে নীতিনির্ধারণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না সেহেতু তাঁর প্রতিক্রিয়া টিপিক্যাল ওয়েস্ট পাকিস্তানী ব্যৱোক্যাটদের মতোই হবে । বিদায় নেবার আগে তিনি বললেন, ‘১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছে বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে । শেখ মুজিব বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, পেয়েছেন । এতে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই ।’

॥ ২৩ ॥

মারগালা হিলস দেখতে দেখতে চলছি। মহিউদ্দিন ভাই গাড়ি থামাতে বললেন। সামনে একটি শপিং কমপ্লেক্স। আহা মরি কিছু নয়। ইসলামাবাদের তুলনায় ইসলামাবাদের শপিং কমপ্লেক্সগুলো নেহায়তই দীনাধীন। ক্যামেরার ফিল্ম কিনতে হবে। ফিল্ম কেনা হলে মহিউদ্দিন ভাই ফোন ব্যবহারের অনুমতি চাইলেন। আমাকে বললেন, খার-কে দেখি। উর্দুতে ফোনে খানিকক্ষণ বাতচিত হলো। জানা গেল, খার আছেন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘খার-কে পেতেই হবে। চলেন ইন্টার কনে।’

হ্যাঁ, ইন্টার কন্টিনেন্টালের জাঁকজমকের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে ইসলামাবাদের। ভিতরে চুকলে মনে হবে অন্য পাকিস্তান। হোটেল রিসেপশন থেকে খারের ক্রম নম্বর জেনে ফোন করলেন মহিউদ্দিন ভাই। খার-কে চাইলেন। আমাদের দেশের বড় কর্তাদের পিএদের থিম সং হচ্ছে— দেখতে হবে। সে রকম খারের কক্ষ থেকেও জানতে চাওয়া হলো আমরা কে বলছি এবং তারপরই ‘দেখতে হবে’। বলা হলো, খার নেই। তবে ফিরবেন এখনি। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘চলেন, লবিতে বসি।’

অতএব, মোস্তফা খারের জন্য আমরা লবিতে অপেক্ষা করতে থাকি। চারদিকে সুবেশী পুরুষ-মহিলারা ঘোরাফেরা করছেন। পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তানের যে ইমেজ সে ইমেজের সঙ্গে হোটেলের লবিতে দেখা পুরুষ-মহিলাদের কোন মিল খুঁজে পেলাম না। লবির এক কোণে কালাশিকনভ নিয়ে বসে আছে শাস্ত্রী। মহিউদ্দিন ভাইকে বললাম, ‘মোস্তফা খারকে আপনি চেনেন?’

‘না, সে অর্থে চিনি না।’

‘চেহারা মনে আছে?’

‘আবছা আবছা।’

‘তা হলে মোস্তফা খার যদি এই লবি দিয়ে ঢোকেও আপনি তাঁকে চিনবেন?’

‘বোধ হয় চিনব।’

‘মোস্তফা খার আমাদের এড়িয়ে যেতে চাইছে, মহিউদ্দিন ভাই’, বললাম আমি, ‘এ অপেক্ষা বৃথা।’

‘তবুও দেখি না।’

মহিউদ্দিন ভাই লবির সোফায় গ্যাট হয়ে বসে রইলেন। আমি পুরো লবিতে এক চক্কর দিয়ে পাকিস্তানের আধুনিক ধর্মী সমাজের প্রতিনিধিদের দেখলাম। তারপর বেরিয়ে রাস্তার পাশে বসে মারগালা হিলস পর্যবেক্ষণ করলাম। সময় কাটে না। ঘন্টাখানেক পর ফিরে বললাম, ‘এবার আমাদের উঠতে হবে। কারণ বিকালে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার। এইসব খার ফার থেকে তা বেশি ইম্পট্যান্ট। এখন বাজে দুপুর দেড়টা।’

এবার মনে হলো, কনভিসড হলেন মহিউদ্দিন ভাই। আবার ফোন করলেন মোস্তফা খারের ঝর্মে। খার ফেরেননি। আমি বললাম, ‘তিনি আজ আর ফিরবেন না। তিনি খাঁটি পলিটিশিয়ান। আমাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা তাঁর নেই।’

ফজলুল হক এ্যাভিনিউ ধরে আমরা ফিরছি। ইসলামাবাদে এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমউদ্দিন আর সোহরাওয়ার্দীর নামে তিনটি সড়ক আছে। যেতে যেতে ভাবছিলাম। পাকিস্তান সফরে আজ আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকার। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের গণহত্যার সঙ্গে দু'টি নাম প্রধানত যুক্ত। জেনারেল নিয়াজি ও জেনারেল ফরমান আলী। নিয়াজির সঙ্গে এখনও দেখা করতে পারিনি। কিন্তু ফরমান আমাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। পুরো সাক্ষাতকার ভিডিও করার অনুমতিও দিয়েছেন। পঁচিশ বছরে এ ধরনের সাক্ষাতকার প্রথম। ফরমান আলী থাকেন রাওয়ালপিণ্ডিতে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে ফরমান আলীর আত্মজীবনীটি উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। ‘হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড’ নামে ইংরেজীতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের বিভাগের পুরনো ছাত্র শাহ আহমদ রেজাকে দিয়ে বইটির অনুবাদ করিয়েছিলাম। মহিউদ্দিন ভাই ইউপিএল থেকে তা প্রকাশ করেছেন। বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে সব সেনা অফিসার ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাও ফরমান আলী ছিলেন সবচেয়ে বৃক্ষিমান এবং ঠাণ্ডা মাথার লোক। ১৯৭১-এর বিপর্যয়ের পরও পাকিস্তানে তিনি মর্যাদা পেয়েছেন এবং এক সময় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বেও ছিলেন। ফরমান আলীর আত্মজীবনীটি পড়লে মনে হবে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা ঘটেছিল তার কিছুই তিনি জানেন না। তিনি সামরিক বাহিনীর কোন কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি ছিলেন বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে। শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল ইত্যাদি। আমার মনে হচ্ছিল, এ বইয়ে তিনি যা বলেছেন, তার বেশি কোন কথা বলবেন না। তবুও চেষ্টা করে দেখা যাক না! বিকালে ভিডিও ক্যামেরাম্যান নিয়ে আমরা রওনা হলাম রাওয়ালপিণ্ডির দিকে।

রাওয়ালপিণ্ডি গড়ে উঠেছিল সেনা ছাউনি হিসাবে। ছোট শহর। ইসলামাবাদের সুপরিসর চওড়া রাস্তা ধরে গাড়ি ছোটালে আধ ঘন্টার বেশি লাগে না রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছতে। রাস্তার দু'পাশে মানব সৃষ্টি বন। ফুটপাথের পাশটা উঁচু সবুজ ঘাসে ঢাকা। তাতে ফুটে আছে সাদা ডেইজি, কোথাও হলুদ ফুলের গুচ্ছ। নীরব নিখর চারদিক। সুপরিসর রাস্তা শেষ হতেই রাওয়ালপিণ্ডি। মনে হয় হতশ্রী। করাচী বা লাহোরের মতো অধিকাংশ জায়গা জুড়েই সেনা অফিসারদের আবাসিক এলাকা। জাতির খেদমতের জন্য যা তাদের নামকা ওয়াস্তা দামে দেয়া হয়েছে। ফরমান পুরনো আমলের অফিসার, তাই রাওয়ালপিণ্ডির পুরনো জায়গায়ই জমি পেয়েছেন। সেনা

আবাসিক এলাকায় খুরশিদ আলম রোড বের করে তাঁর বাসায় যখন পৌছলাম তখন সূর্যের আলো ম্বান হয়ে এসেছে।

ছোট একতলা ছিমছাম বাড়ি রাও ফরমান আলীর। সামনে এক টুকরো সবুজ লন। চারদিকে মৌসুমী ফুলের কেয়ারী। তার বর্ণছটায় চারদিক উজ্জ্বল। শান্তি গিয়ে খবর দিল। রাও ফরমান আলী বেরিয়ে এলেন।

সত্য বলতে কি, রাও ফরমান আলীকে দেখে আমি খানিকটা হতাশই হলাম। আমার ধারণায় ছিল, হষ্টপুষ্ট এক সেনা অফিসার, যাঁর মুখে থাকে নির্বোধ হাসি আর চোখে ঢুরতা। কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শীর্ণকায়, বয়সের ভাবে খানিকটা ন্যুজ এক ব্যক্তি। যেন অবসরপ্রাপ্ত কোন স্কুল বা কলেজ শিক্ষক। জীবনের ভাবে যেন ক্লাস্ট!

রাও ফরমান আলী সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, তিনি অসুস্থ, জ্বরাক্রান্ত। কিন্তু আমরা এসেছি এতদূর থেকে, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি ড্রাইং রুমটি দেখছিলাম। ছিমছাম সাজানো। চীনের একটি স্ক্রলও ঝুলছে একদিকে। ফরমান আলীকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানালাম। তিনি বললেন, ব্যাপারটি তিনি জানেন এবং এ বিষয়ে কথা বলতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। আমি ফরমান আলীকে দেখছিলাম। এ লোকটি, বলা হয়ে থাকে, আমাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত। গণহত্যার একজন পরিকল্পনাকারী। আমি তাঁর পাশে বসে আছি। এতদিন যে তাদের বিরচন্দে প্রতিশোধের কথা বলেছি, মনের বাসনাও ছিল যা, তা চেপে চুপচাপ বসে আছি! ফরমান কি ভাবছিলেন জানি না। তিনি মন্দু স্বরে কথা বলছিলেন। এ স্বর এবং বলার ঢং কোন সৈনিকের নয়, বরং ক্লাস্ট কোন অধ্যাপকের। ভিডিও চিত্রকর সব ঠিক করে বললেন, ‘রেডি।’

‘জেনারেল রাও ফরমান আলী,’ মহিউদ্দিন ভাই জানতে চাইলেন, ‘বাংলাদেশের ঘটনায় আপনি কিভাবে জড়িয়ে পড়লেন?’

‘আমি পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম যাই ১৯৬৭ সালে। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের আগে আমি একবার ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু এ অঞ্চলটি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা থাকায় আমাকে আবার ফেরত পাঠানো হয় পূর্ব পাকিস্তানে। তখন জেনারেল মুজাফফরউদ্দিন ছিলেন জিওসি ও ভারপ্রাপ্ত গবর্নর। আমি কাজ করেছিলাম তখন উপসামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, সর্বশেষ সামরিক আইনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।’

‘এর মানে কি?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই। ‘এর অর্থ,’ বললেন ফরমান, ‘সামরিক আইনে প্রশাসনের আওতায় অনেক শাখা থাকে। আমি দেখাশোনা করতাম বেসামরিক প্রশাসন। সচিবালয় থেকে যেসব ফাইল আসত সেগুলো দেখে আমি

গবর্নরের কাছে পাঠাতাম সম্মতির জন্য। মাঝে মাঝে প্রশ্ন উত্থাপন করতাম। বস্তুত এ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা ছিল না।'

'জাতীয় নিরাপত্তার কোন বিষয়টি আপনি দেখতেন?' আবার জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি আসলে রাজনৈতিক দিকটিই দেখতাম। একটি উদাহরণ দিই,' বললেন ফরমান, 'আইয়ুব খানের সময় রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল। এ পরিস্থিতিতে ছাত্ররা এগিয়ে আসে। তখন এই ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।'

'এব্যস্ততাটা কি ধরনের ছিল?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'কাজটা ছিল ছাত্রদের মন জয় করে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা। শ্রমিকদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আসলে তখন ছাত্র ও শ্রমিক ফ্রন্টে ক্ষোভ দেখা দেয়। সেগুলো সমাধানের জন্যই আমি কাজ করতে থাকি।'

'এ জন্য কে দায়ী ছিল বলে আপনি মনে করেন?' জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

'সমস্যাটা ছিল জটিল,' বললেন ফরমান, 'আর এর সঙ্গে যুক্ত হয় ছাত্র রাজনীতি। ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কজা করে নিয়েছিল। সেখানে পুলিশ চুক্তে পারত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি উঁচু গাছ ছিল। ঐ গাছে উঠে দিনে আমরা পাঁচ বার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতাম। তারা যা খুশি তাই করত।'

'তাহলে তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদেই ছিলেন।' বলি আমি, 'আসলে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার কারণেই বোধ হয় পদটি দেয়া হয়েছিল।' কথা শেষ করার আগেই রাও ফরমান বললেন, 'না, সে অর্থে আমি ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। আমি জীবনে কখনও মদ খাইনি। আর তা ছাড়া আমি ছিলাম জুনিয়র পদমর্যাদার লোক। অবশ্য প্রমোশন পেয়েছিলাম দ্রুত।'

'এর কারণটা কি?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'এর কারণ কঠোর পরিশ্রম।' বললেন ফরমান, 'এ কাজ করতে গিয়ে হাজারো লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। সব রাজনীতিকেই আমি চিনতাম। অবশ্য পরের দিকে পরিস্থিতি বদলে যায়...।'

'সে কথা আপনি বলেছেন বইয়ে,' বলি আমি।

'না, তাই নাকি?' বললেন ফরমান, 'আমার মনে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানীরা যা পেতে পারে তার চেয়েও বেশি দাবি করছে।'

'আপনি কি অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'না, অর্থনীতির কথা আমি বুঝি না,' বললেন ফরমান, 'একজন ব্রিগেডিয়ার হিসাবে অর্থনীতির সত্যিকার পরিস্থিতি আমার জানা ছিল না।'

‘তার মানে আপনি সামরিক কালচারের লোক,’ যোগ করলেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের আপনারা ধার ধারেন না।’

‘দেখুন আমি অন্তত উপলব্ধি করেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ,’ বললেন ফরমান, ‘অবশ্য গোড়ার দিকে এগুলি আমার মাথায় আসেনি। পরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেক ধারণাই বদলে গেল। একবার ক্যাটনমেটে এক ব্যাংকের শাখা উদ্ঘোধনকালে আমি বলেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আমি জানতাম না সেখানে একজন হিন্দু নেতা বসে আছেন। আমি তখনও বুঝিনি যে, গোটা সমাজেই তাঁরা মিশে আছেন।’

‘ব্যাপারটা বাস্তব সত্য,’ বললাম আমি, ‘ইতিহাসের যে কোন বই পড়লেই ব্যাপারটা বোঝা যায়।’

‘আমি পড়েছি,’ বিজ্ঞের মতো বললেন ফরমান আলী, ‘মুসলমান কৃষকরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, বইয়ে পড়েছি।’

‘আমার যদূর মনে পড়ে,’ বললাম আমি, ‘আপনার বইতে লিখেছেন ইতিহাস এক পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। আপনি লিখেছেন ’৬৯ সালে আপনি একটি পোস্টারে দেখেছেন একজন ধূতি পরা লোক, হাতে ছড়ি...।’

‘আমি তো সে পর্যন্ত এখনও আসিনি,’ বললেন ফরমান, ‘পূর্ব পাকিস্তানে সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির প্রচারণা চলছিল...।’

‘আমার প্রশ্নটা ছিল,’ বললাম আমি, ‘একটি ধূতি পরা লোকের হাতে আপনি ছুড়ি দেখেছেন কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধূতি পরে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন বলব, ধূতির প্রচলনটাই প্রায় নেই। আছে লুঙ্গির। এই ধূতি-লুঙ্গির পার্থক্যের মধ্যেই পূর্ব ধারণা নিহিত। ধূতি পরা মানে লোকটি হিন্দু। আমি বলতে চাচ্ছি, আপনাদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার ও পূর্ব ধারণা এই যে, হিন্দুরা মুসলমান বাঙালীদের প্রভাবিত করেছে। আর হিন্দু মানেই তো ভারতীয়। তাই না?’

‘ঠিক বলেছেন আপনি।’ ফরমান আলী জোরের সঙ্গে একমত হলেন।

‘কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার যে,’ যোগ করলেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘সেনাবাহিনী পূর্ব ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।’

‘না, ঠিক নয়,’ বললেন ফরমান আলী, ‘আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে, হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানীদের মন-মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিল।’

‘আপনার বইয়ে লিখেছেন’ বলি আমি, ‘যে, তাজউদ্দিন আহমেদ হিন্দু পরিবারের সন্তান, মানে এমন কথা নাকি আপনি শুনেছেন।’

‘না, ঠিক তা নয়,’ বললেন ফরমান আলী, ‘তাজউদ্দিন ছিলেন পাকিস্তানবিরোধী। মুজিব তা ছিলেন না। খোন্দকার মোশতাকও পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন না।’

‘এর মানে তাজউদ্দিন ছিলেন বাংলাদেশবাদী, বাঙালীর সমর্থক?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘না, বিষয়টা একটু আলাদা। আপনি বাঙালীবাদী হতে পারেন। সব বাঙালীই তা হতে পারে। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিলেন।’

‘৪৭ সালে বাঙালীরাই পাকিস্তান এনেছিল। সেখানে হিন্দুদের প্রভাব থাকলে তারা পাকিস্তান চাইল কেন?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমি সে কথাই বলতে চাইলাম,’ বললেন ফরমান আলী, ‘কি এমন ঘটেছিল যে, পূর্ব বাংলার ৯৫ জন মুসলমানই পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের হেফাজত করাও উচিত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের।’

‘ঠিক তাই?’

‘নয় কি?’

‘কেবল যখন তারা তাদের অধিকারের কথা বলল তখনই পরিস্থিতি পাল্টে গেল,’ গলার স্বর শুনে মনে হলো মহিউদ্দিন ভাই চটে যাচ্ছেন।

‘দেখেন এসব ক্ষেত্রে আমি বাঙালীদের পক্ষে অর্থাৎ তাদের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে। কিন্তু পাকিস্তান ভাসার পক্ষে নই।’

‘আপনি কি মনে করেন না এই পাকিস্তান সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করে বাঙালীদের ন্যায্য অধিকার পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে।’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘দু’টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে,’ বললেন ফরমান আলী, ‘কোন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নিজেদের অধিকার চাইবার বৈধতা আছে কিন্তু তা রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই হতে হবে। আমি বলি, পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান ভাঙেনি, ভেঙেছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। তবে এটাও বাস্তব যে, দু’পক্ষই কিছু ভুল করেছে। আর দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু ভুল করেছে যা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার পক্ষে ছিল না।’

‘বুঝলাম,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার ছিল। আওয়ামী লীগ তা বলেছিল। সেই দলের প্রতিনিধি তাজউদ্দিনও একই কথা বলেছিলেন। তাহলে সবাইকে ছেড়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিষেদ্গার কেন?’

‘আপনারা নিশ্চয় জানেন,’ বোঝাবার ভঙ্গি করে বললেন ফরমান আলী, ‘মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগে তিনি ধরনের লোক ছিল। আওয়ামী লীগে শেখ মুজিব ছিলেন নেতা। খোন্দকার মোশতাক ছিলেন ডানপছ্টাদের আর আবদুস সামাদ আজাদ ছিলেন সমাজবাদীদের নেতা। তাজউদ্দিনও ছিলেন সে দলে। এঁরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানীদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পার্থক্য হলো— মুজিব ও মোশতাক গ্রংপ তা চাইতেন পাকিস্তানের আওতায় আর তাজউদ্দিনরা চাইতেন সে আওতার বাইরে।’

‘আপনার কল্পনা আমরা বুঝতে পারি,’ বললাম আমি, ‘ধরে নিছি ২৫ মার্ট সম্পর্কেও আপনি কিছু বলতে পারবেন। আপনার বইতে লিখেছেন, সতরের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ও অন্য দলগুলোকে টাকা পয়সা দিয়েছিলেন।’

‘না, আমি টাকা পয়সা দেইনি। ওদের আসন পেতে সাহায্য করেছি।’

‘কারণ?’

‘দেখেন, এটা গোপন কোন বিষয় নয়। শেখ মুজিবকেও আমি বলেছিলাম। ডানপন্থীরা কিছু আসন পেলে শেখ মুজিবের ওপর চাপ খানিকটা কমত। কিন্তু তিনি পেলেন কল্পনাতীত ভোট এবং হয়ে পড়লেন ছয় দফার জিমি।’

‘শেখ মুজিব সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘সেক্ষেত্রে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিল নয় কি?’

‘তাই উচিত ছিল।’ বললেন ফরমান।

‘তারপর কি হলো?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘ভেবেছিলাম, নির্বাচনের পর সমরোতা হবে। কিন্তু দেখা দিল সংঘাত। ভুট্টো-মুজিব কেউ কাউকে বিশ্বাস করেননি।’

‘লারকানায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো কি সমরোতা হয়েছিল আপনি জানেন?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘না, লারকানা সম্পর্কে কিছু জানি না। জেনারেল উমর ছিটেফোঁটা খানিকটা বলেছিলেন,’ জানালেন ফরমান, ‘লারকানায় ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বললেন, আপনি তো মুজিবকে প্রধান মন্ত্রী বানিয়েছেন। কারণ এর আগে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, মুজিবই হবেন প্রধান মন্ত্রী। ইয়াহিয়া উত্তরে বললেন, আমি না। জনসাধারণই তাঁকে প্রধান মন্ত্রী বানিয়েছে। ভুট্টো বললেন, মুজিবের দেশপ্রেম যাচাই করতে হবে। প্রক্রিয়াটা হবে এ রকম। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করতে হবে। মুজিব যদি তার প্রতিবাদ করেন তা হলে প্রমাণিত হবে তিনি দেশপ্রেমী নন। ভুট্টো নিজে প্রধান মন্ত্রী হতে চাচ্ছিলেন, অথচ দেশ একটা। এক সাংবাদিকের কাছে তিনি দুই প্রধান মন্ত্রীর কথাও বলেছিলেন। পরে অবশ্য তা অস্বীকার করেন। ভুট্টো নিজের দলকে বাঁচাবার জন্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং এ কাজ করতে গিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন, “ইধার হাম, উধার তুম।” বিষয়টি কি পরিষ্কার হয়েছে?’

‘আপনি যা বললেন তার পুরোটা হৃদয়ঙ্গম করা গেল না,’ বলি আমি।

‘ভুট্টো এবং মুজিব--দু’জনই ছিলেন আক্রমণাত্মক ভূমিকায়।’ বললেন ফরমান, ‘শেখ মুজিব বিপুল ভোটে জিতে ছয় দফার কাছে জিমি হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানির এক কর্মকর্তার বাসায় আমরা দু’জনে বৈঠক করি। তিনি কি ভাবছেন তা আমি জানতে চাই। চমৎকার বৈঠক হয়েছিল। তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাননি।’

‘আপনার বক্তব্য এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না।’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আগে থেকেই কর্তৃপক্ষ চাছিল আলোচনা ব্যর্থ হোক।’

‘আমার যদ্দুর মনে পড়ে’, বললেন ফরমান, ‘ইয়াহিয়া খান ১৬ মার্চ প্রথম বৈঠকের জন্য আসেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। সঙ্গে ছিল বিমানবাহিনীর দুই অফিসার। ৬৫ যুদ্ধের নায়ক মাসুদ ও জেনারেল শাহ আলী। বৈঠকে আমরা কোন উচ্চবাচ্য করিনি। শাহ আলী একবার কি বলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দেয়া হয়। তবে প্রেসিডেন্টকে আমি বলেছিলাম, স্যার, এমন কোন কিছু আমাদের করা উচিত হবে না যাতে পূর্ব পাকিস্তান আমাদের ছেড়ে যায়।’

‘তারপর?’

‘প্রেসিডেন্ট বললেন, জাতির জনক জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি ছিলেন, আমরা বরং তা চাইনি অর্থাৎ তিনি একটি রফায় পৌছতে চাছিলেন। আমার মনে হয়, ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে তিনি একটি রফায় পৌছেছিলেন। ১৯ মার্চ আমি মুজিবকে ফোন করে জিজেস করলাম, ভাই কুছ হুয়া। তাঁর সঙ্গে আমার একটা বঙ্গুত্ত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ হয়েছে। পাঞ্জাব থেকে কয়েকজন মন্ত্রী হবে, এখান থেকে হবে পাঁচজন আর আমি হবো প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু পরের দিন ভুট্টো পৌছলেন ঢাকা এবং সব কিছু ভেঙেচুরে শেষ করে দিলেন।’

‘তাহলে ২০ মার্চ বলা যেতে পারে আলোচনার সব পথ রূপ্ত্ব হয়ে যায়?’ জিজেস করি আমি।

‘বলতে পারেন।’ বললেন ফরমান, ‘ভুট্টো সামরিক আইন তুলে দেয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। সেই ভুট্টোই নভেম্বরে বললেন, সামরিক আইনের আওতায় তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। এ ছাড়া তখন নানা রকম ঘটনা ঘটেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অনেকে বলছিলেন, সিঙ্গাপুর স্বাধীন থাকলে আমরা স্বাধীন থাকতে পারব না কেন? ভারতের আমেরিকান এ্যাওসেডের বলছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তান না থাকলে পূর্ব পাকিস্তান টেকসই হয়ে টিকে থাকতে পারবে। সবার আবেগ তীব্র। আমাকে একজন বন্ধু (স্থানীয়) বলেছিল, এই হারামজাদাদের আমাদের ওপর শাসন চালাতে দেব না। আমি বলেছিলাম, ওরা যদি হারামজাদা হয়, আমরাও তাদের কাছে হারামজাদা।’

‘জেনারেল,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আমরা ২৫ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। অপারেশন সার্চলাইট কেন করা হয়েছিল?’

‘অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ে। ১৯ মার্চ পর্যন্ত আশাবাদী ছিলাম,’ বললেন ফরমান, ‘কিন্তু ২০ তারিখ থেকে বুবলাম কোথাও একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট হাউসে আলোচনা চলছিল। ওখানে ছিলেন প্রেসিডেন্ট, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল হামিদ, এ্যাডমিরাল আহসান, কর্নেল ইলিয়াসসহ আরও দু’একজন। আমি ও জিওসি এসবের বাইরে ছিলাম, আমাদের কাছ থেকে সব কিছু গোপন রাখা হচ্ছিল। এই সময় জেনারেল খাদেম হেসেন রাজাকে কমান্ডার নিযুক্ত করা

হয়। প্রেসিডেন্ট হাউসে কি হচ্ছে তার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য জেনারেল টিক্কাকে অনুরোধ করি। টিক্কা ফিরে এসে বললেন, মনে হয় দরকষাকষিতে বনছে না। সরকারের কর্তৃত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এদিকে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্টে কার্যত অবরুদ্ধ ছিল। শাক-সবজি পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে সরবরাহ করা হচ্ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্লেনে করে শাক-সবজি আসছিল আর এখানে সবাই ভাবছিল প্লেনে করে বুঝি সৈন্য আনা হচ্ছে।'

'ওহ!', অবাক হওয়ার ভান করে বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনা হয়নি। তাহলে ২৬ মার্চের আগেই পূর্ব পাকিস্তানে ৯০ হাজার সৈন্য ছিল। নাকি ক্রমে ক্রমে বেড়েছিল?'

'না, না,' বললেন ফরমান, 'সেটি ভিলু প্রশ্ন। ২৬ মার্চ প্রথম ব্যাটেলিয়ন সৈন্য পৌছায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।'

'অপারেশন সার্চ লাইটের টার্গেট কি ছিল?' আবারও জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'চা চলে এসেছে, চলুন চা খাওয়া যাক।' বললেন ফরমান, 'আর আমি একটু ক্লান্তও।'

হ্যাঁ, তাঁকে ক্লান্তই দেখছিল। আমরা নিজেদের চা ঢেলে নিলাম। অন্যান্য প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। তাঁর বড় মেয়েটির স্বামী ছিলেন সেনা অফিসার। মেয়েটি এখন বিধবা। জেনারেল নিয়াজীর বই ও ব্যক্তি-চরিত্র নিয়ে কথা হলো। ফরমান বললেন, নিয়াজী সম্পর্কে এখন যা বলছি তা অফ দি রেকর্ড। যা বললেন, তাতে নিয়াজীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় না, বরং এ কথাই প্রমাণ করে বাংলাদেশে পাকবাহিনী ধর্ষণ, হত্যা ও লুঠন নির্বিচারে চালিয়েছিল। ঘন্টা আধেক পর আবার আমাদের আলোচনা শুরু হলো।

'আমরা আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই।' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'অপারেশন সার্চ লাইটের টার্গেট কি ছিল?'

'একটা সময়ের ভিত্তিতে এ ধরনের পরিকল্পনা করা হয়,' জানালেন ফরমান, 'অর্থাৎ একটা বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতির উভ্রে হলে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সফলতা আসবে তাই ঠিক করা হয়। সেনাবাহিনীকে যখন মাঠে নামানো হয় তখন তারা সফল হওয়ার চেষ্টাই করে। পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সময় সব ধরনের আইনের কার্যকারিতা হারিয়েছিল। ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা। ২৫ মার্চ আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। ঠিক করা হয়েছিল রাজনীতিবিদদের শুধু গ্রেফতার করা হবে। সিদ্ধিক সালিক তখন লিয়াজোঁ অফিসার, যাছিলেন গবর্নর হাউসের দিকে। তাঁকে আমি একটি চিঠি দিই গবর্নর হাউসে পৌছে দেয়ার জন্য। সেখানে আমি বলেছিলাম, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমাধানও দিতে হবে। আমরা যাদের গ্রেফতার করতে চাই তাদের

গ্রেফতারের পর পরই রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দিতে হবে, যেমন পিপিপি'র আট দফা মেনে নেয়া হলো। আর শেখ মুজিবকে হত্যা করা যাবে না তবে তাঁকে গ্রেফতার করে চরমপক্ষীদের হাত থেকে আলাদা করে রাখতে হবে। প্রেসিডেন্ট এ প্রস্তাব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামিয়েছিলেন কিনা জানি না।'

'তারপর?'

'তারপর আমি আর জেনারেল খাদেম আলাদা হয়ে ফিরে এলাম। বাসায় ফিরে স্ত্রীদের জানালাম। আমি আর খাদেম সামরিক ব্যবস্থা নেয়ার বিরোধী ছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, স্যার, নিজের জানের জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই, আমি উদ্বিগ্ন পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য। কারণ এরপর আর পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না। সামরিক অফিসার হিসাবে পদত্যাগ করার উপায়ও ছিল না। সাহেবজাদা ইয়াকুব পদত্যাগ করায় অনেক বদনাম কুড়িয়েছিলেন যদিও তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা।'

'ধরা যাক,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'এমন কোন আদেশ দেয়া হলো যা পাগলসুলভ বা নির্বোধের মতো, তাহলে কি আপনি তা মানতে বাধ্য?'

'সেনাবাহিনীতে আদেশ না মানার কোন বিধান নেই।'

'এ ধারণা কিন্তু আজকাল আর যুদ্ধাপরাধী বিচারে গ্রহণ করা হচ্ছে না,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'হতে পারে,' ফরমানের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'আমার যদ্দূর মনে পড়ে,' বললাম আমি, 'জেনারেল নিয়াজী লিখেছেন যে, বাগদাদে চেঙ্গিস খান বা হালাকু খান যে রকম নির্মমতা দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে হবে। তিনি বলেছিলেন, তিনি মাটি চান, মানুষ নয়। শুধু তাই রাও ফরমান আলী সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। আপনার ডায়েরিতেও লেখা ছিল- বাংলার সবুজকে লাল করে দিতে হবে।'

'দু'টি আলাদা ব্যাপার,' বললেন রাও ফরমান আলী, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে যে, জেনারেল নিয়াজী একজন মিথ্যাবাদী। সবুজ রং লাল করার কথায় আমি...'

'সেটি আপনার বইতেই বলেছেন,' বলি আমি।

'আপনি কাজী জাফরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যে, টঙ্গীতে ঐ সময় এ বিষয়ে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন কিনা।' জোনালেন ফরমান, 'আরও ছিলেন দুই তোয়াহা, একজন জামায়াতের, আরেকজন মার্কসবাদী। তিনি বক্তৃতায় বলতে চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে কমিউনিস্ট ধারণায় বা লাল ঝাওয় রূপান্তরিত করবেন। জেনারেল ইয়াকুব বিষয়টি আমাকে জানালে আমি ডায়েরিতে তা লিখে রাখি। একটি বাক্যই ছিল সেখানে। একটি বাক্য দিয়ে কি পুরো একটি পরিকল্পনা করা যায়। জেনারেল নিয়াজী এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন।

বইটি মিথ্যায় ভরা । বইটি তিনি নিজে লেখেনওনি । আপনি তাঁকে ঐ বইটির একটি পৃষ্ঠা না দেখে তাঁকে লিখতে বলুন । তিনি যদি পারেন তাহলে মেনে নেব বইটি তাঁর লেখা । টিক্কা কথনও ঐ ধরনের উক্তি করেননি যা আপনি বলেছেন । গবর্নর হিসাবে তিনি ছিলেন চমৎকার, অথচ দুর্ভাগ্য যে, বেলুচিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর একই দুর্নাম রয়েছে ।’

‘আরও কি যেন বলছিলেন নিয়াজী সম্পর্কে,’ তাঁকে মনে করিয়ে দিই ।

‘নিয়াজী যেদিন দায়িত্ব নিলেন,’ ফরমান আবার শুরু করলেন, ‘সেদিন বললেন, মনে হয় দুশ্মনদের দেশে আছি । আমরা কিন্তু কথনও মনে করিনি আমরা দুশ্মনদের দেশে আছি, বরং আমরা মনে করেছি পাকিস্তানে আছি । তিনি আরও সব ভয়ঙ্কর কথা বলেছিলেন । যেমন এখানকার মানুষের পরিচয় বদলে দেব ।’

‘বলা হয়ে থাকে আপনি রাজাকার বাহিনী গড়েছিলেন ।’ জিজেস করি আমি ।

‘না, আমার মনে হয় মার্শাল ল’ সদর দফতর তা গঠন করেছিল ।’ বললেন ফরমান ।

‘আইডিয়াটা কার?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই ।

‘ফোর্স কমান্ডারের ।’

‘তিনি কে?’

‘নিয়াজী । তিনিই [আল] শামস ও [আল] বদরের স্বষ্টা ।’

‘তাঁর বইটিও তিনি তাদের উৎসর্গ করেছেন ।’ বলি আমি ।

‘তিনি তাদের স্বষ্টা, ব্যবহারকারী সব ।’ বললেন ফরমান ।

‘নিয়াজী লিখেছেন, আল বদর ও আল শামস নেতাদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছিল,’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই ।

‘আমি জানি না ।’ উত্তর দিলেন ফরমান ।

‘আপনি তো দেখছি কিছুই জানেন না’, খানিকটা বিদ্রূপের সুরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই ।

‘দেখুন, আসল ঘটনা হলো ঐ সময় কর্তৃত ভেঙ্গে পড়েছিল । আমি আর তখন কেউ না । গবর্নর মালেক পদত্যাগ করেন ভারতীয় আক্রমণের মুখে । আমার আর কোন কিছু করার ছিল না ।’

এরপর রাও ফরমান আলী ও আমার মধ্যে দ্রুত কিছু বাক্য বিনিময় হয় যা ছিল নিম্নরূপ :

আমি জিজেস করি-

‘এ ঘটনা কি ১৩ ডিসেম্বর, বুদ্ধিজীবী হত্যার আগের দিন ।’

‘হ্যাঁ, নিয়াজী ওদের হত্যার জন্য দোষারোপ করেছে.... সকলেই আমাকে এজন্য দোষারোপ করে ।’

‘তারা কেন, আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমগুলোও এজন্য আপনাকে দায়ী করেছে। কেন?’

‘আমি জানি না। আমি তো একাই ছিলাম তখন...’

‘আপনি যে বুদ্ধিজীবী হত্যার একজন তার তো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে এবং কেউ সেগুলো এখনও অঙ্গীকার করেনি।’

‘আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আমি এগুলো দেখিনি।’

‘বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। আমার জানা মতে ঢাকার নটরডেম কলেজের সামনে একজন ডাক্তারকে হত্যা করা হয় অক্টোবরে। অনেক আগেই বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয় যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৪ ডিসেম্বর। তাছাড়া নিয়াজী ব্যস্ত ছিলেন রণাঙ্গন নিয়ে আর আপনি ছিলেন প্রশাসনের ক্ষমতায়।’

‘নিয়াজী ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক।’

‘আপনি ছিলেন বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনীতির দায়িত্বে। যেমন গোলাম আয়ম বা আবদুল মাল্লানের সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তারা আপনার সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করত, বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করত। সুতরাং আপনার জানার বাইরে ঐ সময় কিছু ঘটবে কি করে। আপনি আমার এ মন্তব্যের সঙ্গে একমত?’

‘কেন একমত হব?’

‘কেননা আপনিই তো...’

‘কিছুই না বলতে কি হত্যাকে বোঝায়?’

‘আপনি প্রশাসনের ক্ষমতায় ছিলেন।’

‘না, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর দৃশ্যপট বদলে যায়। এ আইনে গবর্নর হাউসের নিজস্ব কোন স্থান ছিল না। গবর্নর হাউসের নিয়ন্ত্রণ ছিল শুধু সচিবালয়, পুলিশ ও রাজাকারের ওপর। সেনাবাহিনী, ইপিসিএফ ছিল সামরিক আইন প্রশাসক ও কোর কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে। আমার অধীনে কিছুই ছিল না।’

‘তাহলে সব কিছুর জন্য জেনারেল নিয়াজী দায়ী?’

‘জেনারেল নিয়াজী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী।’

‘কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে বলে জানি...’

‘শুনুন।’ আমাকে থামিয়ে বিশদ বর্ণনা শুরু করেন রাও ফরমান আলী, “জেনারেল শামসের ছিলেন পিলখানার দায়িত্বে। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি জানান, আমাদেরকে জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। জেনারেল নিয়াজীর সঙ্গে সাধারণত আমাদের কোন বৈঠক হয় না। জেনারেল শামসেরকে বললাম, ঠিক আছে যাব। পিলখানায় পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। সেখানে দেখলাম কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাঁকে জিজেস করলাম,

গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে কেন? তিনি বললেন, বিশেষ উদ্দেশে আমরা জেনারেল নিয়াজীর কাছে যাচ্ছি, সেজন্যই গাড়িগুলো এখানে। তারপর বললেন, কয়েকজন লোককে প্রেফতার করতে হবে। জিজেস করলাম, কেন? বললেন, কথাটা নিয়াজীকেই তুমি জিজেস করো। এতে তোমার মত কি? আমি বললাম, স্যার, এখন কাউকে প্রেফতারের সময় নয়, বরং এখন কত লোক আমাদের সঙ্গে আছে সেটিই দেখার কথা।'

'কত তারিখের ঘটনা এটা?'

'৯ কিংবা ১০ ডিসেম্বরের ঘটনা। তারপর আমি আর কিছু জানি না।'

'ঢাকার পতনের পর গবর্নর হাউসে আপনার একটি ডায়েরি পাওয়া গেছে সেখানে নিহত বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা ছিল।'

'কাউকে হত্যা করতে হলে কি আমি এভাবে তালিকা সংরক্ষণ করব? অনেকে আমার কাছে এসে অনেকের নামে অভিযোগ করত। যেমন তিনি এটা করছেন, ওকে সাহায্য করছেন। আমি তাদের নাম টুকে রাখতাম, এর সঙ্গে ঐ হত্যার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তার মানে দাঁড়ালো, আপনি বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে জানেন না, বাংলাদেশে গণহত্যা সম্পর্কে জানেন না...'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ফরমান। বললেন, 'গণহত্যা, গণহত্যা হয়নি।'

'গণহত্যা হয়নি মানে কি বলতে চান?' পাল্টা প্রশ্ন করি আমি।

'গণহত্যা হয়নি।'

'পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে লিখেছে গণহত্যা হয়েছে।'

'না, ঠিক নয়।'

'আচ্ছা জেনারেল,' প্রশ্ন করি আমি, 'বসনিয়া, হার্জিগোভেনিয়ায় কি হয়েছে বা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো যে খবর দিচ্ছে তা কি মিথ্যা?'

'সঠিক খবর তারা দিচ্ছে না।'

'আচ্ছা, গণহত্যা হয়নি। কিন্তু মানুষ তো মারা গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, এ রকম একটা ঘটনা ঘটলে তো কয়েকজন মারা যাবেই।'

'আচ্ছা কত মারা যেতে পারে। দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজার?' পঞ্চাশ হাজারটি জোরের সঙ্গে বলি।

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

আমি এ উত্তরের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ধীর কঠে বললাম, 'জেনারেল, ৫০ হাজার লোক হত্যা যদি গণহত্যা না হয়, তাহলে গণহত্যা কাকে বলে?'

জেনারেল রাও ফরমান আলীর উত্তর দেওয়ার কিছু ছিল না।

॥ ২৪ ॥

রাও ফরমান আলী যতোক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ততোক্ষণ সর্তর্কতা অবলম্বন করছিলেন। তাঁর বইয়ে তিনি যা লিখেছেন তাই মোটামুটি বলছিলেন। একটি পর্যায়ে অসর্তর্কভাবে গণহত্যার কথা পরোক্ষাভাবে স্বীকার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই চলে গেলেন অন্য প্রসঙ্গে। আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আর বাড়িতি কথা বলার দরকার ছিল না। সাক্ষাত্কার শেষ হলো।

ফরমান আলীর বাড়ি থেকে যখন বেরুলাম তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। আমাদের এখন আবার যেতে হবে ইসলামাবাদ, এয়ার মার্শাল আসগর খানের বাসায়। আজ সারা দিন ঘোরাঘুরিতে কেটেছে, ক্লান্তও ছিলাম কিন্তু উপায় নেই। আগামী কাল সকালে তিনি চলে যাবেন এবোটাবাদ। ইসলামাবাদ ও এবোটাবাদ- এ দুই জায়গায় তিনি ভাগাভাগি করে থাকেন।

আসগর খানের ‘জেনারেলস ইন পলিটিকস’ পড়ে এক সময় ভাল লেগেছিল। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পর তেহরিক-ই-ইশতিকলাল নামে একটি রাজনৈতিক দল গড়েছিলেন। এখনও তিনি সেই দলের প্রধান। কিন্তু গত ত্রিশ বছর পাকিস্তানের রাজনীতিতে তেহরিক কোন সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু ব্যক্তি আসগর খান রাজনীতিতে এখনও কঠিন। স্টাবলিশমেন্ট কখনও তাঁকে পছন্দ করেনি, কারণ তাঁর কাছে যা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তাই বলেছেন, রাজনীতির কথা ভুলে। ১৯৭১ সালে যখন এখানে গণহত্যা চলছে তখন তাঁর বিরুদ্ধে আসগর খানই কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁকে নিশ্চহ পোহাতে হয়েছে। এ কথা পাকিস্তানের সবাই স্বীকার করেছেন। একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, রাজনীতিতে আসগর খানকে কেউ মর্যাদা না দিলেও ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে সবাই কমবেশি শুন্দা করেন।

ইসলামাবাদের আসগর খানের বাসা খুঁজতে খানিকটা সময় লেগে গেল। কারণ তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, গেটে নির্দেশ দেয়া ছিল। কারণ শান্ত্রী আমাদের কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই দোরগোড়ায় পৌছে দিল। ড্রাইংরুমে আমরা বসলাম। ছিমছাম সাজানো।

আসগর খান এলেন। কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথেকে এলেন?’

‘রাও ফরমান আলীর বাসা থেকে,’ বললাম আমি।

‘কি বললেন ফরমান?’

‘তিনি কিছুই জানেন না। শুধু তাই না, পাকিস্তানে যাকেই জিজ্ঞেস করছি ১৯৭১ সাল সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা, তিনিই বলছেন কিছু জানেন না।’ বলে আমি হেসে ফেললাম।

আসগর খান মৃদু হাসলেন। তারপর হাতের একটি ভঙ্গি করে বললেন, 'দ্যাট ইল ফেমড ম্যান। এখন সব ফিলোসফিক্যাল ও হাই আইডিয়েলের কথা বলছে।' আমি তাঁর বইয়ের প্রসঙ্গ তুললাম। বললেন, বইটি ইন্ডিয়া থেকেও প্রকাশ করেছিল 'বিকাশ পাবলিশিং হাউস'। কিন্তু তারা না একটি বই পাঠাল না কিছু জানাল। রয়ালটির কথা বাদই দিলাম।' আমি বললাম, 'বইটির নতুন সংস্করণ হতে পারে। ঢাকার ইউপি এলও করতে পারে। রয়ালটি মার যাবে না।'

'আমি যখন সারগোদায় ছাত্র।' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'তখন আপনার কাছ থেকে পুরস্কার নিয়েছিলাম।'

হাসলেন আসগর খান। বয়স নিশ্চয় তাঁর আশির কাছাকাছি বা পেরিয়েছে কিন্তু বার্ধক্যের কোন ছাপ নেই শরীরে। সব সময়ই প্রসন্ন হাসি হাসি মুখ। বেশ স্বষ্টি পেলাম। এর মধ্যে চা-নাস্তাও এসে গেল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মহিউদ্দিন ভাই বললেন, 'আপনাকে বেশি প্রশ্ন করব না। ১৯৭১-এর ঘটনা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা তাই বলুন।'

'এক কথায় যদি জানতে চান, তাহলে বলি, পাকিস্তানে আমাদের খ্যাতি ভোট রিগিং-এর জন্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ত্রিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন। কারণ ইয়াহিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেউ পাবে না এবং তিনি তাঁর শাসন অব্যাহত রাখতে পারবেন। শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল ক্ষমতা। আমরা নিয়ন্ত্রিত সামন্ত শ্রেণী দ্বারা। তারা চায়নি মধ্যশ্রেণী ক্ষমতায় আসুক। পূর্ববঙ্গের প্রতি এমনই তাদের এ্যাপাথি ছিল। তারা আরও ভেবেছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ফিউডালিজম থাকবে না। এটিই হচ্ছে মূল কথা।'

'পটভূমিকা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলবেন।' বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, ভুট্টো তাঁকে বলেছিলেন, নির্বাচন বাদ দিতে। সৈনিক ইয়াহিয়া খান ও রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো ভাল টিম হবে এবং এক সঙ্গে তারা দেশ শাসন করতে পারবে। ইয়াহিয়ার মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা মন্দ না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারটা কি হবে? ভুট্টো বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান কোন সমস্যা নয়। সেখানে হাজার বিশেক লোক খতম করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি জিজেস করলাম, এ প্রস্তাবে আপনার কি প্রতিক্রিয়া হলো। ইয়াহিয়া বললেন, হোয়াট ক্যান ওয়ান সে টু সাচ এ সাজেশন।'

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় গেলেন। মুজিবের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনাও হলো। ইয়াহিয়া ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, মুজিব হবেন পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী।'

'তুরপর?'

‘এরপর সীনে এলেন ভুট্টো। ইয়াহিয়া খান গেলেন লারকানা। সেখানেই সিন্ধান্ত হলো মুজিব যদি তাঁর স্ট্যান্ড থেকে না সরেন তা’ হলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। ফেরুজ্যারির মাঝামাঝি রাওয়ালপিণ্ডিতে সামরিক জাত্তার বৈঠকে এই সিন্ধান্তটি গৃহীত হয়।’

আমার মনে হলো, আসগর খানের এই কথায় যৌক্তিকতা আছে। এই সিন্ধান্তের কারণেই ঢাকায় সৈন্য পাঠানো শুরু হয় এবং ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে জ্বালাময়ী সব ভাষণ দিতে থাকেন। ‘আপনি কি এই সময় ঢাকায় গিয়েছিলেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘মার্চের প্রথম সপ্তাহেই আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। রওয়ানা হওয়ার আগে ভুট্টোকে জানিয়েছিলাম ঢাকা যাচ্ছি। তিনি আমাকে করাচী হয়ে যেতে বললেন। করাচী গেলাম কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন না।

ঢাকায় মুজিবের সঙ্গে আমার তিনটি মিটিং হয়েছে। মুজিব জানিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চিত যে, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না এবং পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগ করবেন। তিনি বলছিলেন, পাকিস্তানের জন্য যখন তাঁরা আন্দোলন করেন তখন ভুট্টো ইয়াহিয়া কোথায় ছিল?’

‘বাঙালীদের তারা কখনও মানুষ মনে করেনি।’ আবেগরুদ্ধ কঢ়ে বললেন তিনি। ‘মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল কিন্তু তিনি যাননি। কেন যাননি, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা তাঁর ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের ধারণা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান গেলে তাঁকে হত্যা করা হবে। তা হলে ভবিষ্যতটা কী? তিনি বললেন, ইয়াহিয়া খান প্রথমে ঢাকা আসবেন, তারপর আসবেন এম এম আহমদ এবং তারপর ভুট্টো। ইয়াহিয়া খান এরপর সামরিক বাহিনী লেগিয়ে দেবেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। যদি গ্রেফতার করা না হয় তা’হলে পাকিস্তান বাহিনী অথবা তাঁর লোকেরাই তাঁকে হত্যা করবে। আশ্চর্য নয় কি তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছে?’ বলে আসগর খান চুপ করে থাকলেন।

‘আপনি কি মনে করেন’, জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘মার্চ যে আলাপ আলোচনা চলছিল তার ভিত্তিতে কিছু করা যেত?’

‘হ্যাত ইয়াহিয়া খান কিছু করতে পারতেন’, বললেন আসগর খান, ‘কিন্তু ইয়াহিয়া ছিলেন প্রধানত পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীর প্রধান। তাঁকে চাপ দিচ্ছিল ভুট্টো যে ছিলেন পাঞ্জাবের নির্বাচিত নেতা। ইয়াহিয়া খানের এ্যামবিশন না থাকলেও পাঞ্জাবীদের চিন্তাকে হালকাভাবে নেয়ার কোন উপায় তাঁর ছিল না। আমি মুজিবকে বলেছিলাম পাঞ্জাব সফর করতে। আরও বলেছিলাম তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উনি বলেছিলেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আমার মনে হয় তিনি ঠিকই বলেছিলেন।’

‘৬ দফা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকে ভেবেছিল ৬ দফার অর্থ পাকিস্তান ভঙ্গ। আসলে তা নয় এবং আমার মনে হয় মুজিব ক্ষমতায় গেলে ৬ দফা মডিফাই করতেন। কারণ তাঁকে তখন পুরো পাকিস্তানের ভূমিকায় বিষয়টি বিবেচনা করতে হতো।

‘২৫ মার্চ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?’ আবারও জিজ্ঞেস করি।

‘পুরো ব্যাপারটাই ছিল স্টুপিড। মিলিটারি টার্মসে এটি ছিল ম্যাডনেস।’

‘আপনি কি ২৫ মার্চের পর ঢাকা গিয়েছিলেন?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘হ্যাঁ, দুইবার,’ বললেন আসগর খান। ‘যা দেখেছিলাম তাতে আরও ডিপ্রেসড হয়েছিলাম। ঢাকায় জামাতিরা রিডিকুলাস এক আর্গুমেন্ট দিচ্ছিল যে, তাদের স্থান আওয়ামী লীগের পরে। সুতরাং তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। যেসব রাজনীতিবিদ এক মাস আগেও বলেছিল মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে তারা তখন আওয়ামী লীগকে হেনস্থা করার জন্য ইয়াহিয়াকে সমর্থন করছিল।

দ্বিতীয় দফায় গবর্নর মালেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ফ্যান্টাস্টিক সব কাহিনীর তিনি অবতারণা করেছিলেন। আমার বইতে তার বর্ণনা দিয়েছি। যা হোক, ঐ সময় আমি এখানে এ ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধিতা করেছি, বিরুদ্ধে বলেছি। আমাকে সবাই গালাগাল করেছে, পূর্ব পাকিস্তানের দালাল বলেছে। আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের এ্যাটিউডটা ছিল এ রকম—শেখ কিভাবে পাকিস্তান রুল করবে? পূর্ব পাকিস্তান বা এসব ব্যাপারে পাবলিকের একটা ফিল্ড নোশন ছিল এবং তা তৈরিতে ভুট্টো এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।’

‘তাহলে ’৭১-এর জন্য দায়ী কে?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া।’

‘এখানে অনেকে বলছে হিন্দুরা নাকি দায়ী?’

‘এ কথা বলা হয়েছে এবং হচ্ছে’, বললেন আসগর খান, ‘ঐ এ্যাকশন জাস্টিফাই করার জন্য।’

‘আপনি নিশ্চয় দেখছেন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘পাকিস্তানে এখন বিতর্ক চলছে, বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া হবে কি হবে না তা নিয়ে, এ বিষয়ে আপনার কি মত?’

‘দু’পক্ষই একসেস করেছে,’ বললেন আসগর খান, ‘মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।’ দু’পক্ষ শব্দটি আমার কান এড়াল না। গণহত্যার কথা বললে পাকিস্তানের সবাই কেমন যেন ডিফেনসিভে চলে যায়। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও বলতে হয়, অপর পক্ষও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। আসগর খান তাঁর কথা শেষ করলেন এভাবে, ‘এজন্য অবশ্য আমরা বেশি দায়ী কারণ আমরা ক্ষমতায় ছিলাম এবং আমরাই ব্যাপারটা শুরু করেছিলাম। ক্ষমা চাইলে ক্ষতের উপশম হবে, দু’পক্ষের সম্পর্কেরও উন্নতি হবে।’

॥ ২৫ ॥

আলতাফ গওহরের সঙ্গে যখন সাক্ষাতকারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তখন আমরা দু'জনেই খানিকটা সন্দিহান ছিলাম। আলতাফ গওহরের নাম আমাদের জেনারেশনের কাছে অজানা নয়। ষাটের দশকে আইয়ুব খানের পেয়ারের বান্দা ছিলেন তিনি। তথ্য সচিব হিসাবে পারস্পরিতা দেখিয়েছিলেন। আইয়ুব রাজত্বের অবসান হলে তাঁকে বিপাকে পড়তে হয়। শুধু চাকরিচুতিই নয়, প্রায় নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয় লভনে। সেখানে আইয়ুব খানের ওপর একটি বই লিখেছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। আজ সকালে আলতাফ গওহরের সঙ্গে সাক্ষাতকার। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, তেমন কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। সাক্ষাতকার শেষে মনে হলো, এ সাক্ষাতকার না নিলে অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত আমাদের কাছে, বিশেষ করে জোনারেল উমর ও ফরমান আলীর ব্যাপারে যে তথ্য দিলেন তাতে আদালতের কাঠগড়ায় তাদের তুলতে খুব একটা ঝামেলা হবে না।

দিনটি আজ ঝকঝকে। মনও ঝরঝরে। কাজটা বিনা বাধায় এগুচ্ছে। তবে রাস্তাঘাটে হঠাৎ সৈনিকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মনে পড়ল ২৩ মার্চ আগত প্রায়। মারগালা হিলস পর্যবেক্ষণ করতে করতে পৌছলাম আলতাফ গওহরের বাসায়।

আলতাফ গওহর কাবুলি পাজামা আর শার্ট পরে বেশ রিলাক্সড মুডে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা পৌছতেই এমনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যেন আমরা বহুদিনের পুরনো বন্ধু। বেশ হাসিখুশি মানুষই মনে হলো। বয়স তো তাঁর নিচয় সন্তুর পেরিয়েছে কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। চিংকার করে স্ত্রীকে ডাকলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন। সোফায় বসার আগেই বললেন, ‘আগে এক কাপ চা হয়ে যাক। তারপর কথাবার্তা হবে।’ চা খেতে খেতে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার খানিকটা বর্ণনা করলাম। তিনিও পুরনো দিনের বেশ কিছু গল্প বললেন। স্মৃতি রোমহন করতে করতে তিনি বেশ মুডে চলে এলে মহিউদ্দিন ভাই জিঞ্জেস করলেন, ‘৭১-এর অর্থনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?’

এ বিষয়ে আলতাফ দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। আমরাও বাধা দিইনি। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম হলো এই—

‘অর্থনৈতিক ইস্যুগুলি খুবই জটিল। এগুলি যে ’৭১-এর আগে সৃষ্টি তা নয়, একেবারে গোড়া থেকেই এর শুরু। গোড়াতেই পূর্ব পাকিস্তানকে পাটের শুল্ক থেকে বঞ্চিত করা হয়, অথচ আগে এই শুল্ক এ প্রদেশই পেত। আমার মনে আছে, পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে নুরুল আমিন বলেছিলেন, আমাদের আপনারা কেন্দ্রের কাছে ভিথুরি করে তুলেছেন। আমি যা বলতে চাচ্ছি এভাবেই কেন্দ্র প্রদেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতা আঞ্চলিক করে ফলে অর্থনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

অন্য আরেকটা বিষয় ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির কেন্দ্র থেকে টাকা পেতে খুব একটা ঝামেলা পোহাতে হতো না। কিন্তু ঢাকার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। ১৯৫৮ সালে আমি পূর্ব পাকিস্তানের আমদানি-রফতানির নিয়ন্ত্রক ছিলাম। তখন অনুধাবন করেছিলাম, অর্থ বিলি-বটনের পুরো ব্যবস্থাটাই অন্যায়। এ ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যেত পূর্ব পাকিস্তানের বাজেট বরাদ্দ তামাদি হয়ে গেছে। এভাবেই গোলযোগের সূত্রপাত হতে থাকে। আমার মনে হয়, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সময়কার বাঙালী রাজনৈতিক নেতারা অনেক বেশি জাতীয়তাবাদী ও পাকিস্তান ধারণার প্রতি মমত্ব ছিল।

অর্থনৈতিক ইস্যুর দু'টি দিক ছিল। এক, জাতীয় সম্পদের সুষম বটন হতো না। দুই, সরকারী কর্মকর্তাদের বেলায় বাঙালীদের স্থান ছিল নগণ্য।

‘গোড়া থেকেই তো আপনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘সেখানকার সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হয়েছিল?’

‘আমি ছিলাম তখন ঠাকুরগাঁওয়ের এসডিও।’ বললেন আলতাফ গওহর, ‘১৯৫২ সালে। একদিন ছেলেরা এসে বলল এই ঘটনা (ভাষা আন্দোলন) ঘটেছে। তখনতো ট্রানজিস্টর, বিদ্যুত, টেলিফোন কিছুই ছিল না। ছেলেরা বলল, দিনাজপুর থেকে তারা খবর পেয়েছে। রাস্তায় মিছিল নেমে গেল। দু'দিন পর কর্তাদের টেলিথাম পেলাম, রাস্তায় মিছিল করতে দেয়া যাবে না। যেটা বলতে চাচ্ছ তা’ হলো যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে বাস্তবতার কোন মিল নেই। জিন্নাহর কথাই বলি। তিনি কেন বললেন, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে? তিনি নিজেও তো উর্দু জানতেন না। বক্তৃতাটা তৈরি করা হয় সেক্রেটারিয়েট থেকে। আর এসব করেছিলেন সেসব বাঙালী মুসলমান যাঁরা প্রভাব, পদ ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যেমন নাজিমুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন। এঁরা বাংলা লিখতে পড়তে জানতেন না কিন্তু ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ পদে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা ছিলেন সাবেক উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী, অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা ছিল না উর্দু, বরং যদি বলা হতো, ইংরেজী হবে অভিন্ন ভাষা তাতে কারও আপত্তি থাকত না।। মূল কথা, অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে অযথা যুক্ত হলো সাংস্কৃতিক সমস্যা। ’৫৪-এর নির্বাচনে নুরুল আমিন হারলেন কেন? কারণ তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ফরিদপুরের একটি ঘটনায় আমাকে এ সময় সরিয়ে দেয়া হয়েছিল?’

‘ফরিদপুরেও আপনি ছিলেন নাকি?’ জিজ্ঞেস করি আমি। ‘কি হিসাবে ছিলেন এবং কেন আপনাকে সরিয়ে দেয়া হলো?’

‘আমি ছিলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব। আমাকে সরিয়ে দেয়ার কারণ শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ সময় স্বরাষ্ট্র সচিব [পার্লামেন্টের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির হবে বোধ হয়] ছিলেন লাল মিয়া। তিনি আমাকে বললেন, শেখ মুজিবুর নামে এক ছেলে

নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে আপত্তিকর সব বক্তৃতা দিচ্ছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য আমাকে পাঠানো হলো। আমি গেলাম শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ করতে। তিনি তখন তরঙ্গ ও আবেগপ্রবণ। বললেন, ‘তোমরা পাঞ্জাবীরা জোচ্চোর, প্রভু ইত্যাদি। আমাকে প্রেফতার করতে এসে থাকলে প্রেফতার কর।’ আমি বললাম, আমি এ্যারেষ্ট করতে আসিনি, আলাপ করতে এসেছি। তারপর চা খেতে খেতে আলাপ শুরু হলো। বললাম, আপনি আপত্তিকর সব ভাষ্য বক্তৃতা দিচ্ছেন। এগুলিতো নির্বাচনের সঙ্গেও যুক্ত নয়। তিনি বললেন, কোন্ বিষয়ে আপনার আপত্তি সেটা বলেন। বললাম-যেমন, আপনি বলেছেন, নুরুল আমিনের পিঠের চামড়া দিয়ে জুতা বানাবেন। কেন এটা বলতে গেলেন? তিনি বললেন, আরে না না, এটার কারণ অন্য। তাঁর চামড়া খুবই সুন্দর, সুতরাং সে চামড়ায় জুতাটাও হবে সুন্দর। সে মুহূর্ত থেকে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানালাম যে, মুজিবকে আমি প্রেফতার করছি না।’

‘সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?’

‘তিনি আমাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। যা হোক, যুক্তফ্রন্ট সরকার আসার পর অধিকাংশ সিনিয়র পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তারা চলে গেলেন। একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হলো যেন। মুখ্য মন্ত্রী ফজলুল হক আমাকে ডেকে বললেন তাঁর একান্ত সচিব হতে হবে। আমিতো আকাশ থেকে পড়লাম! আমি তখন উপলক্ষ্মি করলাম, বাঙ্গালীরা আসলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপস্থিতি বা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী নয়। তাদের আপত্তি মূলনীতি বা নীতিগত বিষয়ে যা তখনও স্পষ্ট করে তোলা হয়নি।’

‘১৯৫৪ সালের পর কি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে কোন পরিবর্তন হয়েছিল?’  
জিজ্ঞেস করি আমি।

‘পরিবর্তন আসছিল,’ বললেন আলতাফ গওহর, ‘তার কয়েক বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে আইয়ুব খান এলেন ক্ষমতায়। বাস্তবতা তিনি মেনে নিতে চাহিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও ছিল, কিন্তু বাঙ্গালীদের দাবির মৌকাকা বা দাবিগুলি যে ন্যায়সম্মত তা তাঁর উপলক্ষ্মিতে ছিল না। একবার আইয়ুব খানকে বলেছিলাম, বাঙ্গালীদের আপনি সেনাবাহিনীতে নিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তো বিচিশরা আইন-কানুন বেঁধে দিয়ে গেছে। বললাম, গোর্খাদের ব্যাপারে কেন একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়নি অর্থাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার যে, পরিকল্পিতভাবেই ব্যাপারটি করা হয়েছে যে কারণে সিভিল সার্ভিসে উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী আমলা ছিল না। আইয়ুব খানকে আরেকবার বলেছিলাম, সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যদি বাঙ্গালী আমলা না থাকে তাহলে মোনেম খান, সবুর খান ঠিক বলছেন কিনা কিভাবে বুঝবেন? এ কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি যে, বাঙ্গালী কর্মকর্তারা যে সত্য কথা বলার সাহস দেখিয়েছিলেন তার প্রশংসা প্রাপ্য আইয়ুব খানের কিছু পূর্ব পাকিস্তানের বন্ধুর। হাফিজুর রহমান, বিচারপতি ইবরাহিম বাঙ্গালির শক্তি আরও গতিময়, বেগবান

করেছিলেন। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে অত্যন্ত দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবোধে উদ্বৃদ্ধ -একথা বলতেই হয়। ঐ ন্যায়পরায়ণ ও স্পষ্টবাদী ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীনদের বলতে পেরেছিলেন এসব দাবি ন্যায়, এগুলো মানতে হবে।'

'তার মানে, আইয়ুব খান আমলাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন?' জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'তা আর বলতে! তবে গোটা আমলাত্ত্বে আমিই ছিলাম একমাত্র যার বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল।' পরিত্থিত হাসি হেসে বললেন আলতাফ গওহর।

'আপনিও তো প্রভাবশালীদের মধ্যে ছিলেন।'

'আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় একটা সময় সৈনিকদের প্রভাব ছিল বেশি। ১৯৬৩ সালের দিকে ক্ষমতার এই বৃত্তে আমি প্রবেশ করি।'

'তখন সাংস্কৃতিক কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল যা বাঙালী জাতীয়তাবাদের উত্থানে ভূমিকা পালন করেছিল। আপনার কি মনে হয়?' জিজেস করি আমি।

'দেখুন,' বললেন গওহর, 'সাংস্কৃতিক ব্যবধানের যে কথাটা আমরা বলি তা আমার মতে সঠিক নয়, রবীন্দ্র সঙ্গীত বা আরবী হরফে লেখা এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে, তাঁরা বলেছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারিত হতে দেবেন না। শাসকদের এঁরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের। পূর্ব পাকিস্তানের লোকজনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খাতির বেশি, তাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক তেমন নেই।'

'এ সময়ইতো আগরতলা মামলা শুরু হয়।' মন্তব্য করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'এটা হাল্কা ধরনের ব্যাপার,' বললেন আলতাফ গওহর। 'আইয়ুব খান এই মামলা চান নি কিন্তু তখন ইয়াহিয়া খান ধীরে ধীরে ক্ষমতা কজা করে ফেলেছেন এবং তাঁর হৃকুমেই সব চলেছে। ইয়াহিয়া বলেছিলেন-এ বিষয়ে তিনি ব্যাপক প্রচার চান। বললাম, ঠিক আছে। আমাকে কিছু কাগজপত্র দেয়া হলো। সযুদ্ধ আহমেদ তখন যুগ্ম সচিব। বললাম, ভাই, এগুলি পড়ে দেখ তো ব্যাপারটা কি? সযুদ্ধ পড়ে বললেন, এখানে প্রায় বলা হচ্ছে, শেখ এটা করেছে, শেখ সেটা করেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এভাবে আলাপ করে না। আমি ফাইলটি তখন আইয়ুব খানের কাছে নিয়ে গেলাম। বললাম, কোথাও শেখ মুজিবুর রহমানের নাম নেই, আছে শুধু শেখ। তা'হলে এই শেখ কে? এ আলোচনার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অভিযুক্তদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তা থেকে মুজিবের নাম বাদ যায়। দশ দিন পর দেখলাম, শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যুক্ত হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, আগরতলা মামলার আদৌ দরকার ছিল না, সাক্ষ্য প্রমাণও ছিল না।'

'১৯৭০-এর নির্বাচন সম্পর্কে কিছু বলুন', অনুরোধ করেন মহিউদ্দিন ভাই।

'তখন আমি আর চাকরিতে নেই,' বললেন গওহর। 'থাকি সেনা গোয়েন্দাদের নজরদারিতে। যাক, ঐ সময় আমার বন্ধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ হারংনের সঙ্গে দেখা।

আমি তাঁকে বলেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানে এক শ'ভাগ আসন পাবেন মুজিব আর পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো। তিনি বললেন, কি সব রাবিশ বলছ! আমরা যে খবর পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে মুজিব ৪০ থেকে ৪৫টির বেশি আসন পাবেন না। ভুট্টোও পাবেন না। আমি বললাম, আমি সাতে পাঁচে নেই। তবে লোকজনের সঙ্গে কথা বলি, খবরের কাগজ পড়ি। আমার ধারণা, পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবেন এ দু'জন লোক।'

'তার পর?'

'নির্বাচনের ফলাফলতো জানেনই। তখনই সামরিক মন্ত্রিপরিষদ এ্যাকশন নেয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায় বলে আমার ধারণা এবং এজন্য হাতিয়ার হিসাবে পেয়ে যায় তারা ভুট্টোকে। ভুট্টো নিজেও সহযোগী হন তাদের। আলাপ-আলোচনা এগুলি ছিল প্রহসনমাত্র। ভুট্টো ঢাকা যাওয়ার আগে তাঁর ডান হাত হামিদ রামেকে পাঠান আমার কাছে। মুজিবের সঙ্গে কিভাবে আলোচনা করবেন তার খৌজ-খবর নিতে। আমি বললাম, ভুট্টোকে বলবেন, আমি যদি তাঁর জায়গায় থাকতাম তা হলে শেখ মুজিবকে গিয়ে বলতাম, ছয় দফা? কোন আপত্তি নেই। তবে, একটু সময় লাগবে। মুজিব একজন আবেগপ্রবণ লোক। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু ভুট্টো কি করবেন, তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন।'

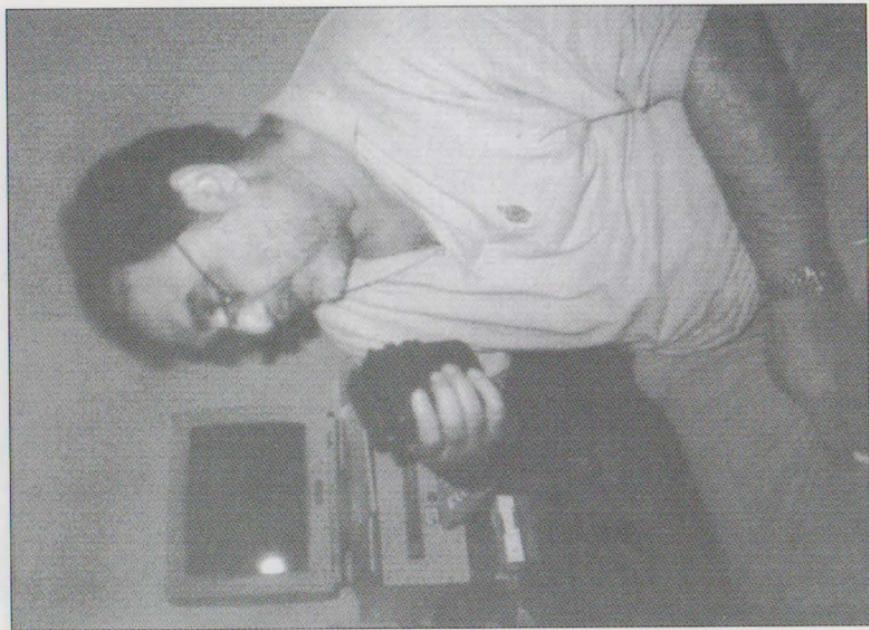
'ভুট্টো কি শেখ মুজিবের সঙ্গে দরকষাকৰ্ষি করতে চেয়েছিলেন?' জিজেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমার মনে হয় না, ভুট্টো যা চান নি, তা হলো ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিব কোন সমরোতায় পৌছান। তিনি চেয়েছিলেন সামরিক এ্যাকশন এবং পরিকল্পিতভাবেই তা করা হয়েছে।'

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে কি ঘটেছিল আপনি জানেন?' জিজেস করি আমি।

'এ বিষয়ে জ্ঞান খুব সীমিত,' বললেন গওহর, 'আমি যা শুনেছি তা সেনাবাহিনী বা অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি। ২৫ মার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তির সঙ্গে আমার কথা হয় তিনি হলেন গাউস বথস বেজেঞ্জো, বালুচ নেতা। আগের রাতে তিনি ফিরেছেন। আমাকে বলেছিলেন, ২৪ মার্চ ১১টার দিকে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর সামরিক সচিব আমাকে যত তাড়াতাড়ি সংব ঢাকা ছাড়তে বললেন।

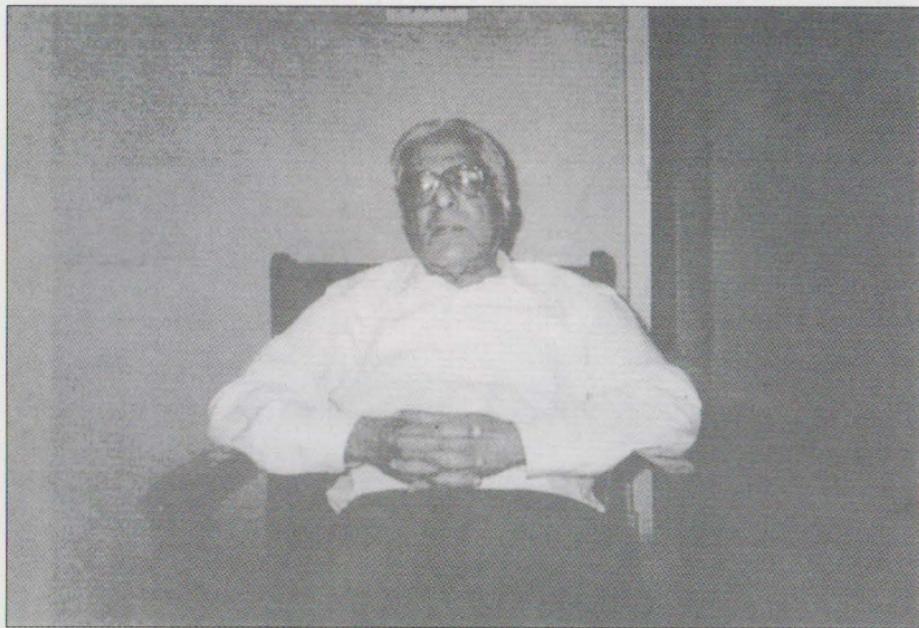
ইয়াহিয়াকে দেখলাম গায়ের শার্ট খোলা, বেশ আয়েসী মুডে বসে। পাশে হইফির বোতল। ইয়াহিয়া আমার নাম জানতে চাইলেন, বললেন, 'আপনার আসল নাম যেন কি? ব্যাঙ্গো? কোন্টা তাহলে ব্যাঙ্গো নয়?' মনে হচ্ছিল সবখানে যেন তামাশা চলছে, আলাপআলোচনাটা প্রহসন। বেজেঞ্জো ২৫ মার্চ সকালে বোধ হয় কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, আজ রাতে কি ঘটতে যাচ্ছে জানি না।'



পাকিস্তানের আইনবিদ  
ফার্জিল আহমেদ



আলমদার রাজা



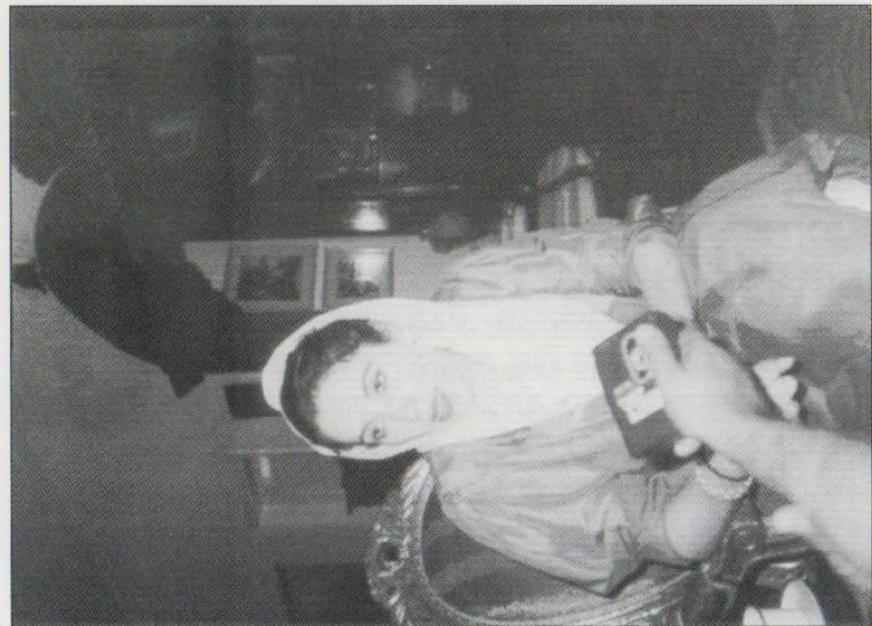
ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এ আর সিন্দিকী



ইউসুফ মাস্টে খান ও ওসমান বালুচ



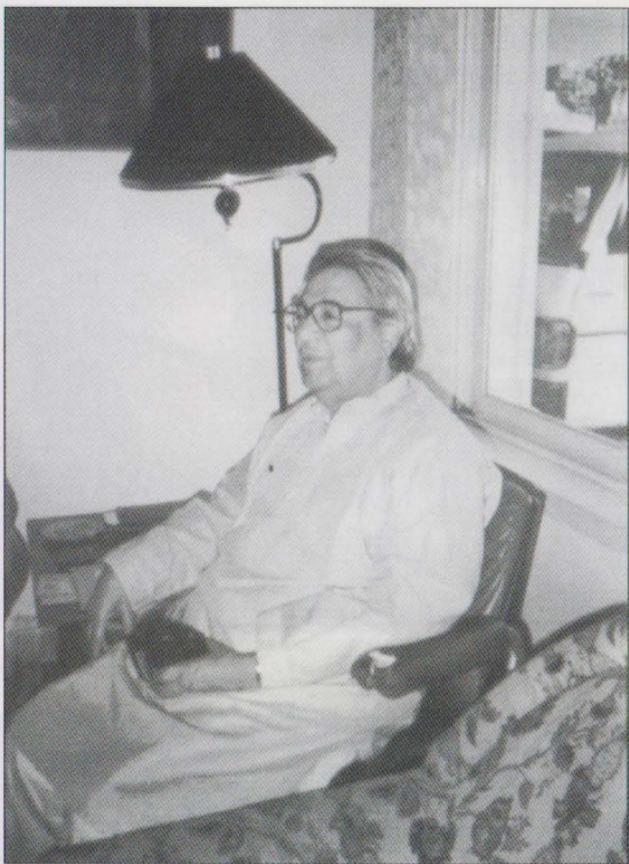
ডেন. জেনারেল (অব: ) সাহেবজাদা ইয়াকুব খান



পাকিস্তানের প্রাঙ্গন মন্ত্রী ও বর্তমানে বিশেষ দালের নেতৃত্বে বেনজীর ভুট্টো

১৪০

সেই সব পাকিস্তানী



আলতাফ গওহর

আলতাফ গওহর একটু থামলেন। এ সময় বেয়ারা আরেক প্রস্তু কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। কফির ট্রে রেখে সে চলে গেলে আলতাফ গওহর আবার শুরু করলেন, 'ভাবতে পারিনি এ ঘটনাই ইতিহাসের পাতায় সত্য হতে চলেছে। আমার এরকম মনে হবার কারণ, '৬৯-এর গণবিক্ষেপের সময় সাবেক আইজি ও তখনকার কৃষিমন্ত্রী শামসুদ্দোহা বলছিলেন, এসব বিক্ষেপ ঠাণ্ডা করার জন্য ঢাকা ও করাচীতে ট্যাঙ্ক নামিয়ে দিন। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আইয়ুব খান বলেছিলেন, আপনি কখনও ট্যাঙ্ক দেখেছেন? আর একটা শহরের হাজার হাজার লোকের মধ্যে একটা ট্যাঙ্ক হলো খোলামকুচি। আইয়ুব খানের সঙ্গে যখন আমার শেষ দেখা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, ওরা কানাগলির গোলকধার্ধায় ঢুকেছে, এখন আর তাদের পরিত্রাণের কোন আশা নেই। যা হোক, এ্যাকশনের পর তো পশ্চিম পাকিস্তানীরা ফিরে আসা শুরু করল। তখন অনেকেই আমাকে বলত, আপনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে তো কোন সারবস্তু নেই। বাঙালীরা তো এখন নিকেশ হয়ে যাবে। এ ধরনের কথা বেশি বলত জেনারেল উমর। আরও পরে তারা বলছিল, এগুলো ভারতীয়দের কারসাজি। আসলে তারা নরহত্যা শুরু করেছিল। আসগর খান ঐ সময় ঢাকা গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আমাকে জানান, সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের গোটা পরিকল্পনা তাঁকে দেখিয়েছে। এটি হলো এক ব্যাপক ধর্মসংজ্ঞের নীলনঞ্চা। আমার এক আঞ্চলিক বিমান বাহিনীতে ছিলেন, নাম মাসুদ জাফর। তিনি ঐ সময় নৈতিক কারণে এ্যাকশনে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি এখন জার্মানিতে আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা হলে অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

'জেনারেল উমরের সঙ্গে করাচীতে আমাদের কথা হয়েছে।' তিনি বলেছেন, 'তিনি কিছুই জানেন না।' বললাম আমি।

'কি বললেন?' আলতাফ গওহর বিস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'বলেন কি! তিনি আর রোয়েদাদ খান প্রায়ই ঢাকা যেতেন। ঢাকা থেকে ফিরে এলে আড়ডা বসত এবং সেখানে তাঁরা কি কি বীরত্বব্যঞ্জক কাজ করেছেন তার উল্লেখ করতেন। আপনারা রোয়েদাদ খানের সঙ্গে দেখা করবেন না?'

'করব, কালই তাঁর সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট,' জানালেন মহিউদ্দিন ভাই।

'তাঁকে আমার কথা বলে জিজ্ঞেস করবেন, আমি যা বলেছি তা সত্যি কিনা! তবে, উমর শুনেছি এখন মনোবিকারহস্ত অবস্থায় রয়েছে, বেশ দরবেশসুলভ আচার-আচরণ করে। ঐ লোকটা সব সময় ছিল স্বেফ ঢাকা বানানোর তালে। প্রশ্ন হতে পারে ঐ সময় কোন সাংবাদিকও তো কিছু লেখেননি বা তার আগেও। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন এ ক্ষেত্রে লাহোরের আবদুল্লাহ মালিক। এক সভায় তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেছিলেন। ফলে তাঁকে মারধরণ করা হয়।'

'আই এ রহমান?'

‘আইএ রহমানের কথা বলছেন,’ বললেন গওহর, ‘হ্যাঁ, তিনিও ব্যতিক্রম। তবে, আইএ রহমান, মায়হার আলীর মতো প্রগতিবাদীরা কেউ এ বিষয়ে লেখেননি। তাঁরা ঝুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসেছিলেন। গোটা বুদ্ধিজীবী মহলে এ নিয়ে কেউ কোন কথা বলেননি। রাজনীতিবিদরাও কেউ কিছু বলেননি। যা-ই হোক, আপনারাতো অনেকের সঙ্গে দেখা করেছেন? খুব বেশি কি জানতে পেরেছেন?’

‘না, একেবারে যে জানিনি তা নয়,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই। ‘আমরা কাউকে প্রথমে সুনিদিষ্ট প্রশ্ন করিনি। তবে, সবাই দেখি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত। আর জেনারেল উমরের মতো লোক, যিনি ছিলেন ইয়াহিয়ার ডান হাত, যিনি ঐ সময় বারবার ঢাকা গেছেন, তিনিও যখন বলেন কিছু জানেন না তখন তো কিছু কিছু ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।’

‘দেখুন,’ বললেন গওহর, ‘আমি জানি, আপনারাও জানেন, আমি যা-ই বলি না কেন, আপনারা তা ফেস ভ্যালুতে নেবেন না। তবে, সত্য ও মানবতাকে খুঁজতে তো আপত্তি নেই।’

‘রাও ফরমান আলী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? তিনিও কিছু জানেন না,’ বলে আমি হেসে ফেলি।

‘নিয়াজী ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক, সব তিনি জানতেন। নিয়াজী বকলম, ধোয়া তুলসী পাতা- এসব কথা ইয়ার্কি ছাড়া কিছু নয়। ফরমানও ছিল কী পার্সন, এখন নাকি দরবেশী ভাব নিয়েছেন। দার্শনিক কথাবার্তা বলেন।’

‘ফরমান বলছেন, ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কেও কিছু জানতেন না।’

‘তবে, শুনুন একটি ঘটনা, ঐ সময় খবর পেলাম, আমাদের এক বাঙালী বন্ধুকে নাকি হত্যার তালিকায় রাখা হয়েছে। তাঁকে বাঁচাতে হবে। আমি একজনকে চিনতাম যিনি আবার ফরমানকে চিনতেন। তাঁকে অনুরোধ করলাম কিছু একটা করতে। তিনি ঢাকায় ফরমানের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধটি জানালেন। ফরমান তখন ড্রয়ার থেকে একটি তালিকা বের করে তাঁর নামটি কেটে দেয়। ঐ বাঙালী ছিলেন সানাউল হক। শুনুন, ওরা সব একই ঝাঁকের কই। প্রত্যেকে ফিরে এসে ভাল ভাল চাকরি পেয়েছে।’

‘আপনি বলছিলেন, সত্য খোঁজার কথা,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘তা’হলে এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি ট্রুথ কমিশন হলে কেমন হয়, যেমনটি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়।’

‘মন্দ নয়। ভালই হয়। তা’হলে হয়ত সবার ক্ষতই খানিকটা উপশম হবে। তবে, আমি বলি কি, আপনারা যা বের করেছেন, আমি মনে করি না আর কোন কমিশন তার চেয়ে বেশি তথ্য পাবে।’

॥ ২৬ ॥

আলতাফ গওহরের বাসায় গল্লে গল্লে অনেক বেলা হয়ে গেল। গওহর হাসি-খুশি, আমুদে, সামাজিক লোক। দীর্ঘ চাকরি জীবনে অনেকের সংস্পর্শে এসেছেন। সুতরাং তাঁর গল্লের ঝুড়ি ফুরাবার নয়। আমরা গল্লচলেও অনেক তথ্য জেনেছিলাম।

গেষ্ট হাউসে ফিরে আর বেরুতে ইচ্ছা করছিল না। খেয়েদেয়ে আমরা দু'জন ক্যাসেট ও কাগজপত্র গুছালাম। একটা হিসাব নিয়ে দেখলাম, দু'সপ্তাহে তিনটি শহরে আমরা যত লোকের সাক্ষাতকার নিয়েছি, স্বাভাবিক হলে তা প্রায় মাসখানেক লাগার কথা। অক্সফোর্ডের কল্যাণে আমাদের প্রচুর সময় সাশ্রয় হয়েছে। এ থেকে গবেষণা সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতা হলো। অগ্রিম পরিকল্পনা করে তা মেনে চলে যদি কাজ করা যায় তাহলে সময়ের সাশ্রয় হয়। আগে বুঝিনি, এখন বুঝি সময় কর্তৃ মূল্যবান!

বিকালে একা একা হাঁটতে বেরুলাম। আমরা যে সেষ্টেরটিতে আছি ইসলামাবাদে তা অভিজ্ঞাত সেষ্টের হিসাবে পরিচিত। সমস্ত আলিশান বাড়ি। প্রতি বাড়িতে শান্তী মোতায়েন। আবার প্রতি বাড়ির সামনের লন্টুকু ফুলে ভরা। কোলাহল নেই। নির্জন, নিস্তর। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় শ্রমিকদের দু'তিনজন ঝুপড়ি বেঁধে থাকছে। এক জায়গায় দেখি, গুহার মতো একটা জায়গা, ওপরে করোগেট জাতীয় কিছু দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছে। দু'তিনজন থাকে সেখানে। যেন তারা দাস শ্রমিক!

সন্ধ্যায় মহিউদ্দিন ভাইয়ের সম্মানে তাঁর স্কুলের বন্ধুরা গেষ্ট হাউসেই এক পার্টির আয়োজন করেছিল। সারগোদার সব বন্ধু-বন্ধব। এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা। তাঁদের দু'জন শিক্ষকও এসেছিলেন। সারাক্ষণ তাঁরা পরম্পরের খেঁজ-খবর নিলেন। পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক মনে হলো তাঁদের কাছে বাহুল্য। মূল বিষয় সারগোদায় কি অনুক পড়েছিল? তাহলে সে যে অঞ্চলেরই লোক কিছু আসে যায় না। আমি অবাক হয়ে শুনলাম তাঁরা বিষণ্নভাবে কিছুক্ষণ মতিউর রহমান বীরোত্তমকে নিয়ে আলোচনা করলেন যিনি তাঁদের সহপাঠী ছিলেন। মতিউর যে বাংলাদেশের হয়ে লড়াই করতে যাওয়ার পথে মারা গেছেন এটি তাঁর পাকিস্তানী (সারগোদার) বন্ধুরা খুব একটা মনে রেখেছেন বলে মনে হলো না।

থাওয়া-দাওয়ার পর আমরা কয়েকজন গাড়ি করে ইসলামাবাদ দেখতে বেরুলাম। প্রধান মন্ত্রীর আলিশান কার্যালয়, সিনেট হাউস- প্রতিটির পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে অকারণে। এখন তো শুনছি, নওয়াজ শরীফ প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ই বিক্রি করে দিতে চান। না, পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ বা ১৯৭১ নিয়ে কোন কথা হয়নি, বরং পাকিস্তান নিয়েই কথা হচ্ছিল। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে তারা খুব একটা সুখী তা মনে হচ্ছিল না। বেশ রাত করেই ফিরলাম, আগামীকাল যাব ইন্সটিউট অব রিজিওনাল স্টাডিজে।

ইনস্টিউট অব রিজিওনাল স্টাডিজে পাকিস্তান ও তার আশপাশের অঞ্চল নিয়েই গবেষণা হয়। এখানে কাজ করেন মহিউদ্দিন ভাইয়ের পুরনো বন্ধু অধ্যাপক খালিদ মাহমুদ। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য রওয়ানা হলাম। গত দু'দিন ফোনে যোগাযোগ করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। আজ ঠিক করেছি সরাসরি তাঁর অফিসে গিয়ে হানা দেব। ইনস্টিউটে এসে জানলাম, খালিদ মাহমুদ তখনও আসেননি। আমরা আর কাউকে এখানে চিনিও না যে অপেক্ষা করব। ফিরে আসছি, এমন সময় দেখা গেল এক প্রৌঢ় হস্তদন্ত হয়ে ঢুকছেন। মহিউদ্দিন ভাইকে দেখে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। তারপর, ‘আরে মহিউদ্দিন তুম!’ দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরলেন। খালিদ মাহমুদ বিশ্বাসই করতে চান না যে, মহিউদ্দিন ভাই গত কয়েকদিন তাঁর খোঁজ করেছেন। তাঁর ঝুঁমে বসিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত করলেন। তারপর সব ভুলে দু’জন পুরনো কথা বলতে লাগলেন।

ইন্টার উইং স্কলারশিপ পেয়ে খালিদ মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিলেন। সে সময় তিনি বামপন্থী রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। খুব সন্তুষ, মওলানা ভাসানীর অনুসারী ছিলেন। তিনি ঢাকায় তাঁর পুরনো বন্ধু-বাঙাবদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বুঝতে পারছিলাম, যেহেতু এক সময় ঢাকায় ছিলেন এবং বামপন্থীদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল, সেহেতু তাঁর বক্তব্য ঢাকার পক্ষেই হবে।

চা পর্ব ও প্রাথমিক উচ্চাস কাটার পর আমরা আমাদের উদ্দেশ্য জানালাম। না, তিনি কোন নীতিনির্ধারক ছিলেন না। আমরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই একজন গবেষক হিসাবে, যিনি দূর থেকে ঘটনাবলী পর্যালোচনা করছেন। আমি বললাম, ‘১৯৭১ সালের ঘটনাবলী আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। আমরা আপনাকে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করছি না। আপনি আপনার মতো করে বলুন।’

‘তাহলে ১৯৭০ সাল থেকেই শুরু করি, কি বলেন’, বলে আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালেন, ‘দেখেন, বাঙালীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, এটাত কোন গোপন কথা ছিল না। কিন্তু শাসক হলো কারা? লিয়াকত আলী খান বা ইসকান্দার মির্জার মতো পাঞ্জাবী মোহাজেররা। লিয়াকতের পর নাজিমুদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতা তো ছিল গোলাম মোহাম্মদ বা গুরমানির মতো লোকদের হাতে যাঁরা এক সময় ছিলেন আমলা। এঁরা গণতান্ত্রিক নীতিভিত্তিক কোন রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল না।’

‘তুমি আরেকটু বিশদভাবে বলো’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘প্রথম কথা’, বললেন মাহমুদ, ‘দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কেমন হবে এ বিষয়ে কিন্তু কোন মতেক্য ছিল না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬, একটি দেশের শাসনতন্ত্র পেতে কি এত সময় লাগে? তাহলে ব্যাপারটা ছিল কি? ব্যাপারটি ছিল ঐতিহ্যবাহী সংসদীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হলে বাঙালীদের হাতেই ক্ষমতা থাকবে। কারণ তারা

হবে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং তারা (অর্থাৎ পাঞ্জাবীরা বা শাসকচক্র) এমন এক ধরনের ব্যবস্থা উত্তোলন করতে চাইছিল যাতে বাঙালীরা শক্তিশালী না হয়ে ওঠে। মহিউদ্দিন তুমি যদি ১৯৫৬-এর আগে এ ব্যাপারে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল দেখ, তাহলে দেখবে পার্লামেন্টে একটি উচ্চকক্ষ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বলা হচ্ছিল তার ক্ষমতাও খানিকটা বেশি থাকবে। তবে সে উদ্যোগ সফল হয়নি। তখন আপোস ফর্মুলা হিসাবে ১৯৫৬ সালে ‘ওয়ান ইউনিট’ প্রস্তাব সংযোজন করা হয়। এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঠেকানোর জন্য। কারণ এর ফলে সংসদে দুই প্রদেশের সমপ্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হওয়ায় বাঙালীরা আনুপাতিক প্রতিনিধি নির্বাচনে যা পেত তা থেকে বঞ্চিত হলো।’

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে এ্যাশট্রেতে তা পিষতে পিষতে মাহমুদ বললেন, ‘আরেকটা দিক ছিল। সেনাবাহিনী বা অন্য কথায় বলি, সামরিক-বেসামরিক আমলাত্ত্বের তুলনায় শাসনতন্ত্র ছিল দুর্বল। কায়েদ-ই-আজমও তো ভুল করে বললেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা। পাঞ্জাবীদের ভাষা তো উর্দু নয় এবং তারা যে উর্দুকে ভালবাসত তাও নয়। এ ছিল বাঙালীদের বেকায়দায় ফেলার চেষ্টামাত্র।’

‘আর প্রতিবাদ করলেই তা হয়ে যেত পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রচেষ্টা’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘হ্যাঁ, তখন তো ঘন ঘন পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার শ্লোগান তোলা হতো।’ বললেন মাহমুদ, ‘তবে মোদ্দাকথাটা অন্য; ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। পাকিস্তান ছিল বহুজাতি অধ্যুষিত এলাকা। শাসকবর্গ এই বাস্তবতা মানতে রাজি হয়নি। তারা চেয়েছে শক্তিশালী কেন্দ্র। তারপর দেখা গেল, পাকিস্তানের সব অঞ্চল উন্নত নয় এবং যে অঞ্চল অনুন্নত তাকে যদি উন্নত করার কোন প্রচেষ্টা না নেয়া হয় তাহলে সে অঞ্চলের লোকের মাঝে বঞ্চনার বোধ জাগাই তো স্বাভাবিক। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। বাঙালীদের মধ্যে এই ভাব জাগছিল যে, পাকিস্তানে তাদের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব নেই। তাদের প্রাপ্য আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।’

‘তা বুঝলাম প্রফেসর মাহমুদ’, বললাম আমি, ‘আসল অবস্থাটা আসলে তাহলে কি ছিল?’

‘ব্যাপারটা এভাবে দেখুন’, বললেন খালিদ মাহমুদ, ‘যখনই বাঙালীরা প্রাপ্য হিসাবে কিছু চেয়েছে তখনই তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের কথা ধরুন। যুক্তফুন্ট এল ক্ষমতায়। কেন্দ্র চেষ্টা করল তা ক্ষমতাচ্যুত করার। পাঠান হলো ইসকান্দার মীর্জাকে গবর্নর হিসাবে। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সাহায্যে যুক্তফুন্ট ভেঙ্গে ফেলা হয়। এরপর ধরুন ১৯৭০। কি হলো? শেখ মুজিব জিতলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর হলো

না। এভাবে বঞ্চনা বোধ রূপান্তরিত হলো বিচ্ছিন্নতাবোধে। আগেই বলেছি, পাকিস্তান বহুজাতি অধ্যুষিত একটি দেশ। সেখানে ফেডারেল সরকার ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকরা তা মেনে নিতে অঙ্গীকার করে।’

‘এ অঙ্গীকারের ফলই কি ১৯৭১?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘এ বিষয়গুলো’, বললেন মাহমুদ, ‘বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে, অথচ কি দরকার ছিল জানেন? এক. ফেডারেল সরকারের আওতায় সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বাসন; দুই. দেশের সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকার; তিনি. বাঙালীদের উন্নয়নের সুফলের অংশীদার করা— এটাই ছিল মূল পরিস্থিতি।’

‘৬ দফা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমাদের এখানে অনেকের মতে ৬ দফা ছিল বাড়াবাড়ি। কিন্তু রফা একটা হতোই যদি শাসকরা বাড়াবাড়ি না করত। সুতরাং পরবর্তীকালে যে পরিস্থিতি হয় তার জন্য তাদেরই দায়ী করা উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠন করতে দিলে একটা আপোসরফা হতো।’

‘ভুট্টো এজন্য কতখানি দায়ী?’, জানতে চাইলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘ভুট্টো জানতেন’, বললেন মাহমুদ, ‘যদি মুজিব ক্ষমতায় না আসেন তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে তিনিও ক্ষমতায় আসবেন না। আমি এও বলব যে, মুজিবও একটু নমনীয় হলে সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। কিন্তু মুশকিল হলো, মুজিব জিতেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে আর ভুট্টো জিতেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। এতো কিছু বলার পরও আমি বলব, এগুলো বড় কারণ নয়। আসল কারণ হলো, ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দিতে চায়নি। অনেকে বলেন, ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ পরিস্থিতির অবনতির জন্য দায়ী এবং যে সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছিল তারা ভারতের মদদপুষ্ট। আমি বলব, না। পরিস্থিতি অনুকূল না থাকলে ভারতীয়রা কিছুই করতে পারত না। আর যদি ১৯৭২ সালের সরকার ভারতের তাঁবেদারই হয় তা হলে ভারতীয় বাহিনীকে কেন চলে যেতে হলো? শোনেন, পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে দায়ী করতে হয় তা হলে করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের যাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবী। অন্যদের ভূমিকা নামমাত্র।’

‘২৫ মার্চের ঘটনা জানেন,’ জিজ্ঞেস করি আমি, ‘এখানে তার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?’

‘প্রথমেই বলে রাখি,’ বলে মাহমুদ থামলেন। সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। সেটি ধরিয়ে একটু চিন্তা করে বললেন, ‘এখানে বিরাজ করছিল উগ্র দেশপ্রেমের মহড়ার পরিবেশ। তাই অন্য প্রদেশগুলোর প্রতিক্রিয়া আমি বলতে পারব না। হতে পারে, তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অন্য ধরনের। তবে পাঞ্জাবের

বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সমর্থন জানায়। কারণ তাদের বলা হয়েছিল, ভারতীয়রা ওখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ইন্ধন যোগাচ্ছে। তবে বিবেকবান কিছু মানুষ যে আপত্তি জানায়নি তা নয়। তবে নিরেট সত্য আমার মতে, যা খানিকটা নির্দয়ও শোনাবে যে, এখানকার মানুষ জানত না সেখানে কি ঘটছে বা মনে করত বিচ্ছিন্নতা দমনের যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা কার্যকরী। সে কারণেই হয়ত সেনাবাহিনীকে সমর্থন জানায়।'

'আমরা এখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ করছি,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'অনেক তথ্য পাচ্ছি তাঁদের কাছ থেকে, খোলাখুলি কথা বলছেন অনেকে।'

'মহিউদ্দিন', বললেন মাহমুদ, '১৯৭১ সম্পর্কে পাঞ্জাবী বুদ্ধিজীবীদের ধারণা বদলাতে হলে সেনাবাহিনী সম্পর্কে আগে তাদের ধারণা বদলাতে হবে। আগে মনে করা হতো সেনাবাহিনী পাকিস্তানের আণকর্তা, হেফজতকারী, বীর। এখন মানুষ নতুনভাবে সেনাবাহিনীকে বিচার করছে। আগে মনে করা হতো সেনাবাহিনী সাধু, রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিবাজ। সেনাবাহিনীই পারে জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে। তারা যোগ্য ও কার্যক্ষম। এখন সে ধারণা নেই। কিছুদিন আগেও পাঞ্জাবীদের গড় ধারণা ছিল, ১৯৬৫-এর যুদ্ধে পাকিস্তান জিতেছে যদিও জেনারেল আসলাম বেগ বলেছিলেন, ঐ যুদ্ধে সত্যিকার অর্থে আমরা জিততে পারিনি। এই যে উৎকৃত জাতীয়তাবাদী ধারণা তা পুরোপুরি দূর হয়নি। এখন পাঞ্জাবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ সেনাবাহিনীকে আর ত্রাতা হিসাবে দেখতে চায় না। সুতরাং ধারণা বদলাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে যা ঘটেছিল তা আরও বেশি করে আমাদের জানান দরকার আমাদের ধারণার জগতটা বদলাবার জন্য। এখনও অনেকের ধারণা, ভারতীয় চক্রান্তের কারণে দেশটা ভাগ হয়েছে। এসব ধারণা বদলাতে হবে। হয়ত এ ধারণা বদলাবেও যদি ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কে আর মেঘ না থাকে।' বলে হেসে সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে বললেন মাহমুদ, 'আরে মহিউদ্দিন অনেক হলো, এখন বল তোমার খবর। চা চলবে আরেক কাপ?'

॥ ২৭ ॥

অঞ্জফোর্ড, ইসলামাবাদের অফিসার্স ক্লাবে আমাদের সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করেছে। পাকিস্তানের আমলাতত্ত্ব যে কত শক্তিশালী তা বোঝা যায় এ ক্লাবে এলে। যে সারিতে সরকারের দামী ভবনগুলো অবস্থিত সে সারিতেই এ ক্লাব, বিশাল জমির ওপর দাঁড়িয়ে। শ্বেত পাথরের ছড়াছড়ি। এক সচিব আমাকে জানালেন,

ক্লাবের শাসনতন্ত্র অনুসারে দেশের প্রেসিডেন্ট এটির পৃষ্ঠপোষক। সরকারী কর্মচারী হলেই যে কেউ ক্লাবের সদস্য হতে পারে, তা নয়। বেশ ‘অভিজাত’ ক্লাব হিসাবে তা পরিচিত।

আমাদের পৌছতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। অতিথিরা এসে গেছেন। এক সময় এলেন ড. মাহবুবুল হক, যিনি এখন প্রয়াত, বললেন, ঢাকা যাবেন পরের সঙ্গে তাঁর রিপোর্ট প্রকাশ করতে। আলাপ হলো ঐতিহাসিক জায়েদীর সঙ্গে। বেশ বয়স হয়ে গেছে তাঁর, কিন্তু এখনও ঝজু। জিন্নাহ পেপার্স নিয়ে কাজ করছেন। সরকারী প্রজেক্ট। পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই করেছে সরকার। পাকিস্তানের মতো দেশেও সরকার এ ধরনের প্রচেষ্টায় সহায়তা করে। আমাদের এখানে তো এসব ব্যবস্থা নেই-ই এবং করতে গেলে যে তোয়াজ করতে হয় তার চেয়ে না করাই ভাল।

না, পার্টির বর্ণনা আমি দেব না। শুধু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। দু'মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো, ধরা যাক তাঁদের নাম মীনা ও রীনা। মধ্যবয়সী হলেও বোঝা যায় যৌবনে তাঁরা কতটা আকর্ষণীয় ছিলেন। দু'জনেই বিদূষী। মীনা একটি একাডেমিক ইনসিটিউশনে গবেষক। রীনা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কনসালট্যান্ট। দু'জনই মনে হলো ঘনিষ্ঠ। আলাপ হওয়ার পর আমি জানালাম, ১৯৭১ সাল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। মীনা একটু বিষণ্ণ গলায় বললেন, ‘আসলে ১৯৭১-এ কি ঘটেছিল আপনাদের ওখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না। তবে মাঝে মাঝে দেখেছি সৈনিক পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের কফিন আসছে। তখন অনুমান করতাম কিছু একটা ঘটছে।’ আমি কিছু বললাম না। রীনাও কিছু বললেন না।

ভোজ শেষে বিদায় নেয়ার পালা। রীনা আমাকে আন্তে আন্তে বললেন ক্ষুঁক্স স্বরে, ‘১৯৭১ সাল সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন না! যদি জিজ্ঞেস করেন করাচীতে কি হয়েছে এবং কি হচ্ছে, তাঁরা বলবেন, কিছুই জানেন না। কিন্তু আপনি তো জানেন করাচীতে কি হচ্ছে! কোন সময়ই তাঁরা কিছু জানেন না।’

‘আপনি কোন অঞ্চলের?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘আমরা মোহাজের। আমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন করাচীতে থাকেন।’

ঘরে ফিরে দেখি, আহমদ সেলিম অপেক্ষা করছেন। বিশ্বিত হই, খুশিও হয়ে উঠি। আহমদ সেলিম কবি, ন্যাপের কর্মী। ১৯৭১ সালে যে ক'জন পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁদের একজন। এ কারণে তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। এখন তিনি একটি এনজিওতে চাকরি করেন। কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছেন। গত বছর ঢাকায় এসে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার বই উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। করাচীতে নেমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি, লাহোর-ইসলামাবাদেও খোঁজ করেছি। পাইনি।

ইসলামাবাদে তাঁর অফিসে খবর দিয়ে রেখেছিলাম। খবর পেয়ে এসেছেন। বললাম, ‘যে কাজটি গত কয়েক বছর করতে চেয়েছি এবার তার সুযোগ এসেছে।’

সেলিম জানালেন, প্রয়োজনে সাহায্য করবেন। তারপর একটু ক্ষুঁক স্বরে বললেন, ‘চাকায় এবার আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছেন, বাংলাদেশে কেন বার বার আসি?’ অর্থাৎ তাঁকে পাকিস্তানী এজেন্ট হিসাবে ভাবা হচ্ছে। বললাম, ‘দেখুন, দু’দেশেই এ রকম কেউ না কেউ থাকেন। তাতে আপসেট হলে আমাদের চলবে কেন?’

আহমদ সেলিম বাংলাদেশের ওপর বই লিখেছেন। তবুও আমি বললাম, ‘শোনেন, দেখা যখন হলো আপনার একটি সাক্ষাতকার নিই। কারণ এমন অনেক কথা থাকতে পারে যা বইয়ে আসেনি।’

‘কোন আপত্তি নেই’, জানালেন সেলিম।

‘১৯৭১ সালে আপনি ন্যাপের সক্রিয় কর্মী ছিলেন’, জিজ্ঞেস করলাম আমি, ‘১৯৭০-৭১ সালে আপনাদের এখানে রাজনীতিবিদরা কি ভাবছিলেন তার একটা বিবরণ দিতে পারবেন?’

‘১৯৭০-এর নির্বাচন আপনি জানেন খুব উদ্বৃত্তিপন্থীর সৃষ্টি করেছিল’, বললেন সেলিম, ‘পত্রিকাগুলোতে হেড লাইন এসেছিল- আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ময়দান জিত লিয়া। শাসকচক্র ও ডানপন্থীরা এতে খুশি হয়নি। তারপর দেখা গেল ভুট্টোও দাবি করতে লাগলেন যে, তিনিও ক্ষমতার অংশীদার। আমাদের ধারণা, ভুট্টো মেজাজ-মানসিকতার দিক থেকে ছিলেন ফ্যাসিস্ট প্রকৃতির। মজাটা হলো, ভুট্টো ভাবছিলেন তিনি ইয়াহিয়াকে ব্যবহার করছেন, আর ইয়াহিয়া ভাবছিলেন তিনি ভুট্টোকে ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবের ভূমিকাটি ছিল একক ও অভিন্ন। তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। শেখ মুজিবের কিছু বন্ধু জানিয়েছেন তাঁরা মুজিবকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যাতে তিনি খানিকটা নমনীয় হন, না হলে নেরাজ্য দেখা দেবে।’

‘এন্দের দু’একজনের নাম বলতে পারবেন?’

‘সরদার শওকত হায়াত খান, মিয়া মমতাজ দওলতানা, ওয়ালি খান, মুফতি মাহমুদ প্রমুখ যাঁরা আলোচনার জন্য চাকায় গিয়েছিলেন। শেখ মুজিব ওয়ালি খানকে বলেছিলেন, ওঁরা মুসলিম লীগার, আর পাকিস্তানের জন্য আমিও লড়েছি। তাহলে কিভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, আমাকে অন্য কেউ মদদ দিচ্ছে? ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিব আলোচনার সময় শুরু হয় একাধিক মাদারিয়া খেল। সবাই নিজেকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মনে করে আপন আপন চাল চালতে থাকেন। এ ছাড়াও একটি নেপথ্য কাহিনী আছে। মুজিব চেয়েছিলেন ক্ষমতায় গিয়ে দ্রুত কিছু সংস্কার করবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতার প্রধান উৎস সামন্ত প্রভুরা। তারা শক্তি হয়েছিল এ ভেবে যে,

মুজিব ক্ষমতায় এসে ভূমি সংকার করতে পারেন। তারা একটি যোগাযোগের চেষ্টা করছিল মুজিবের সঙ্গে। তারা বলতে চাহিল, তাঁকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে যদি তিনি ভূমি সংকার না করেন। কিন্তু তারা যোগাযোগ করতে পারেনি।’

‘এ তথ্য আপনাকে কে দিল?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘মাসুদ কাদের হোশ, তিনি ছিলেন সেই সময় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য। সৎ আমলা ছিলেন তিনি।’

‘ঢাকায় কি ঘটেছে তা কি জানত পাকিস্তানীরা?’

‘না। তাদের বলা হচ্ছিল শেখ মুজিব গোলমাল পাকাচ্ছেন।’

‘রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কি ছিল?’

‘দেখুন’, বললেন সেলিম, ‘ডানপাথী দলগুলো ভুট্টোর জন্য সমস্যা ছিল না। সমস্যা ছিল তাঁর দলের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুজিব ক্ষমতায় গেলে পিপিপির ৩০/৮০ সদস্য মুজিবের সঙ্গে হাত মেলাবেন। এ বিষয়ে তখন গোপনে দর কষাকষি ও আলোচনা চলছিল। এই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের দু’টি প্রদেশে আওয়ামী লীগের মিত্র জুটে যায়। তারা ছিল ন্যাপ, মুফতি মাহমুদের জমিয়তুল মুদাসসেরিন। পিপলস পার্টির কিছু এমএলএ ও স্বতন্ত্র কিছু জনপ্রতিনিধি। অনেকে বলেন, দু’প্রদেশে দু’দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এটি ঠিক নয়। কমপক্ষে ৭০/৮০ জন সদস্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি ছিল। এর অর্থ, পাঁচটি প্রদেশেই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব ছিল।’

‘এগুলো তো আমরা জানি না।’ বলি আমি।

‘এগুলো গোপন বিষয়, গোপনেই হচ্ছিল। কাগজে আসেনি।’

‘২৫ মার্চের ঘটনায় আসি’, বলি আমি, ‘কি জানেন আপনি ২৫ মার্চ সম্পর্কে?’

‘আপনাকে তো আমার বইয়ের কপি দিয়েছি’, বললেন সেলিম, ‘সেখানে ‘জেনারেলদের রাজনী’ অধ্যায়ে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।’

‘তবুও বলুন কিছু’, অনুরোধ জানাই আমি।

‘দ্রুত অবনতি ঘটেছিল’, জানালেন সেলিম, ‘তখন ঢাকায় ওয়ালি খান, মুফতি মাহমুদরা ছিলেন। তাঁরা দু’পক্ষকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের এ ধারণা হয়েছিল, পুরোটাই সাজানো নাটক। ওয়ালি খানের কাছে শুনেছি, শেখ মুজিব বলেছিলেন, ওদের পরিকল্পনা অন্য। তারা অন্ত নামাচ্ছে। এখন একমাত্র পথ ক্ষমতা হস্তান্তর। সরদার শওকত, ওয়ালি খান--তাঁদের বইয়ে এসব তথ্য আছে। এগুলো আর এখন গোপন কিছু নয়।’

‘২৫ মার্চ ও তার পরবর্তী সময়কার ঘটনাবলী কি জানতেন রাজনীতিবিদরা?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘তাঁরা জানতেন’, জানালেন সেলিম, ‘এবং তাঁরাই ফিরে এসে জানান পাইকারি হত্যাকাণ্ড চলছে।’

‘আপনার কি হয়েছিল?’

“২৫ মার্চের এক মাস পর আমাকে ঘ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ ছিল আমি বিশ্বাসঘাতক, ভারতীয় এজেন্ট প্রত্তি। পাঞ্জাব থেকে এ অভিযোগে আমিই একমাত্র ঘ্রেফতার হয়েছিলাম। কারণ এর আগে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম যার প্রথম লাইন ছিল- ‘শাহ হসেন, দ্যাখো তোমার মধু খুন হয়েছে বাংলায়।’ সামরিক আদালতে আমার বিচার হয়। শাস্তি হয় জেল-জরিমানা ও ৫টি বেত্রাঘাত। ন্যাপ থেকে সেই সময় আমি একাই ঘ্রেফতার হয়েছিলাম। এরপর আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আয়াজ, সিঙ্গু থেকে মাস্টার খান গুল ও গাজী ফয়েজ এবং আরও অনেককে ঘ্রেফতার করা হয় যাঁরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নভেম্বরের গোড়ার দিকে ন্যাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং দলের সকলকে ঘ্রেফতার করা হয়। পত্র-পত্রিকার ওপর তো সেপ্টেম্বরশিপ ছিলই, তবে সে সময় অনেকেই বাংলাদেশ নিয়ে লিখেছিলেন। আসিফ শাকের নামে একজন নেতা এ ধরনের কবিতা লেখেন পাঞ্জাবীতে। নভেম্বরে তাঁকে ঘ্রেফতার করা হয়।’

‘সেটি কি প্রকাশিত হয়েছিল?’

‘হয়েছিল। আমি আপনাকে এসব বিষয়ে আরও কিছু তথ্য দিচ্ছি।’

জানালেন সেলিম, ‘মুস্তাফা রহিম নামে একজন বাংলাদেশের সমর্থনে পুস্তিকা লিখেছিলেন। তাঁকে ঘ্রেফতার করা হয়। আরেক বিখ্যাত কবি হাবিব জালেব ঘ্রেফতার হন। যদূর মনে পড়ে, ঐ সময় বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন; যেমন, মাযহার আলী খান, তাহেরো মাযহার, আসগর খান প্রমুখ। আসগর খানের ছেলে ছিলেন সেনাবাহিনীতে, তাঁকেও বোধ হয় আটক করা হয়। আরও অনেকে প্রতিবাদ করেছিলেন যাঁদের প্রতিবাদের রেকর্ড হয়ত রক্ষিত হয়নি। আপনি শুনে হয়ত অবাক হবেন বাংলাদেশের সমর্থনে সিন্ধী ভাষায় ২০০টি কবিতা আমি সংগ্রহ করেছি। পশ্চু এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছি ৫০টিরও বেশি। বেলুচিস্তান থেকে সংগ্রহ করেছি ২০টি কবিতা। পাঞ্জাবীতে লেখা কয়েকটি কবিতাও আছে আমার কাছে। এভাবে সব মিলে প্রায় ৫০০ পাতার একটি বই হতে পারে। আমি বাংলাদেশের অনেককে অনুরোধ করেছি এ ধরনের একটি সংগ্রহের অনুবাদ প্রকাশ করার। তাহলে জানতে পারবেন, বহু বন্ধু, রাজনৈতিক কর্মী, দলীয় নেতা, কবি, বুদ্ধিজীবীকে জেলে পাঠানো হয়। অনেকের চাকরি চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে এ বলে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল যে, বাঙালীরা বিশ্বাসঘাতক। ওদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু বাঙালীরা যে কি নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হয়েছিল তা তারা জানত না।’

‘আর কিছু কি লেখা হয়েছিল সে সময়, মনে পড়ে আপনার?’

‘উর্দু আর ইংরেজীতে বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। সিন্ধী ভাষায় বাংলাদেশ আন্দোলনের ওপর একটি উপন্যাস লেখা হয়েছে। বইটির নাম এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। ছেট গল্পও লেখা হয়েছে কিছু। যেমন জাদিন, নাসিম খায়ের প্রমুখ। শেখ আয়াজ বহু কবিতা লিখেছেন। তাঁর জেলের ডায়েরিও আছে। তিনি বলছেন, শেখ মুজিব কোথায় থাকতে পারেন তা কল্পনা করার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক ‘অন্তরঙ্গ’ আখ্যানও রয়েছে। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, বাংলাদেশের পক্ষে বহু লেখা, বই রয়েছে। দু’খণ্ডে উর্দুতে লেখা এক চিত্তাকর্ষক বই আছে। এ বছরের গোড়ার দিকে বেরিয়েছে। এ মুহূর্তে আরেকজন বিখ্যাত বালুচ কবির নাম করতে পারি— শুধু নাসির। বাংলাদেশকে সমর্থন করায় তাঁকে জেলে পাঠান হয়। ন্যাপ নেতা আজমল খাটকও বাংলাদেশের পক্ষে কবিতা লিখেছিলেন। তিনিও জেলে গিয়েছিলেন। সামরিকবাহিনী থেকেও বেশ কয়েকজন পদত্যাগ করেছিলেন।’

আমরা এখানেই সাক্ষাতকারের ইতি টানি। কারণ আহমদ সেলিমের অভিজ্ঞতা তাঁর বইতেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত কয়েক বছরে কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং নতুন কিছু জানার ছিল না। ঘড়ির কাঁটা ১১টা পেরিয়েছে। ইসলামাবাদ নিয়ুম। সেলিমকে বললাম, ‘যাবেন কিভাবে? এখানে তো বাস সার্ভিস দেখলাম না।’

‘আছে’, বললেন সেলিম, ‘আমাদের জন্যও চলাফেরার বন্দোবস্ত আছে। একটু কষ্ট হয় আর কি! ইসলামাবাদে না থাকলে সেটা জানতে পারবেন না।’

॥ ২৮ ॥

দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান বছরখানেক আগে আমাকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন। লেখক সৈয়দ আলমদার রাজা। বইয়ের নাম—‘ঢাকাস ডিবাকল’। ১৯৭১ সালে ঢাকার কমিশনার ছিলেন তিনি। নিয়দিনের অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে সে বইতে। এ বইতে তিনি তুলে ধরেছেন কিভাবে সামরিক জাত্তা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছিল। বাংলাদেশ হওয়ার কুড়ি বছর পর তিনি বইটি লিখেছেন। তাঁর ভাষায়—“The recollection of the great tragedy still stir me and I am not quite sure if I have been able to state the facts as they were without being unduly influenced with my own sufferings and prejudices.”

ইসলামাবাদে বাংলাদেশের হাই কমিশনার কিউএ রহিমের কাছে শুনেছিলাম রাজা ইসলামাবাদেই আছেন। ঠিকানা ও ফোন নম্বরও দিয়েছিলেন। আমি ও মহিউদ্দিন

ভাই কয়েকদিন তাঁকে টেলিফোন করেছিলাম, কিন্তু কেউ ধরে না। তাই একদিন ঠিকানা নিয়ে তাঁর বাড়ি খুঁজে বের করলাম। তিনি ছুটি কাটাতে গেছেন। আমাদের কার্ড রেখে এলাম।

আমি যখন আহমেদ সেলিমের সঙ্গে কথা বলছি তখন রাজা ফোন করেছিলেন মহিউদ্দিন ভাইকে। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। আগামীকাল সকালে তাঁর বাসায় আমাদের নাস্তাৰ দাওয়াত। রাজা ও তাঁর স্ত্রী দু'জনই এখন এ্যাডভোকেট। আইন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত।

আলমদার রাজা আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর বাসায় পৌছামাত্র সাদুর অভ্যর্থনা জানালেন যেন আমরা কত পরিচিত! সুসজ্জিত ড্রাইং রুমে বসালেন। বললেন, আমার স্ত্রীও এ্যাডভোকেট। সকালে কোটে গেছে, তাই আপনাদের খাতির যত্ন করার জন্য থাকতে পারলেন না। আমরা বললাম, ব্যস্ত হবেন না। নাস্তা করার জন্য এসেছি, নাস্তা করে কথাবার্তা শুরু করব। রাজা বললেন, তাহলে চলুন আগে নাস্তা করে নিই।

নাস্তা করতে করতে মহিউদ্দিন ভাই আমাদের প্রকল্পের কথা বিশদভাবে বললেন। চা নিয়ে আমরা ড্রাইংরুমে বসতেই রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা ইসলামাবাদে কার সঙ্গে কথা বললেন?’

‘রাও ফরমান আলীর সঙ্গে দেখা করেছি’, বললাম আমি।

‘কী বললেন?’ বেশ ক্রুদ্ধ হ্বরে বললেন রাজা, ‘ঐ লোকটির সঙ্গে দেখা করেছেন আপনারা? না, আপনাদের সঙ্গে তো আমি কথা বলব না।’

‘আমরা যে উদ্দেশে এসেছি রাও ফরমানের সঙ্গে কথা না বললে তো তা পূরণ হবে না’, বলি আমি।

‘তা ছাড়া আমরা আপনার সঙ্গেও তো দেখা করতে এসেছি’, যোগ করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

মনে হলো একটু শান্ত হলেন রাজা। বললেন, ‘তবুও এসব লোক’, কথা শেষ করলেন না রাজা।

‘আচ্ছা। আলমদার সাহেব, আপনি তো ১৯৭১ সালে ছিলেন ঢাকায়’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘সে সময়কার কিছু অভিজ্ঞতাৰ কথা বলবেন কি?’

‘১৯৭১ সালে ঢাকায়’, বললেন রাজা, ‘বেসামৰিক কৃত্পক্ষের কার্যত কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে বিদ্রোহীৱা তখনও পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেনি, আমি প্রথমদিকেৰ কথা বলছি। ঢাকায় আমাদের অনেকেৰ সঙ্গে বন্ধুত্বেৰ সম্পর্ক ছিল, তবুও একটা ব্যবধান যেন ছিল। এ সময় দু'টি জিনিস দৱকাৰ ছিল— সাধাৱণ ক্ষমা মণ্ডৰ কৱা ও কোন এক ধৱনেৰ একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু কৱা। বলা হয়ে থাকে, ছয় দফার পৌনে ছয় দফাই মেনে নেয়া হয়েছিল। বাকি ছিল বিদেশী সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য। এ সময়ই আলোচনা ভেঙে যায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৱা হয়।’

‘তারপর?’

‘এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ২৫ মার্চ কিন্তু শেখ মুজিব পালিয়ে যাননি। অনেকের মতো আমিও মনে করি, তিনি সহজেই পালিয়ে যেতে পারতেন। যাননি হয়ত এ কারণে যে, ভেবেছিলেন পালিয়ে গেলে প্রচুর লোকের জীবন হানি ঘটবে। আমার মনে হয় আলোচনা হলে শেখ মুজিব ঐ দুই বিষয়েও ছাড় দিতেন।’

‘আসলে ঢাকায় যখন আপনি কমিশনার হয়ে গেলেন’, বলি আমি, ‘তখনকার কিছু ঘটনার কথা জানতে চাচ্ছি।’

‘দেখেন’, বললেন রাজা, ‘শেখ মুজিবকে প্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় অর্থাৎ আলোচনা ভেন্টে গেল। ঐ সময় দু’জন, একজন জহিরউদ্দিন ও অপরজন, কি যেন নাম ঐ যে আপনাদের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন, হ্যাঁ, শাহ আজিজুর রহমান— এঁরা দু’জন এসেছিলেন আমার কাছে। তাঁরা আলোচনা করতে চাচ্ছিলেন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে। আমি বললাম, আমি তো রাজনীতিবিদ নই, প্রশাসক মাত্র। তাঁরা বললেন, আমার মারফত তাঁদের কথাগুলো কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছুতে চান। আমি বললাম, নুরুল আমীন এখন ঢাকায় আছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করুন। তাঁরা বললেন, নুরুল আমীন তাঁদের প্রতিপক্ষ, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন না। তাঁরা আমাকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা দিলেন। বললেন, এ ব্যবস্থা কার্যকরের আগে সাধারণ ক্ষমা জারি করতে হবে। তাহলে সবাই ফিরে আসবে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর হবে। আমি তাঁদের বার্তা পৌছে দিই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। ইয়াহিয়া খান ক্ষমা ঘোষণাও করলেন কিন্তু তাতে এত যদি ও কিন্তু ছিল যে, ঐ ঘোষণায় কোন কাজ হয়নি।’

‘আপনার কি মনে হয় সামরিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ওরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল? বললাম আমি।

‘আমি ঠিক বলতে পারব না’, বললেন রাজা, ‘তবে এ বিষয়ে তিনি ধরনের মত আছে যা আপনাদের বলতে পারি। প্রথমটি হলো, পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকে মনে করতেন, পূর্ব পাকিস্তানকে ঝোড়ে ফেলাই ভাল। কারণ এই দুই অংশ একত্রে কাজ করতে পারবে না। দ্বিতীয় মতটি ছিল পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ইসলামের ভিত্তিতে। সুতরাং ইসলামের আদর্শে শাসন ব্যবস্থা হতে হবে। তৃতীয় ধারণাটি ছিল, এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বতঃকৃত সমর্থন থাকবে। আমার মত যদি জিজেস করুন, তাহলে আমি বলব, তিনি নম্বর ব্যবস্থাটিই ছিল উত্তম। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তৃতীয় প্রস্তাবটি কার্যকর করা যেত কিন্তু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। আর দ্বিতীয় ধারণাটি হলো নির্বাধের।’

‘প্রথমটির কথা আমরা অনেকের কাছে শুনেছি,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘সেটি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?’

‘দেখুন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান কোন বিষয়ই ঐকমত্যে পৌছতে পারছিল না,’  
বললেন রাজা, ‘তাই অনেকে মনে করতেন, ঐকমত্যের বিষয়গুলো যখন সুরাহা করা  
যাচ্ছে না তখন পূর্ব পাকিস্তানকে ছাড়া চললে অসুবিধা কি? তবে এ ধরনের কথা  
মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও কর্মকর্তার মধ্যেই সীমিত ছিল। আমি আরও বলব, পূর্ব  
পাকিস্তানের মানুষের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ভালবাসা ছিল।  
পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ যদি কখনও বলে থাকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে ঘেড়ে  
ফেলতে চাই তাহলে ওরা তাকে বলেছে, তোমার শরীরের একটা হাড়িও আস্ত রাখব  
না।’

‘এ সবের বিকল্প হিসাবে তাই মনে হয় সামরিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল’, বলি  
আমি, ‘আপনি কি মনে করেন?’

‘আমাকে যখন ঢাকার কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় তখন আমি সংস্থাপন  
মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, আপনারা যেভাবে সমাধান চাচ্ছেন  
আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ঢাকা যাওয়া অস্বীকার করতে পারতাম  
কিন্তু তখন আপনারা মনে করতেন আমি কাপুরুষ। ১৯৭১ সালের গোড়া থেকেই  
আমি মনে করেছি পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নেয়া হলো  
সামরিক সমাধান। এমন কিছু লোক ছিল যারা মনে করত ছয় দফার যে পৌনে এক  
দফা শেখ মুজিব মানছেন না তা মানাতে হলো বাঙালীদের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে  
দেয়া উচিত। আমি এটা সমর্থন করতে পারি না। তবে আমি ঢাকায় পৌছার আগেই  
সামরিক অভিযান শুরু হয়ে গেছে। আমার প্রথম কাজ ছিল এই ক্ষতের উপশম।  
এজন্য দু'টি প্রস্তাব আমি রেখেছিলাম কর্তৃপক্ষের কাছে। একটি হলো সাধারণ ক্ষমা  
ঘোষণা করতে হবে। অপরটি হলো গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানে পৌছতে হবে।  
কিন্তু এত কথা বলার পরও আমি বলব, সামরিক বিকল্প বেছে নেয়া হয়েছিল এবং তা  
থেকেই পরিষ্কার কারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।’

‘সিভিলিয়ানদের ওপর তখন নিশ্চয় অনেক অত্যাচার হয়েছে।’ বললেন মহিউদ্দিন  
ভাই।

আলমদার রাজা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন।  
বললেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানে আমি কাটিয়েছি অনেক দিন। আমি মুসীগঞ্জের এসডি ও  
ছিলাম, বগুড়ার ডিসি ছিলাম। সেই ১৯৭১-এ যখন আমি মুসীগঞ্জে গেছি পুরনো যাঁরা  
আমাকে চিনেছেন তাঁরা সহদয়তার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করেছেন। বাঙালীদের সঙ্গে  
তো আমার কখনও কোন অসুবিধা হয়নি। ঢাকরি জীবনের শুরুতেই দেখেছি পূর্ব  
পাকিস্তানে ঢাকরির র্যাঙ্কের প্রতি তেমন নজর দেয়া হতো না। সবার সঙ্গে সবার  
সহদয়তা ছিল। সেজন্যই বোধ হয় ১৯৭১ সালে কোন সিভিলিয়ান অফিসার কোন  
সিভিলিয়ান অফিসারের হত্যাকারী হয়ে দাঁড়ায়নি। সেই ১৯৭১ সালেও ময়মনসিংহের

বাংলাদেশি ডিসি পশ্চিম পাকিস্তানের সহকারী কমিশনারকে বাসায় আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছেন।'

আবার একটু থামলেন। তারপর সুস্পষ্টভাবে বললেন, 'প্রচুর অত্যাচার, নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটেছে। সেনা শাসনে এক সৈনিক যা খুশি তা করতে পারে, যে কাউকে গুলি করতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাই ঘটেছে। সেনাবাহিনীকে একবার ছেড়ে দিলে এসব দমন করা যায় না। সেজন্যই দরকার ছিল যতশীঘ্ৰ সেনা অভিযান বন্ধ করে আইনসিদ্ধ কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।'

'রাও ফরমান আলীকে আপনার বইয়ের কথা বলেছিলাম। তা উনি বললেন, কোন কিছু ঘটে থাকলে তা আপনার জানার কথা।' জানালাম আমি।

'তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে সেটি হচ্ছে তাঁর অভিযত। আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। আমার বই 'চাকাস ডিবাকল' আপনাকে এক কপি দিয়েছি। তাতে আমি এ ধরনের অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি।'

'তবুও দু'একটা উদাহরণ দেবেন?' জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'প্রথম কয়েক দিনের ঘটনা বলি। প্রথম দিন কমিশনার হিসাবে অফিসে গেলাম। আমার পিএ প্রথমে এসেই আমাকে বলল, স্যার, আপনি কি আমাকে ভালবাসেন? এ ধরনের প্রশ্নে অবাক হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি জানতাম পরিস্থিতি তখন স্বাভাবিক নয় আর বাংলাদেশি মুসলমান হচ্ছে সরল, সোজাসুজি কথা বলে। আমি তার পিঠে হাত রেখে বললাম, অবশ্যই। তখন সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, স্যার, আমার একটিমাত্র মেয়ে, আর তার জামাইকে আর্মি ধরে নিয়ে গেছে গতকাল।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে কি করতে হয় আমার জানা নেই। আমি তাকে বললাম, এ সব ঘটনা ঘটলে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় তাদের কাউকে লাগাও। যে ক্যাপ্টেন তার জামাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল টেলিফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগল এবং ধারণা দিতে লাগল যে, আমি মুক্তিবাহিনীর সমর্থক এবং জানাল, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।

কর্নেল ইসরাত আলভাইকে আমি আগে থেকে চিনতাম। আমি তাঁর বাসায় গিয়ে পুরো বিষয়টি বললাম। তিনি ক্যাপ্টেনকে ফোন করলেন। এবার ক্যাপ্টেন বললেন, ব্যাপারটি তিনি দেখবেন।

যখন আমি কর্নেলের বাসায় তখন কয়েকজন অফিসার এল। তাদের কথাবার্তায় বোৰা গেল সাহেবজাদা ইয়াকুব ও এ্যাডমিরাল আহসানের দুর্বলতার কারণে আজ এই অবস্থা। এখন নিয়াজী এসেছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাঙাই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানীদের উপযুক্ত ওষুধ। আমি যখন সেনাবাহিনীতে ছিলাম ১৯৫০-এর দিকে তখন জেনারেল ইয়াকুব পরিচিত 'ফাদার অফ আর্মি ওয়ার কোর্স' হিসাবে। এ কথা জানাতেই তারা বলল, ভাল প্রশিক্ষক ও ভাল স্টাফ অফিসারের ফারাক অনেক। এখন

উচিত, ভাল শিক্ষা দেয়া। দুপুরে ভাবী যত্ন করে খাওয়ালেন কিন্তু সহকর্মীদের চিন্তার এই ধারা আমাকে বিষণ্ণ করে তুলল।

পরদিন সকালে অফিসে গেলাম। আমাকে দেখে পিএ'র কান্না থামে না। জানলাম, গতকাল রাতে তার জামাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এর ফাঁকেই জানাল একজন মিসেস হোসেন আমাকে বার দশেক ফোন করেছেন এবং দেখা করতে চাচ্ছেন। বললাম, তাঁকে আসতে বলতে...

যে মিসেস হোসেন এলেন তাঁকে আমি চিনি। আমি যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ছিলাম তখন তিনি ছিলেন আমার সহকর্মী। পরে তিনি একজন সুখ্যাত শিল্পপতি মি. আহাদকে বিয়ে করেন। কিন্তু পরিচিত ছিলেন আগের নামেই। আমাকে তিনি জালানেল তাঁর স্বামীকে এক সপ্তাহ আগে ধরে নিয়ে গেছে এবং তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

পরের দিন এলেন বিচারপতি আমিনুল ইসলাম যিনি এক সময় ছিলেন আইন সচিব। তাঁকে আমি ইসলামাবাদ থাকতেই চিনি। এখন দেখলাম বুড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে জালানেল, তাঁর জামাই, ফরিদপুরের ডিসি ইউসুফকে আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। আমি কি কিছু করতে পারি?

তার কয়েকদিন পর নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের স্তৰী ফোন করলেন, তাঁর স্বামীকে দুই আর্মি অফিসার ধরে নিয়ে গেছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলছিলেন, তাঁর দু'টি মেয়ে আছে। তাদের রক্ষার ব্যবস্থা যেন করা হয়। আমি গবর্নর হাউসে ফোন করলাম। কর্নেল সালাউদ্দিন নামে একজন ধরলেন। তাঁকে সব বললাম। বললেন, তাঁদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছেন।

এরপর ফরিদপুরে গেছি ট্যুরে এবং সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার তখনও যে ধারণা ছিল তা খান খান হয়ে গেল। রাস্তাঘাট খালি, কোন মহিলা নেই কোথাও, সবাই ভয়ার্ত। যার সঙ্গেই কথা বলতে চাই সেই আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। সবার উত্তর এরকম, 'আমি খুব ভাল আছি, দুষ্ক্রিয়ার উচিত শাস্তি হয়েছে, সামরিক অভিযান পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। দাঢ়ি রাখা হয়ে উঠেছিল অনুগত পাকিস্তানীর প্রতীক।'

একটানা অনেকক্ষণ ধরে বলে থামলেন রাজা। রাজার বিবরণ শুনতে শুনতে ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ১৯৭১ সালের ঘটনাগুলো মনে আসছিল। কি দিন গেছে তখন, কারও কি তা বোঝা সম্ভব যে থাকেনি অবরুদ্ধ দেশে?

'এমন কোন ঘটনা আছে যা আপনি আপনার বইতে লিখতে পারেননি?'

'আমি কিছুতে ভয় পাইনি,' একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন রাজা, 'আমি পাকিস্তানী, পূর্ব পাকিস্তানকে আমিও ভালবাসতাম। আমি যখন বইয়ে এসব কথা লিখেছি তখনও তা লেখা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও আমি এগুলো বলেছি এবং এর জন্য চাকরি হারিয়েছি।'

‘না, না,’ বিব্রত স্বরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আমি ও ধরনের কোন কথাই বলতে চাইনি। আমি বলতে...’

‘এ রকম শত শত ঘটনা ঘটেছে যার কথা আমি শুনেছি। আমি বইতে সেসব ঘটনার কথাই উল্লেখ করেছি যা আমি সুনির্দিষ্টভাবে জানি। একবার আমি টাঙ্গাইল গেছি। আমার সামনে থেকেই আমার একজন অফিসারকে এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সহকর্মীরা সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কখন সে ফেরে।’

‘কোন্ সময় আপনার মনে এ ধারণা হয় যে, যুদ্ধটা যুক্তিহীন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘খন্থন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো না এবং বাঙ্গালীদের সমর্থন যোগাড়ের স্বার্থে কোন রাজনৈতিক সমাধানের ঘোষণা দেয়া হলো না তখন আমি বুঝতে পারি যুদ্ধটা নির্বর্থক। তখন সেপ্টেম্বরের শেষ অথবা অক্টোবরের প্রথম। আমি বুঝতে পারি যে, পাকিস্তানের আর কোন আশা নেই। নতেস্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী, যুক্তিবাহিনীকে সক্রিয় সমর্থন দিতে থাকে। এ পর্যায়ে পাকিস্তানী বাহিনী বুঝতে পারে যে, ব্যাপার গুরুতর। তারা বিমান বাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠায়। ভারত তিনটি স্যাবর জেট গুলি করে নামায়। এখানে একটি বিষয় খুবই কৌতৃহলোদীপক যে, সত্যিকার অর্থে যথাযথ আক্রমণ পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষ থেকে চালান হয়নি। ভারত সীমানার ভিতর চুকে পড়লে জাতিসংঘে বিষয়টি তোলা হয়নি। যেসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার ছিল সেগুলো নেয়া হয়নি।’

‘এর কারণগুলো কি বলে মনে হয় আপনার?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘এ বিষয়ে অনেক কাহিনীই প্রচলিত’, জানান রাজা, ‘তবে, সবচেয়ে প্রচলিত যেটি সেটি হলো ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে একটা সমরোতা হয়েছিল— সমরোতাটা হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তানকে ঝোড়ে না ফেললে ভুট্টো ক্ষমতায় যেতে পারবেন না। হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে কিছু জানা যেত। ঐ রিপোর্টে আবার এও বলা হয়েছিল যে, এর কিছু অংশ প্রকাশ করা যাবে না। এতই সংবেদনশীল ছিল তা। যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তখন তাঁদের সবাই এখন অবসরে। তাঁদের অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা মুখ খুলতে চান না। শুধু বলেছেন, হতে পারে।’

‘শুনেছি হামিদুর রহমান কমিশন প্রকাশের জন্য আপনি রিট করেছেন?’

‘করেছিলাম, তবে শুধু রিপোর্ট প্রকাশের জন্যই নয়। আমি আরও দাবি জানিয়েছিলাম, যারা এসব অত্যাচার, ধর্ষণ, নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের বিচার হতে হবে। বাংলাদেশের কাছেই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ২০০ লোকের তালিকা আছে। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের যদি অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দেয়া না হয় তাহলে তাদেরও অপরাধী ঘোষণা করতে হবে।’

‘দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একটি ট্রিথ কমিশন করলে কেমন হয়?’ জানতে চাইলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘করা যেতে পারে’, বললেন রাজা, ‘তবে সে ক্ষেত্রে অপরাধীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে—

(১) যাদের যুদ্ধপ্রাধ সম্পর্কে সন্দেহ নেই তাদের প্রাপ্য দণ্ড দিতে হবে (২) কিছু লোক পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় কিছু কাজ করেছে স্বাভাবিক অবস্থায় যা তারা করত না তাদের খানিকটা ছাড় দিতে হবে (৩) যেসব ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ আছে কেবল তারাই ছাড় পেতে পারে। তবে আমি মনে করি, পাকিস্তানের বিচার বিভাগ দুর্বল চিত্তের নয়। বাংলাদেশ সরকার এখানে ২০০টি মামলা করতে পারে।’

‘আসলেই কি এটা সম্ভব?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘বোধ হয় না,’ জানালেন রাজা, ‘আমার রিট আবেদনের নিষ্পত্তি হয়নি এখনও, বছর খানেক হয়ে গেল। আমি যখন রিট পেশ করি, তখন ঘটনার দু’একটি বিবরণ দিছিলাম। বিচারক তরুণ, বিদেশী ডিগ্রীধারী, বাইরে ছিলেন বোধ হয় আগে। মনোযোগ দিয়ে আমার বয়ান শুনছিলেন। আমি বলছিলাম একটি ঘটনার কথা। চার সৈনিক হামলা করেছে এক বাসায়। বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কন্যাটি তরুণী। সে হাতজোড় করে তাদের জানাল যে, সে মুসলমান, তাকে যেন তারা বোনের মতো দেখে। তারপরও যখন তারা এগিয়ে আসছে তখন সে বলল, আমিও তো পাকিস্তানী, তোমাদের কারও হয়ত আমার মতো যেয়েও আছে। তাও তারা মানল না। তখন সে বিছানার পাশে কোরান শরীফ রেখে বলল, আমার যদি কিছু করতে চাও তাহলে এই কোরান ডিঙিয়ে করতে হবে। তারা কোরান শরীফ ডিঙিয়েছিল। আমি যখন আদালতে এ বর্ণনা দিছি তখন সারা আদালত শক্ত। আর বিচারক আমাকে জিজ্ঞেস করছেন বার বার, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? তাঁর চোখে পানি। শুনেছি রিট শুনেই তিনি রায় লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে এ পর্যন্ত আদালত আর কিছু জানায় নি। কিন্তু এটির নিষ্পত্তি একদিন হতেই হবে। এ হচ্ছে আমাদের কপালে কালো কলঙ্কের দাগ। মর্যাদাবান জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে এ দাগ অবশ্যই আমাদের দ্রু করতে হবে।’

‘আপনাদের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন যে, ১৯৭০-এর নির্বাচনী রায় মেনে নিলে আজ ইতিহাস অন্যরকম হতো, এ বিষয়ে আপনার মত কি?’

‘প্রধান মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন,’ বললেন রাজা, ‘আমি চাই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসুক। সেটা সবার জন্য শুভ। আমি আমার যৌবন কাটিয়েছি বাংলাদেশে। আমি সেখানে অবাধে যাওয়া-আসা করতে চাই। কেউ যেন আমাকে জিজ্ঞেস না করে, আপনি কেন এসেছেন এখানে?’

॥ ২৯ ॥

পাকিস্তানের সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদ লেঘারির সাক্ষাতকার নেয়ার ব্যাপারটা ঘটে হঠাতে করে। পাকিস্তানে বসে যখন আমরা সাক্ষাতকার তালিকা, পুনর্বিন্যাস করছি তখন লেঘারির কথা মনে হয়। ১৯৭১ সালে লেঘারি অবশ্য নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু যৌবনের খানিকটা সময় কাটিয়েছেন তিনি বাংলাদেশে। এক সময় ভুট্টোর মন্ত্রিসভায় ছিলেন। পরে হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৭১ ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনাবলী, উপমহাদেশ প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে তাঁর সঙ্গে। লেঘারি তখন খুবই ব্যস্ত। সময় দিতে পারছিলেন না। ইসলামাবাদে পৌছে খবর পেলাম, আমাদের সঙ্গে তিনি আলাপ করতে রাজি।

আলমদার রাজার বাসা থেকে বেরিয়ে ইসলামাবাদের অক্সফোর্ড অফিসে গেলাম। সেখানে যিনি দেখাশোনা করছেন তিনিও মহিলা। আমাদের তিনি নিয়ে যাবেন লেঘারির বাসায়। লেঘারির বাসায় যখন পৌছলাম তখন দুপুর দুটোর বেশ। নিজের বাসায় থাকেন এখন লেঘারি, তবে সরকারী সান্ত্বী পাহারা দিচ্ছে। সরকারী পাহারাদাররা যেমন হয়, কথাই বলতে চাচ্ছে না আমাদের সঙ্গে। বললাম, সদরে আলা আমাদের আসতে বলেছেন, আমরা নিজে থেকে আসিন। সুতরাং ভিতরে খবর দিতে হবে। অনিষ্ট সত্ত্বেও একজন ভিতরে গেল কার্ড নিয়ে। তারপর ত্বরিত ফিরে এল। সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক। তিনি বিনয়ের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন। লেঘারির সচিব। ঢাকাতেও কাজ করেছেন কিছুদিন। আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দোতলায় ড্রাইংরুমে বসিয়ে বললেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব বাইরে গেছেন, এখনও ফেরেননি। কিন্তু ফোনে বলেছেন আমাদের বসাতে। কোমল পানীয় দেয়া হলো। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট পনেরোর মধ্যে লেঘারি এলেন। সাদাসিধে পাজামা-কুর্তা পরা। বয়সের চেয়েও তরুণ মনে হয়। চেহারা আত্মবিশ্বাসীর, সবাইকে উপেক্ষা করার একটা ভাবও আছে। আলাপ পরিচয়ের পর আমরা বললাম, নিশ্চয় তিনি দুপুরের খাবার খাননি। তিনি খাবারটা খেয়ে আসুন, আমরা অপেক্ষা করব। রাজি হলেন না। বললেন, পরে খাব। আর একবেলা না খেলে কি হয়!

‘বলুন, কি জিজ্ঞেস করতে চান?’ প্রশ্ন করলেন লেঘারি।

‘আমরা শুনেছি,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আপনি এক সময় ছিলেন বাংলাদেশে। সে সময়কার কথা দিয়েই না হয় শুরু করি।’

‘হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন ছিলাম আমি আপনাদের ওখানে,’ জানালেন লেঘারি। ‘সিভিল সার্ভিসের একজন হিসাবে আমার পোস্টিং হয়েছিল মানিকগঞ্জে। এসডিও হিসাবে। সিলেটের এডিসি ছিলাম কিছুদিন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসাবেও কাজ করেছি। তার আগে আখতার হামিদ খানের কুমিল্লা একাডেমীতেও শিক্ষার্থী ছিলাম।

সুতরাং বলতে পারেন বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি সম্পর্কে আমার জানার সুযোগ হয়েছিল। অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

গ্রামীণ সমাজ ছিল সেখানে দরিদ্র। তবে আমার মনে হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী গ্রামীণ সমাজের তুলনায় তা ছিল অনেক সুগঠিত ও সুসংহত। থানাকেন্দ্রিক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল, কিন্তু তা আবার পশ্চিমের তুলনায় ছিল কম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বালুচিস্তান, সিঙ্গুর, এমন কি পাঞ্জাবেরও অনেক স্থানের উন্নয়ন হার ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মতো এবং পূর্ব পাকিস্তানের থেকেও গরিব। কিন্তু এ কথাও ঠিক, পূর্ব পাকিস্তান আর পাঞ্জাবের মধ্যে বৈষম্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছিল খাদ্য ও স্বাস্থ্য সংকট এবং পশ্চিমের তুলনায় তা ছিল বিশাল মাত্রার। বলে রাখি, আমার বাড়ি পাঞ্জাব হলেও আমি বালুচ রঞ্জের লোক। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আমার প্রতি কখনও অন্য দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। আমার অনেক বন্ধু ছিল সেখানে।'

'আপনার ব্যাচমেট কারা ছিলেন?' জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি '৬৪ সালের। আমার ব্যাচমেটদের মধ্যে এ মুহূর্তে মনে পড়ছে খালেদ শামস, মুস্তাফিজুর রহমান, ফারুক সোবহানের কথা। আরও অনেকে আছেন।'

'ঐ সময়ের বিশেষ কোন ঘটনা আপনার মনে পড়ে?' জিজেস করি আমি।

'হ্যাঁ, কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যা আমার ভবিষ্যত বিকাশে প্রভাব ফেলেছে। আমি তখন সিলেটের এডিসি। ডিসি ছিলেন মোনেম খানের জামাতা শফিউল আলম। তাঁর মাঝে ছিল বসিংয়ের প্রবল ঝোঁক। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি যা বলবেন তা বৈধ কি অবৈধ প্রশ্ন নয়, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে হবে। আমি তা মানতে রাজি ছিলাম না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেবেন। আমি বলতাম, আলহামদুল্লাহ! এ রকম একবার কথাবার্তার পর দু'মাস তাঁর সঙ্গে আমার কোন বাক্যালাপ হয়নি। সে সময় সিলেটে হঠাত আইয়ুব-মোনেমবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। এ রকম এক বিক্ষোভ মিহিল থেকে ইপিআর তিন চারজনকে আটক করে। মিহিলকারীরা এতে ক্ষিণ্ঠ হয়ে ওঠে। তারা ধারণা করে বসে যে, ইপিআর প্রেফতারকৃতদের মেরে ফেলেছে। ডিসি অফিস ঘেরাও হয়ে যায়। তিনি আমাকে এসে তখন বলেন, ইপিআরের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু করা যায় কিনা দেখতে। ইপিআরের কমান্ডার জানালেন, কয়েক জনকে প্রেফতার করা হয়েছে, পেটানোও হয়েছে, তবে কেউ মারা যায়নি। সিলেটের বাড়িগুর ছিল প্রধানত বাঁশ ও কাঠের তৈরী। পরিস্থিতি খারাপ। কেউ কোথাও আগুন দিলে পুরো শহর ছাই হয়ে যাবে। ডিসিকে বললাম, আপনি বাইরে এসে মানুষজনকে ঘটনাটা বলুন। কারণ আমিতো আর বাংলা বলতে পারি না। ডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে বেরুবেন না। আমি বেরিয়ে এসে বললাম, দেখুন, আমি তো বাংলা বলতে পারি না। উর্দু আর ইংরেজী জানি। কি

ভাষায় বলব? সবাই বলল, ইংরেজীতে। বললাম; ওরা প্রথমে বিশ্বাস করল না। ইটপাটকেল ছোড়া শুরু হলো। দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'কিন্তু আপনিতো বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তখন বাংলা শেখার ব্যাপারটা আসেনি?' জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘না।’

‘কিন্তু আমার ধারণা’, বললাম আমি, ‘আপনাদের একটা ভাষা শেখার ব্যাপার ছিল।’

‘হয়ত’, বললেন লেঘারি, ‘পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পোস্টিং পায় ১৯৬৩ ব্যাচ, তারপর আমরা। তখন ভাষা শেখার ব্যাপারটা ছিল না। যা হোক, যা বলছিলাম। আমি জনতাকে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব ইপিআর সদরে। ডিসিকে জানালাম। তিনি বললেন, না, আপনি যেতে পারেন না। আপনাকে তারা মেরে ফেলবে। আমি বললাম, কিছুই হবে না। গেলাম ইপিআর দফতরে। ছাড় করালাম যারা ঘ্রেফতার হয়েছিল তাদের। এবার জনতা বলল, যারা তাদের পিটিয়েছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। চলুন, সেটা আলাপ করা যাবে। আসলে আমি তাদের সেখান থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। নিয়ে গেলামও।’

‘আর কোন ঘটনা মনে পড়ে?’

‘হ্যাঁ, এ ঘটনার সপ্তাহখানেক পর গেলাম হবিগঞ্জে, ট্যুরে। পাঞ্জাবের ফরিদউদ্দিন ছিল এসডিও। হবিগঞ্জ যেদিন পৌছেছি সেদিন হৈ হৈ কাণ। প্রায় বিশ হাজার লোক ঘেরাও করেছে সরকারী এমপিএ’র (প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) বাড়ি। কি এক ঘটনায় তিনি বিরোধী দলের সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। গেলাম সেখানে। আবার সেই ভাষা সমস্যা। বলা হলো আমাকে ইংরেজীতে বলতে। ভিড়ের অনেকেই উর্দু জানে। কিন্তু এটা ছিল পাঞ্জাববিরোধী অনুভূতির প্রকাশ। যা হোক, জনতার নেতাদের বললাম, আমি এমপিএ’র বাসায় যাচ্ছি। তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গেলাম সেখানে। আবারও বাক-বিতঙ্গ শুরু হলো। আমি এমপিএকে ঘ্রেফতার করে তাঁর বন্দুক সিজ করলাম। এতে জনতা শান্ত হলো। কিন্তু রাত এগারোটা পর্যন্ত মানুষজন ছিল। গভীর রাতে পুলিশ এসকর্টে এমপিএ’র পরিবারকে সিলেট পাঠালাম। তবে সচরাচর যে ঝট ব্যবহৃত হয় সে ঝটে নয়।

ঝট বদল করে ভালই করেছিলাম। কারণ পরে শুনেছি ঐ ঝট জনতা পাহারা দিচ্ছিল। এসব ঘটনা থেকে যে শিক্ষাটা হলো— তা হলো নিজে আন্তরিক এবং সৎ হলে, খুব কঠিন পরিস্থিতি, এমন কি জনতা উত্তেজিত হলেও তারা কথা শুনবে যদি তাদের সামনে দাঁড়ানোর মতো সাহস থাকে। কারণ আমার অভিজ্ঞতা বলে, দেহাতি মানুষও প্রবল উত্তেজনার সময় যুক্তিতে কান দেয়। তবে আগে সে লক্ষ্য রাখে যে যুক্তি দিচ্ছে তার দরদ আছে কিনা তাদের জন্য।’ লেঘারি একটু থামলেন। কোমল

পানীয়তে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, ‘পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যা ঘটেছে তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কেননা পূর্ব পাকিস্তান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ। আমার মনে হয়, ন্যায় বিচার হলে বা ন্যায় বিচার হচ্ছে বা হবে এমন প্রত্যয় থাকলে, স্বচ্ছতা থাকলে দেশ অভিন্ন থাকত। পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাবার বেশ আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ডিনামিক্স সচল হয়ে উঠেছিল।’

‘উন্সত্ত্বের আন্দোলনকে আপনি কিভাবে দেখেন?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘ঐ আন্দোলনের মৌলিক কিছু কারণ ছিল, যা হয়ত আপনাদের জানা’, বললেন লেঘারি, ‘দেশে ছিল ডিকটেক্টরশীপ। আপনাদের ওখানে ছিল দারিদ্র ও আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যা এবং অনুমাননির্ভর কিছু ধারণা...’

‘কিন্তু পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হলো কেন?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আপনার কি কখনও এ কথা মনে হয়েছে,’ জিজ্ঞেস করি আমি, ‘যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হিসাবে আপনারা ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছেন?’

‘দেখুন, সেই সময় আমরা খুব নিম্নপর্যায়ের আমলা ছিলাম। এ বিষয়ে তত্খানি সচেতন ছিলাম না। তবে এ কথা বলতে পারি, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু সিনিয়র আমলা ছিলেন বা পাঞ্জাবি আমলা যাঁদের ব্যবহার বাঙালীদের প্রতি যথার্থ ছিল না। আমার মনে হয়, এসব বাঙালীদের মধ্যে বিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও পাশাপাশি ছিল পাকিস্তান ইনসিটিউট অব ডেভলপমেন্ট ইকনমিস্ট্রের রেহমান সোবহান ও তাঁর অনুসারীদের অবদান, যাঁদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। তবে তাঁদের ধারণা কতটা সত্য তা বিতর্কের ব্যাপার। কিছু সত্য অবশ্য আছে। কিন্তু এসব দাবি হলো সেই একই ধারণা যার ভিত্তি অনুমান।’

‘আপনি যা বললেন তা কি এখানকার মানুষ অনুধাবন করেছিল?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘করেছে’, বললেন লেঘারি, ‘পশ্চিম পাকিস্তানের বহু নিরপেক্ষ মানুষই স্বীকার করেন যে, উন্নয়নের সুফল পূর্ব পাকিস্তানে পৌছায়নি। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশীদারিত্ব ছিল সামান্য। আমরা জানতাম গলদটা কোথায়, তা নিয়ে তর্কবিত্ক, আলাপ-আলোচনাও করতাম।’

‘ছয় দফা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমি ছয় দফার বিরোধী,’ পরিষ্কারভাবে জানালেন লেঘারি, ‘ছয় দফা হলো বিচ্ছিন্নতার ছাড়পত্র। আমার ধারণা, ছয় দফা ছাড়াই পরিস্থিতি বদলানো বা গলদ দূর করা সম্ভব ছিল। ঐ পরিস্থিতিতে যে ধরনের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা দরকার তা আমাদের

ছিল না। আলজিরিয়ার স্বাধীনতার কথা আপনারা জানেন। আলজিরিয়ায় মোতায়েন বিরাট সংখ্যক ফরাসী বাহিনীর ধারণা ছিল, আলজিরিয়ায় তাদের আসন পাকাপোক্ত করবে, অথচ দ্য গল সাহসের সঙ্গে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার ব্যাপারটি সম্পন্ন করেন। আমাদের কোন দ্য গল ছিলেন না।'

'কেন, ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমান?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'সহজভাবে বলি', বললেন লেঘারি, 'আমি ভুট্টোর মন্ত্রিসভায় ছিলাম। তিনি ছিলেন আমার নেতা। কিন্তু তবুও আমি মনে করি না ভুট্টো বা শেখ মুজিবুর রহমান দ্য গল ছিলেন। অবশ্য, তাঁদের প্রচুর গুণ ছিল। কিন্তু যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তা অতিক্রম করার সাধ্য তাঁদের ছিল না।'

'যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসত এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো তাহলে কি সঙ্কট অতিক্রম করা যেত?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'আমার মনে হয় না,' লেঘারি উত্তর দিলেন, 'কারণ ফেরার পথ আর তখন ছিল না। পাকিস্তানী আর্মি এ্যাকশন, তারপর পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটিয়েছে। হয়েছে গৃহযুদ্ধ, ভারতের হস্তক্ষেপ। আসলে বহু আগে থেকেই ভাঙনের উপাদানগুলো ছিল, সেগুলো ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।'

এমন সময় তাঁর সহকারী ঘরে চুকলেন। আন্তে করে মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর পরবর্তী এ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় চলে আসছে। আমরাও খানিকটা বিরুত বোধ করছিলাম। ঘড়ির কাঁটা তিনটা পেরিয়েছে কিন্তু লেঘারি তখনও খাননি। লেঘারি বললেন, 'হবে, হবে, কথা শেষ করি।' তারপর আমাদের বললেন, 'অসুবিধা নেই, আমরা আমাদের আলাপ সারি।'

এর পর আরও প্রায় আধ ঘণ্টা আমরা লেঘারির সঙ্গে আলাপ করি নানা বিষয়ে, যার অধিকাংশ জুড়েই ছিল পাকিস্তানের সাম্প্রতিকতম রাজনীতি। আমি সে প্রসঙ্গে যাব না, বরং বাংলাদেশ সম্পর্কিত আরও যে দু'য়েকটি কথাবার্তা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে-তা দিয়েই শেষ করব।

লেঘারির সহকারী চলে যাবার পর জিজ্ঞেস করি, 'পাকিস্তান বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যা করেছে তার কি কোন যৌক্তিকতা ছিল বলে আপনি মনে করেন?'

'না,' বললেন লেঘারি, 'আমি তাদের হয়ে ওকালিত করব না। তবে আমি বলব, সেনাবাহিনী এ্যাকশনে গেছে ঠিকই, তবে পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছে ঐ এ্যাকশনে যেতে। কারণ মুক্তিবাহিনীর তখন আবির্ভাব হয়েছে, সেনাবাহিনীর এ্যাকশনে না গিয়ে কি উপায় ছিল?'

'বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নয়ন তেমন হয়নি কেন?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি জানি না, এ সম্পর্কের অবনতি কিভাবে ঠেকানো যেত। দেখুন, বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে অত্যাচার নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছে তা নিয়ে বহু

কথাবার্তা হয়েছে। আমরা জানার চেষ্টা করেছি কেন বাঙালীরা স্বাধীনতা চাইল আর কেনই বা তা দমন করা হলো? এসব নিয়ে সমীক্ষা চলতে পারে, অত্যাচার কতটা হয়েছে বা হয়নি তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। তবে আমি মনে করি দু'পক্ষই অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জড়িত। ফলে একটা বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়েছে যার ওপর সাঁকো তৈরি সম্ভব নয়।'

'ভুট্টোর সঙ্গে কি আপনার ১৯৭১ নিয়ে কখনও কথাবার্তা হয়েছে?'

'ভুট্টোর কেবিনেটে ছিলাম তিন মাস। ঐ সময় বিরোধীদের আন্দোলন নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এ ধরনের কথাবার্তার কোন সুযোগ ছিল না।'

'দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একটা ট্রুথ কমিশন হলে কি কোন উপকার হবে?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

ফারুক লেঘারি এর উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, 'সত্য একদিন বেরিয়ে আসবেই। একটি দেশের সঠিক ইতিহাস রচনা সে দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরাসক ঐতিহাসিকরা তা পারবেন। আমার আশা, সঠিক ইতিহাস প্রকাশিত হবেই। তবে আমরা এখন ব্যস্ত সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা, হিংসা থামানো, উন্নয়ন, গণশাসন প্রত্তি নিয়ে।'

॥ ৩০ ॥

বাংলাদেশের হাইকমিশনার রহিম সাহেব জানিয়েছিলেন, ১৭ মার্চ হাই কমিশনে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস পালন করা হবে। পাকিস্তানে আগে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। তিনি না বললেও বুবলাম ব্যাপারটা স্বাভাবিক, কারণ গত দু'দশক বঙ্গবন্ধুবিরোধীরাই ক্ষমতায় ছিল। এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পালিত হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন দিবস ইত্যাদি। এক হিসাবে হাই কমিশনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই প্রথম এই দিবসটি উদ্যাপিত হবে তাও পাকিস্তানে, আমন্ত্রিতরা কি আসবেন? আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন হাই কমিশনার। আমরা বললাম, অবশ্যই যাব। বিকালে খুঁজে পেতে পৌছলাম হাই কমিশনে। ছোট হল ঘরটি দেখলাম দর্শকে পরিপূর্ণ। হ্যাঁ, হাই কমিশনের স্টাফরা এসেছেন সপরিবারে। দুয়েকজন প্রবাসী বাঙালী যুবকও আছেন, কিছু পাকিস্তানীও আছেন। সামনের সারিতে বসে আছেন প্রফেসর আহমদ হাসান দানী, প্রাক্তন কেবিনেট সচিব হাসান জহির, ঢাকার প্রাক্তন কমিশনার আলমদার রাজা এবং আরও বেশ কয়েকজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুফিয়া আহমদকেও

দেখলাম। উনি গবেষণার কাজে এসেছেন পাকিস্তান। আরও অনেকে আছেন যাঁদের চিনি না। সাংবাদিকও এসেছেন কয়েকজন।

অনুষ্ঠানে বক্তা পাকিস্তানীরাই। বেশ চকমপ্রদ অভিভ্রতা। হাই কমিশনের প্রেস সচিব ভুল বাংলায় ভুল উচ্চারণে স্বাগত জানালেন সবাইকে। তারপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানালেন মালিক সরফরাজ আলীকে।

মালিক সরফরাজ আলী ছিলেন পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি। দেখতে শুনতে শেখ মুজিবের মতোই। ১৯৭১ সালে তাঁকে ঘ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি আওয়ামী লীগের সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করলেন। বললেন, মুজিব লাহোরে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, আমি ভিক্ষা চাইতে আসিনি, আমি মানুষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের অধিকার চাইতে এসেছি। তাঁর মানবিক গুণাবলী ছিল অসাধারণ।

সরফরাজ জানালেন, গত মাসে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন। ঢাকার মানুষ তাঁকে খাতির-যত্ন করেছে। সেখানে একজন তাঁকে বলেছিলেন, কায়েদে আজম ও বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেপারিটিষ্ট। সরফরাজ বললেন, হতে পারে কিন্তু শেষোক্তজন ফাইট করেছিলেন অধিকার আদায়ের জন্য।

তারপর বক্তৃতা দিতে উঠলেন ড. তারিক রহমান। ইসলামাবাদের কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এর কথাই আমাকে আহমেদ সেলিম বলেছিলেন, যিনি ১৯৭১ সালে সামরিক বাহিনী ত্যাগ করেছিলেন। সৌম্য শাস্ত চেহারা। পিএইচ.ডি করেছেন পাকিস্তানের ভাষা ও রাজনীতির ওপর। বই আকারে তা প্রকাশ করেছে অক্সফোর্ড। সেই বইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমাদের ভাষা আন্দোলন।

ড. রহমান প্রধানত বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বের ওপর জোর দিলেন। তিনি বললেন, ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষা আন্দোলন ছিল না, অধিকারের লড়াইও ছিল যা শাসকরা অনুধাবন করেনি। ‘দে হ্যাভ গট দেয়ার লেসন, উই হ্যাভ গট আওয়ার লেসন। লেটস লিভ অন ইকুয়াল বেসিস।’

এরপর অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীকে আহ্বান জানানো হলো কিছু বলার জন্য। অধ্যাপক দানী আমাদের পরিচিত মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। লিখেছেন ঢাকার ইতিহাস, গড়ে তুলেছেন জাতীয় যাদুঘর ও এশিয়াটিক সোসাইটি। অধ্যাপক দানী অমায়িক মানুষ। আমি তাঁকে দেখছি গত এক দশক ধরে। কোনদিন তাঁকে ত্রুদ্ধ, শুরু হতে দেখিনি। কিন্তু আজ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

অধ্যাপক দানী গঞ্জিভাবে বক্তৃতা শুরু করলেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ, ঢাকা শহর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিচারণ করলেন। বললেন, বাঙালীরা তাঁকে সব সময় নিজের লোক মনে করেছে। তিনি সেখানে থেকেছেন, তাদের ভাষা শিখেছেন এবং যত

আন্দোলন হয়েছে তাও দেখেছেন। কারণ তাঁর বাসা ছিল নিমতলী কুঠিতে। আর সব আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহীদ মিনার।

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। ড. তারিক রহমানের কথার প্রতিধ্বনি করলেন দানী। তারপর দেখা গেল তাঁর গলার স্বরে ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছে। বললেন, ‘বাঙালীদের কি পাকিস্তানীরা মানুষ মনে করেছে? আমার খেয়াল আছে, রেভিনিউ সেক্রেটারি ইকরাম একদিন আমাকে বললেন, বাঙালী মেয়েরা টিপ দেয় কেন? বললাম, এটি প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ প্রথা চালু আছে। তারপর ইকরামকে বললাম, তোমরা সালোয়ার-কামিজ পর কেন? এই সালোয়ার-কামিজ পরাটাকেও তো এখানকার লোকেরা ঘৃণা করতে পারে।’

পুরো হলে পিনপতন নিষ্ক্রিয়। অধ্যাপক দানীর গলার স্বর উঁচু গ্রামে উঠছে, ক্রোধ, ক্ষোভ ফুটে উঠছে। তাঁর রক্তিম চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। এ অধ্যাপক দানী আমাদের অচেনা। কি কারণে যেন আজ তাঁর সব ক্ষোভ ফেটে পড়ছে। বললেন, ‘পাকিস্তানের মানুষজন এগুলি বোঝেনি। ঢাকায় থাকার সময় ভাবতাম, বাঙালীরা কিভাবে এসব পশ্চিমা অফিসারের খারাপ ব্যবহার সহ্য করে? আমি ঢাকায় থাকতাম। বাঙালীর আমার বন্ধু। সে কারণে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেও পাকিস্তানী অফিসাররা দ্বিধা করেনি! এ ধরনের ব্যবহারের অসহ্য হয়ে উঠলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিই। আমাকে ভিসি জিভেস করেছিলেন, কেন চলে যাচ্ছেন? আমি বলেছিলাম ইষ্ট পাকিস্তান পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না। বাঙালীরা ন্যায় বিচার চেয়েছিল। তাদের তা দেয়া হয়েনি এবং এর জন্য দায়ী আমলারা যাঁদের অনেকে এখানে উপস্থিত আছেন।’ বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে সামনের সারিতে বসা প্রাক্তন আমলাদের দেখালেন ড. দানী। সবাই স্নেহিত।

না, এ বলেও থামেন নি অধ্যাপক দানী। পুরনো কথার সূত্র ধরে তিনি বললেন, ‘পাকিস্তানী আমলাদের মানবিকতা ছিল না। কয়েকদিন আগেও এ বিষয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, পত্রিকা তা ছাপেনি। শেখ মুজিব ন্যায় বিচার, সাম্য ও মানবিক আচরণ চেয়েছিলেন। নির্বাচনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন। তাঁকে ক্ষমতা দেয়া হবে না কেন? মুজিব বাঙালীদের সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার ছিনয়ে আনতে সফল হয়েছিলেন।’

প্রায় মিনিট কুড়ি বললেন অধ্যাপক দানী। এত সুন্দর, আবেগী বক্তৃতা খুব কমই শুনেছি। পরে দর্শকরাও একই কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন, ড. দানীর এই চেহারার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত নন। ড. দানী বক্তব্য শেষ করলেন এভাবে-‘আমি শক্তি। বাঙালীরা কেন শেখ মুজিবকে দেশ গড়তে দিল না। কেন তাঁকে সহ্য করল না?’

তারপর হাসান জহির বক্তব্য রাখার কথা। তিনি জানালেন, তিনি বলবেন না। আরও দুয়েকজন প্রাক্তন আমলার বোধ হয় বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু অধ্যাপক দানীর বক্তৃতার পর কেউ আর বক্তৃতা দিতে রাজি নন। এমন সময় আলমদার রাজার স্ত্রী এ্যাডভোকেট আনোয়ার রাজা নিজে থেকেই মঞ্চে উঠে এলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন। বললেন, ‘বাংলাদেশে আমি আমার জীবনের সাতটি সুন্দর বছর কাটিয়েছি যার মধ্যে স্মৃতি ভোলার নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায় যদি শাসকরা মেনে নিতেন তাহলে আজ পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যরকম হতো।’

এরপর অনুষ্ঠান শেষ হলো। চা খাবার পালা। ইসলামাবাদে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত প্রথম অনুষ্ঠান আশাতীতভাবে সফল। পরদিন এ সংক্রান্ত খবর ছাপা হয়েছিল পত্র-পত্রিকায়। যা হোক, চা খাবার সময় থেকে গিয়ে আলাপ করলাম ড. তারিক রহমানের সঙ্গে। জানালাম ইসলামাবাদে আমাদের আসার কারণ। বললাম, ‘এ প্রসঙ্গে যদি আপনার ছোট একটা সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে চাই আপত্তি আছে?’

‘মোটেই না’, জানালেন রহমান।

চা-পর্ব শেষ করে আমরা গিয়ে বসলাম হাই কমিশনের একটি আলাদা কামরায়। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘ড. রহমান, শুনেছি ১৯৭১ সালে আপনি ছিলেন সেনাবাহিনীতে। পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার খবর শুনে নাকি আপনি কমিশন ত্যাগ করেন? ঘটনাটা একটু বলবেন?’

‘আমি তখন কাকুল সামরিক একাডেমির ক্যাডেট। আমার এক সিনিয়র একদিন আমাকে ঢাকায় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন। আমি এসব নিয়ে আগে কখনও ভাবিনি। একদিন ফায়ারিং রেঞ্জে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সময় মনে হলো, আমি এসব কেন করছি। আমি যাকে শুলি করতে চাই না একদিন হয়ত তাকেই শুলি করতে হবে। আমি রাজনীতিসচেতন ছিলাম না। কিন্তু আমার মনে কোন জাতিদেশও ছিল না। আমার বঙ্গ যখন ঢাকার কথা জানালেন, তখন আমি বলে ফেললাম, এটা বর্বরতা, অন্যায়। বঙ্গুটি বলল, দেশের খাতিরেই তা করা হয়েছে। আমি বললাম, মাই গড ইজ নট কাস্ট্রি, হিউম্যানিটি। আদেশ খারাপ হলে মান্য করা উচিত নয়। সেনাবাহিনীতে থাকলে আদেশ মানতে হবে। আমার বঙ্গুটিকে বললাম, দেশের নামে ঢাকায় যা ঘটছে তাকে যৌক্তিকতার মোড়ক দিতে পারি না। যদি তা করি, আমাদের অন্যায় হবে। আসলে এটি করে আমরা কতিপয় লোকের অন্যায় কাজকে যৌক্তিকতা দিচ্ছি। এটি হচ্ছে দেশ গড়া থেকে ভাঙার সেরা উপায়।’

‘তারপর?’

‘ইতোমধ্যে আমি কমিশন পেলাম। কমিশন পেয়ে চলে গেলাম ওপরালা কর্ণেল শামসুর রহমান কালুর কাছে। তিনি ছিলেন আমার বাবার বঙ্গ। আমার বাবাও ছিলেন

সেনাবাহিনীতে। কর্নেল কালুকে বললাম, আমি এ যুদ্ধে জড়াতে চাই না, আমার পদত্যাগ করার মতো সাহসও নেই। তিনি বললেন, এ কাজটি করলে কোর্ট মার্শাল করে তোমাকে গুলি করা হবে। বললাম, ঠিক আছে তা করব না। কিন্তু আমার সহানুভূতি তাদের সঙ্গে যাদের ঢাকায় গুলি করা হচ্ছে। তিনি বললেন, তোমার কি কোন বাঙালী বন্ধু আছে? বললাম, আছে, কিন্তু মূল ব্যাপার তা নয়। মূল বিষয় হলো, আমি মনে করি ঢাকায় যা ঘটছে তা অন্যায়। তিনি বললেন, তুমি ইয়োশনাল হয়ে যাচ্ছ। তুমি তো আর্মড কোরের। তোমাকে ঢাকায় যেতে হবে না। তাছাড়া ঢাকায় সামরিক তৎপরতা শেষ হয়েছে। বললাম, এ রকম ঘটনা পরে ঘটতে পারে বেলুচিস্তানে, করাচীতে। আমাকে তখনও গুলি চালাতে বলা হতে পারে। আমি এ কাজের জন্য অনুপযুক্ত, সুতরাং আমাকে পদত্যাগের সুযোগ দেয়া হোক।

এ নিয়ে বেশ ঝামেলা গেছে। আমার বন্ধুরা ভাবত, আমি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। আমি তাদের বললাম, আমি পাকিস্তানের বিরোধী নই। আমার কাছে পাকিস্তান রক্ষার অর্থ হলো পাকিস্তানের অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ দেখা। দেশের শতকরা ৫৬ জন বাস করে পূর্বাঞ্চলে। আমরা তাদের সঙ্গে ভাল আচরণ করিনি। তারপর যা হোক, সেনাবাহিনী আমি ছাড়তে পেরেছিলাম।'

'ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তো তা ছিল খুব সাহসের ব্যাপার,' মন্তব্য করলাম আমি।

'না, এজন্য আমাকে ক্রেডিট দেয়া উচিত নয়,' জানালেন ড. রহমান, 'ক্রেডিট যদি দিতে হয় তাহলে সাহস নয়, বাঙালীদের জন্য আমার ফিলিংকেই ক্রেডিট দিতে হয়। দেখুন, সে সময় আমি রাষ্ট্রের প্রকৃতি বুবিনি, পরে তা বুঝেছিলাম।'

'পাকিস্তান ভাঙ্গার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'আমার গবেষণার সময় আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। আমার বিষয় ছিল ভাষা এবং পাকিস্তানের রাজনীতি। ঢাকায় গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি উপলক্ষ্মি করেছি ঘটনার মূল কোথায়। ভাষা আন্দোলন ছিল শোষণ-বঞ্চনার প্রতীক। ভাষা কেড়ে নেয়া আর কারও আবেগ-অহংকার, এমন কি সংস্কৃতি কেড়ে নেয়া একই কথা। যেমন উদাহরণ দিই, এটি হলো বঞ্চিত করা তাকে, যে ভাষা বোঝে না সে ভাষায় তাকে ফর্ম প্ররণ করতে বলে। এরকমভাবে সৃষ্টি করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব। ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তখন তাঁরা দোহাই পাড়েন এ বলে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ব্যবহারযোগ্য নয়। মানুষ তো এ অন্যায় আধিপত্যের প্রতিবাদ করবেই।'

সেই একুশের পর একাত্তরের ২৫-২৬ মার্চের নিকষ কালো রাতেই আমি মনে করি পাকিস্তান নিরুদ্দেশ হয়। আমাদের জেনারেল নিয়াজির মতে 'তারা নাকি ভারতের একাংশ কজা করে নিতে পারতেন। আমার মতে পারতেন না। আর পারলেও তাতে অবস্থার বড় রকমের কোন হেরফের হতো না, যুদ্ধটা শুধু দীর্ঘায়িত

হতো। আমি মনে করি, এসব থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়ার আছে। সে শিক্ষা হলো, সমস্যার সমাধান রয়েছে শোভন সৌজন্যে, মানবিকতায়।'

'তা হলে দক্ষিণ এশিয়ার সক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে আলোচনার মাধ্যমেই। সংঘাতের মাধ্যমে নয়?'

'কখন প্রতাক্তা নামাতে হবে, রাষ্ট্রকে তা বুঝতে হবে,' শান্ত স্বরে বললেন ড. রহমান, 'অন্য জন্মত কখন মেনে নিতে হবে তাও প্রতিপক্ষকে বুঝতে হবে। তবে এক আধজনের হেন উপলক্ষ্মিতে কাজ হবে না; ব্যাপক জন্মত গড়ে উঠতে হবে। আমি শুধু বলতে চাই, এই যে ইতিহাস লেখা হচ্ছে, তাতে সমস্যার গভীরতর উপলক্ষ্মি আমাদের ঘটবে, আগামীতে আমরা এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে পারব। তা যদি পারা যায় চমৎকার। বলা যাবে, আমরা কিছু শিখেছি। যদি না পারি তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার কপালে বড় দুর্ভোগ রয়েছে। সুবিচার না থাকলে এ অঞ্চলে গোলযোগ-সংঘাত লেগেই থাকবে। বলা বাহ্য্য, দক্ষিণ এশিয়ায় এরকম নানা অন্যায়, অবিচারের অস্তিত্ব রয়ে গেছে। আমরা অভিন্ন প্রতিবেশের অধিবাসী। যদি আমরা এ প্রতিবেশ ধ্বংস করে ফেলি আমাদের আর কোথাও যাবার ঠাঁই থাকবে না।'

## ॥ ৩১ ॥

হাসান জহিরের বাড়িটি ইসলামাবাদের আরও অনেক প্রাসাদসমূহ বাড়ির মতো নয়। ছোটখাটো ছিমছাম, বুর্জোয়া ঝুঁটির ছাপ স্পষ্ট। হাসান জহির ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। এসডিও ও ডিসি হিসাবে কাজ করেছেন বাংলাদেশে। ১৯৭১ সালে তাঁকে পাঠানো হয় ঢাকায়। হানাদার বাহিনীর পতনের পর যুদ্ধবন্দী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতে।

পাকিস্তানে ফেরার পর আবার পুরনো সার্ভিসে ফিরে যান। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিবের কাজ করার পর নিযুক্ত হন কেবিনেট সচিব। ১৯৮০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর নেয়ার পর অলস দিন না কাটিয়ে গবেষণায় মন দেন। গবেষণা ও নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে রচনা করেন তথ্যবহুল ৫০০ পাতার বই—'দি সেপারেশন অফ ইন্টেলিজেন্স পাকিস্তান : দি রাইজ এন্ড রিয়ালাইজেশন অফ বেঙ্গলি মুসলিম ন্যাশনালিজম'। ঢাকার ইউপিএলও বইটি প্রকাশ করেছে।

হাসান জহিরের মতামত বিধৃত হয়েছে তাঁর বইতে। সাক্ষাতকারে তিনি নতুন কিছু বলবেন এমন আশাও করিনি। কিন্তু ১৯৭১ সালের সেই দিনগুলোতে তিনি ছিলেন ঢাকায়। বইও লিখেছেন। সেজন্যই সাক্ষাতকার নিতে আসা।

আমরা বেশ বেলা করেই পৌছলাম। হাসান অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। ড্রাইংরুমে না বসে খাবার ঘরেই বসলাম। টেবিলে খাবার সাজানো, আমাদের জন্যই। হাসান বললেন, ‘বসুন, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।’

‘বিলক্ষণ’, জানালাম আমি, ‘খিদেও পেয়েছে।’

হাসানের প্রকাশক অক্সফোর্ডের আমিনা ও তাঁর বান্ধবীও আছেন। বিভিন্ন বিষয়ে টেব্ল টক শুরু হলো। এরই ফাঁকে মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘জহির সাহেব, আপনার বইটি পড়েছি, ছেপেছিও আমি। সুতরাং বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ নিয়ে কোন প্রশ্ন আপনাকে করব না, বরং আপনার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা বলুন, ঢাকায় যখন ছিলেন, তখন কি দেখেছেন বলুন।’

মনে হলো, প্রসঙ্গটি তাঁর মনমতো হলো। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, ‘আমার প্রথম পোস্টিং হয় পূর্ব পাকিস্তানে, ১৯৫৬ সালে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এসডিও হিসাবে। সেখান থেকে চট্টগ্রাম। তারপর পাবনা, ঢাকার সেক্রেটরিয়েট। এর পর যশোরে ডিসি। ১৯৫৬ থেকে ’৬২ এ ছয় বছর কাজ করেছি সেখানে। প্রথম যখন চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাই তখন নিজেকে আগন্তুক মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু হলে আর নিজেকে আগন্তুক মনে হলো না। তারা আমাকে গ্রহণ করেছিল আর আমিও তাদের পাকিস্তানী হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। ঐ সময় নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যে চলছিল না তা নয়। কিন্তু জেলা-মহকুমার নিত্যদিনের কাজকর্মে তার কোন প্রভাব পড়েনি। অপরাধের হার, মূল্যস্ফীতির হার সব কিছুই ছিল কম। মানুষের জীবনযাত্রা ছিল শান্তিপূর্ণ। ভালই ছিলাম সে সময়।’

‘১৯৭১ সালে তো আপনার আবার পোস্টিং হলো ঢাকায়?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘হ্যাঁ, আমি যেতে চাইনি।’ জবাব দিলেন হাসান, ‘তবুও আমাকে পাঠানো হয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসাবে। আমার কাজ ছিল জরুরী পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। পরিকল্পনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এএমএস মুসা। এর আগে ঐ পদে ছিলেন কফিলউদ্দিন মাহমুদ। আমাকে রিপোর্ট করতে হতো চেয়ারম্যানের কাছে। তবে আমি টিক্কা খানকে কাজ করতে দেখেছি। সারা দিন মিটিং করে চলছেন বিভিন্ন গ্রন্থের সঙ্গে কিভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায় তা নিয়ে। কিন্তু কিসের স্বাভাবিকতা? স্বাভাবিকতা বিষয়টা আদৌ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। অবস্থার দিন দিন অবনতি হতে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আর্মি ক্র্যাকডাউনের উদ্দেশ্য কি ছিল? মনে হয় ফাইনাল সলিউশন, যে রকমটি চেয়েছিলেন হিটলার।’

‘২৫ মার্চের পর ঢাকায় কি ঘটেছে আপনি জানতেন?’ জিজেস করি আমি।

‘আগে সে সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল ধোঁয়াটে’, বললেন হাসান, ‘ঢাকায় নামার পরই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাই। তারপর আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপের পর

আরও জানতে পারি। রোয়েদাদ খানের সঙ্গে একদিন হইস্কির বোতল নিয়ে বসে আলাপ করছিলাম। তাঁকে বললাম, কিছু একটা করুন। এভাবে তো চলতে পারে না। কিন্তু তখন বুঝিনি আত্মসমর্পণের মতো এত বড় একটা অবমাননাকর পরিস্থিতি কাছেই। এত সব হত্যা, ত্রাস-বিভীষিকা যা গোটা প্রদেশকে গ্রাস করছে তার পরিণতি সম্পর্কে আমার লেশমাত্র সংশয় ছিল না। সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে পা রাখার মতো অবস্থা ছিল না।'

'বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?' আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

'না', বললেন হাসান, 'গবর্নর হাউসের কর্তাদের সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

'রাও ফরমান আলী আমাদের বলেছেন', জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, 'তিনি কিছুই জানতেন না। কারণ তিনি নাকি বেসামরিক বিষয় নিয়েই কাজ করতেন। জেনারেল নিয়াজিই নাকি সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন?'

'বয়স্ক একজন লোক যিনি ঢাকায় ছিলেন তিনি কিভাবে এ ধরনের ভান করতে পারেন?' গলার স্বরটা একটু ক্ষুঁক শোনালো হাসান জহিরের, 'একজন দুধের শিশুও জানত ঢাকায় তখন কি হচ্ছে। কেন এমন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে তারা? নুরুল আমিন বা গোলাম মোহাম্মদের আমলেও দেখেছি এরকম কিছু ঘটলে তাঁরা নির্বিকার থাকতেন। আমাদের প্রেসিডেন্টও সে রকম নির্বিকার ছিলেন। এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি হয়ত বলতেন, আমি যখন ব্যবস্থা নিয়েছিলাম তখন সমর্থন জানিয়েছে। অন্য কথায়, তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হলো বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য কিন্তু সেটি আসতে হবে লড়াইয়ের মাধ্যমে।'

'রাও ফরমানের ধারণাও কি তাই?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'ফরমানের সঙ্গে আমি কাজ করেছি', জানালেন হাসান, 'তাঁকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে হয়েছে। আমার কাজ ছিল প্রধানত বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে। তাদের প্রতিনিধি দল এলে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আমাকে ঘূরতে হতো। এসব ব্যাপারে ফরমানের সহযোগিতা সব সময় পেয়েছি। ঢাকায় তখন যেসব সেনা অফিসার ছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর সঙ্গেই যুক্তি দিয়ে কথা বলা যেত। অন্তত আমার তাই ধারণা। একটি ঘটনার কথা মনে আছে। এক পার্টিতে এক সেনা অফিসার সিভিল অফিসারদের বকারকা করছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এমনভাবে কথা বলছেন কেন? তিনি বললেন, এখন কালো থেকে ছাই এবং তা থেকে সাদা হওয়ার সময়। আমি বললাম, এখন সময়োত্তা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হওয়ার সময়। তিনি বললেন, সেটা এর পর। এই ব্রিগেডিয়ার কাদেরই প্রথম ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। যা বলতে চাচ্ছি, ঐ ব্রিগেডিয়ারের মাথা বিগড়ে যাওয়ার মতোই অবস্থা তখন সারা দেশে। প্রশাসনে যুক্তি বলে কিছু ছিল না।'

‘অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা ছিল তখন কি রকম?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে বলার মতো কেউ ছিল না’, জানালেন হাসান, ‘শোনা যায়নি সেখানে কোন প্রতিবাদী কঠ। কাগজগুলোতে অতিরঞ্জিত সব কাহিনী ছাপা হচ্ছিল আর সেখানকার মানুষ তাই বিশ্বাস করছিল। সব কিছুতেই চলছিল কপটাচার। উর্দু পত্রিকাগুলোর কথা বাদ দিলাম, এমন কি ডনের মতো নিরপেক্ষ কাগজও চুপ করে ছিল। তখন ভারত আর কোন ইস্যু ছিল না। কারণ ভারত তো আর এ সমস্যা তৈরি করেনি। সমস্যার সুযোগ নিয়েছে মাত্র। নির্বাচিত কোন নেতা কোন কথা বলেননি। সুপ্রীম কোর্ট, শাসনতন্ত্র, আইন- কোন কিছুরই প্রতিক্রিয়া নেই, অথচ প্রকাশ্যে নরহত্যা চলছে। এমন সময় ৮২টি আসন নিয়ে নির্বাচনের কথা এল। তখন সবাই নেমে এল চিল-শকুনের মতো, হামলে পড়ল খালি আসনগুলোর ওপর। আসন নিয়ে শুরু হলো লড়াই। ফরমান জনিয়েছিলেন আমাকে এসব। পিপিপি মার্কা হিসাবে চাষ্টিল ট্যাঙ্ক আর মাহমুদ আলী কাসুরি ডিনামাইট। ফরমান মশকরা করে তখন বলেছিলেন, আপনার প্রার্থী তো ট্যাঙ্ক পেয়েছে, আপনাকে ডিনামাইট দিই কিভাবে? সব বেহায়া, নির্লজ লোক।’

‘কোন্ কাসুরির কথা বলছেন’, জিজ্ঞেস করেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘নির্ভেজাল মাহমুদ আলী কাসুরির কথা বলছি?’ বললেন হাসান, ‘যিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনেরও চেয়ারম্যান। এসব চিজের মুখ দর্শন আমি করতে চাই না। এরা মওদুদী, দৌলতানার সমগোত্রীয়। তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে বিলকুল সব ঠিকঠাক। সেনাবাহিনী সেখানে ভাল কাজ করছে। মানবাধিকারও আছে ঠিকঠাক। সে কারণেই বললাম, এসব কপটাচারীর মুখ দর্শন করতে চাই না। কেউ সে সময় কোন কথা বলেনি।’

‘এসব নিয়ে পাকিস্তানে একটা বিতর্ক চলছে।’ বললাম আমি, ‘দেখেছেন নিচয় খবরের কাগজে।’

‘হ্যাঁ’, বললেন হাসান, ‘এখন যে যার ভাস্তা বলছে, বিশেষ করে নিয়াজীর বইটি বেরুবার পর। সব সময়ই এ রকমটি হবে। এতে ডানপন্থীদেরও কিছু মতামত আছে যারা সব সময় বলছে, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু প্রভাব বেশি ছিল যা ছিল এ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এ হলো এখানকার মানসিকতা। সে যা-ই হোক, বাড়াবাঢ়ি অত্যাচার সেখানে হয়েছে।’

‘আপনি নিচয় দেখেছেন’, বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘এখন অনেকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কথা তুলছেন।’

‘ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলছেন’, বললেন হাসান জহির, ‘সে সময় আসতে অনেক দেরি। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জখম এখনও তাজা। সেনাবাহিনী পাকিস্তানী জীবনের এক বাস্তবতা। ক্ষমা চাওয়ার আবশ্যকতা আছে, তবে এখনই নয়। এটি হবে রয়ে সয়ে।’

॥ ৩২ ॥

রোয়েদাদ খানের সঙ্গে যখন সাক্ষাত করতে যাই তখন তাঁর সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিল না। শুনেছি তিনি সচিব ছিলেন, মন্ত্রীও। পরে জানতে পারি তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম ব্যাচের সিএসপি (১৯৪৯)। বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এবং ১৯৭১ সালে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আলতাফ গওহরও তাঁর কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন।

আলতাফ গওহরের বাসার কাছাকাছিই থাকেন রোয়েদাদ। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব শুনে তিনি জানিয়েছেন, মধ্যাহ্ন ভোজটাও তাঁর ওখানে সারতে হবে। তিনি আরও কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানাবেন।

এদিকে সাক্ষাতকার নিতে নিতে এক ধরনের ক্লান্তি দেখা দিয়েছে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। যাঁদের সাক্ষাতকার নিছি তাঁদের বলার ধরনও প্রায় একই রকম। এখন আমরা সহজেই ধরতে পারি তাঁর বক্তব্যের কতটুকু সত্য আর কতটুকু সত্য নয়। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯৭১-এর পটভূমিকা সম্পর্কে নানান ধরনের তথ্য পাচ্ছি।

বেশ বড়সড় জমির ওপর রোয়েদাদ খানের বাড়ি। পুরো জমিটিকে তিনি ভাগে ভাগ করেছেন। এক অংশে থাকে ছেলে, এক অংশে মেয়ে। মাঝখানে তিনি। সুন্দর বাড়ি। রোয়েদাদ খান অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। চুকতেই চোখে পড়ল মারগালা হিলসের চমৎকার একটি পোস্টার, গান্ধারার সুন্দর একটি নির্দশন। রোয়েদাদ এখন মারগালা পর্বত সুরক্ষা সমিতির সভাপতি। ইসলামাবাদকে ঘিরে আছে যে মারগালা হিলস তার অন্তিম ভূমিকির সম্মুখীন। গাছপালা কেটে নেয়া হচ্ছে। পাথরের জন্য এলোমেলো খনন চলছে।

আলাপ-পরিচয় সঙ্গ হওয়ার পর রোয়েদাদ তাঁর সদ্য প্রকাশিত আত্মস্মৃতির একটি কপি উপহার দিলেন। নাম-'পাকিস্তান- এ ড্রিম গন সাওয়ার'। আত্মস্মৃতি যখন, তখন তাতে কিছু তথ্য তো পাওয়া যাবে। তাই সরাসরি ১৯৭০ সালে চলে এলাম। মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন, '১৯৭০ সালে আপনি কোন পদে ছিলেন?'

'আমি ছিলাম তখন পাকিস্তান টিভির ম্যানেজিং ডিরেক্টর', জানালেন রোয়েদাদ, 'এবং ঐ সময় সবচেয়ে বড় একটি কাজ করতে পেরেছিলাম, তা হলো, টিভিতে জাতীয় রাজনৈতিকিদের বক্তৃতা প্রচার।'

'একটু বিস্তারিত বলুন।'

'২৮ অক্টোবর থেকে ১৯ নবেম্বর (১৯৭০) পর্যন্ত টেলিভিশনে রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রচারিত হয়। সিরিজ শুরু হয়েছিল মুজিবকে দিয়ে, শেষ হয়েছিল সিন্ধুর জিএম সৈয়দকে দিয়ে। ভাসানীই শুধু উর্দু আর বাংলায় বলেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা সবার ভাল

লেগেছিল, কারণ তিনি পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানী হিসাবে নয়, খাঁটি পাকিস্তানী হিসাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মুজিব গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আঞ্চলিকতার ওপর, ভুট্টো ইসলামী সমাজতন্ত্র, ভারতের বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি।'

'আমি সব রাজনীতিবিদের সঙ্গেই তাঁদের ক্ষিপ্ত নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ধানমণ্ডিতে, তাঁর বাড়িতে। এটি ছিল তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত। হি গেত মি দ্য ইমপ্রেশন অব বিইং এ্যান এ্যাংরি ইয়ং ম্যান ইন এ হারি। তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশ শব্দটি ছিল। আমি জানালাম নীতিমালার সঙ্গে এটি যায় না। তিনি বরং ইন্ট বেঙ্গল শব্দটি ব্যবহার করলে ভাল হয়। তিনি তাতে রাজি হলেন না। পিস্তিতে জেনারেল পীরজাদাকে জানালাম। তিনি বললেন, লেট হিম হ্যাভ হিজ ওয়ে। এ ছাড়া তিনি ছিলেন খুব অতিথিবৎসল এবং ভদ্র। কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর বললাম, জাতীয় নেতা হিসাবে তাঁর একবার পশ্চিম পাকিস্তান সফরে আসা উচিত। তাঁর উত্তরে আমি থ হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান অনেক দূরে এবং সেখানে যেতে অনেক খরচ।' মনে হলো, পশ্চিম পাকিস্তান সফরে তাঁর আগ্রহ নেই। যে কোন কারণই হোক, অভিন্ন পাকিস্তানে তখন তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন।'

'এটা তো গেল মুজিব প্রসঙ্গ, ভুট্টো প্রসঙ্গে কিছু বলুন।'

রোয়েদাদ খান জানালেন যে, ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর অনেকদিন থেকেই চেনা-পরিচয় ছিল। মাঝে মাঝে কথাবার্তাও হতো। ১৯৭০-এর নির্বাচনে সীমান্ত প্রদেশে তাঁর ভাই খালেকই একমাত্র পিপিপি প্রার্থী হিসাবে জয় লাভ করেন। এরপর এক ফ্লাইটে তিনি যাচ্ছেন ভুট্টোর সঙ্গে করাচী। তিনি ভেবেছিলেন, ভুট্টো এ বিষয়ে তাঁকে কিছু বলবেন, কিন্তু ভুট্টো তাঁকে কিছুই বললেন না। তখন তিনি নিজেই প্রসঙ্গটি তুললে ভুট্টো বললেন, অন্যান্য প্রার্থী দুর্বল ছিল দেখে খালেক জিতেছে। রোয়েদাদ বললেন, 'তখনই বুঝলাম ভুট্টো আসলে খুব ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নিজে ছাড়া কাউকেই তিনি কোন কৃতিত্ব দিতে চান না।'

'এরপর একদিন পিস্তিতে', বললেন রোয়েদাদ, 'ইন্টারকনে দেখা ভুট্টোর সঙ্গে। তাঁর মুড খুব খারাপ। বললেন, ইয়াহিয়া ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির ডেট ফিরু করেছে আমাকে না জানিয়ে। আমি প্রতিনিধিত্ব করছি পশ্চিম পাকিস্তানের। আমি ঢাকায় যাব কেন? ইয়াহিয়ার উচিত এ্যাসেম্বলির ডেট চেঞ্জ করা।'

কিভাবে তা চেঞ্জ করা হবে? জানতে চাইলাম আমি। জবাবে ভুট্টো বললেন, 'কেন, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে। দরকার হলে বন্দুক চালাও। একটা না একটা অজুহাত তো পাওয়া যাবেই।'

'আপনি তো মার্চে ঢাকায় ছিলেন। কি ঘটেছিল সেখানে?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আসলে আমাকে মার্টের তৃতীয় সন্তাহে তথ্য সচিব করা হয়। কাজকর্ম বুঝে নিতে না নিতেই আমাকে বলা হয় ঢাকা যেতে। প্রেসিডেন্ট তখন ঢাকায়। জেনারেল টিক্কা খানের অফিসে ২৩ মার্চ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম। এমনি সাধারণ কথাবার্তা বলার পর ইয়াহিয়া বললেন সব ধরনের অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিতে। তিনি আরও বলেছিলেন— ‘Two old women thoroughly demoralized a first class army.’

‘তারপর?’

পরের দিন আমার বন্ধু সানাউল হককে ফোন করে বললাম ইন্টারকন্টিনেন্টালে আসতে। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। আমাদের মধ্যে কোন বৈরী ভাব ছিল না। কিন্তু আমার মনে হলো ২৩ তারিখেই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। সেদিন ছিল পাকিস্তান দিবস, কিন্তু ঢাকায় কোন পাকিস্তানী পতাকা ওড়েনি।’

‘২৫ তারিখ পর্যন্ত তো আপনি ছিলেন ঢাকায়’, জিজ্ঞেস করি আমি।

‘আমি ছিলাম আর্মি রেস্ট হাউসে,’ বললেন রোয়েদাদ, ‘কিন্তু একলা লাগছিল, তাই একটা ঝুম বুক করলাম ইন্টারকন্টিনেন্টালে। ২৫ তারিখ বিকালে ভুট্টোর বন্ধু কায়সার রশীদ এলেন। কিছু করার ছিল না। আমাকে নিয়ে গেলেন আখতার ইস্পাহানীর বাসায়। সেখানে কিছু বিদেশী সংবাদদাতাও ছিলেন। যখন ডিনার খাচ্ছি তখন এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের আর্ন্ড জেইটলিন এসে বললেন যে, আর্মি অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি রেস্ট হাউসে ফিরে এসে রেডিও স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম যাতে পরদিন ব্রডকাস্টিংয়ে কোন অসুবিধা না হয়। কোন বাঙালী স্টাফ ছিল না। স্টাফের সদস্য কিছু যারা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারী তাদের ধরে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসা হলো। একজন মাওলানা ভয়ে ভয়ে কোরান পড়লেন। একজন আর্মি ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর পেছনে।’

‘কিন্তু জেনারেল উমর জানিয়েছেন,’ বললাম আমি, ‘যে, সকালে ঘোষণাটি আপনি করেছিলেন।’

‘না,’ অস্বস্তি ভরে বললেন রোয়েদাদ, ‘জেনারেল উমর যা বলেছেন তা ঠিক নয়।’

‘২৫ মার্চ আপনি কিছুই দেখেননি?’ গভীরভাবে প্রশ্ন করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘না,’ থেমে থেমে বললেন রোয়েদাদ, ‘রাত ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত আমি কোন বন্দুকের শব্দ শুনিনি। মৃতদেহ দেখিনি।’

ইন্টারকন্টিনেন্টালের উল্টোদিকে ছিল “দি পিপল”-এর অফিস, তাঁকে সাহায্য করার ভঙ্গিতে আমি বললাম, ‘রাত ১২টা থেকে তা দাউ দাউ করে জুলছিল।’

রোয়েদাদ খান একবার আমার দিকে আরেকবার মহিউদ্দিন আহমেদের দিকে তাকালেন। বিড় বিড় করে বললেন, ‘না, তা তো দেখিনি।’

‘আপনি নিশ্চিত?’ প্রশ্ন করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

রোয়েদাদ খান কোন জবাব না দিয়ে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বাংলায় মহিউদ্দিন ভাইকে বললাম, ‘অন্য প্রসঙ্গে যান।’

‘আপনি কি ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিবের আলোচনার বিষয়ে কিছু জানতেন?’

‘না, মানে,’ বললেন রোয়েদাদ, ‘আমি জানতাম না কেন আলোচনা ভঙ্গে গেল। টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন সকালে। জেনারেল জিলানী ছিলেন সেখানে। দু’জনেই বেশ রিল্যাক্সড। টিক্কা বললেন, ‘আর কোন সমাধান ছিল না। বিকল্প ছিল না। এটি ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।’

‘তার পর?’

‘টিক্কা খানের কাছে যাওয়ার আগে,’ যেন পুরনো সূত্র খুঁজে পেলেন এমনভাবে বললেন রোয়েদাদ, ‘ঢাকা এয়ারপোর্ট গেলাম, সেখানে দেখা হলো জেনারেল জেহানজেবের সঙ্গে। তিনি জানালেন ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ রাতে চলে গেছেন করাচী। ভিআইপি লাউঞ্জে দেখলাম ভুট্টো, মুবাষ্ঠির হাসান, জে এ রহিম বসে আছেন। ভুট্টো আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করলেন সেটা হলো কয়জনকে হত্যা করা হয়েছে। আমি এসব বিষয়ে কিছুই জানতাম না। ভুট্টো আবার বললেন, আর্মি এ্যাকশনের পর পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, না হলে প্রয়েম সলভড হবে না। তারপর উঠে পেনের দিকে চলে গেলেন। পাকিস্তান নেমে বললেন, থ্যাক্স গড, পাকিস্তান ইজ সেভড।’

‘আচ্ছা, এখানে যা ছিল তার ম্যাগনিচিউড সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?’  
জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘না,’ শূন্য চোখে তাকিয়ে বললেন রোয়েদাদ।

‘জানতে চাননি?’ প্রশ্ন করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমি এসব কিছু জানি না,’ অসংলগ্নভাবে বললেন রোয়েদাদ।

‘আলতাফ গওহর বলেছেন, আপনি আর জেনারেল উমর প্রায় যেতেন ঢাকায়, তারপর ফিরে এসে হাইকোর্টে থেতে থেতে বলতেন কি হচ্ছে সেখানে।’ বললাম আমি।

‘আমি গেছি কয়েকবার,’ মনে হলো শব্দ হাতড়াচ্ছেন তিনি, ‘একবার যশোরে দেখলাম এক বৃক্ষ নামাজ শেষে মোনাজাত করছে। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, এ আমার শক্ত হয় কিভাবে? সে তো আমার থেকে ভাল মুসলমান। সে কিভাবে দেশদ্রোহী হয়? সে কিভাবে নিজের দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সঙ্গে হাত মেলাবে?’ হঠাত কথা শেষ করে রোয়েদাদ আবার শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলেন।

‘আপনি পাকিস্তানের তথ্য সচিব ছিলেন’, বললাম আমি, ‘কিন্তু আপনি জানতেন না পাকিস্তানের অন্য অংশে কি হচ্ছে বা এখানে কি হচ্ছিল?’

‘এখানে সবাই অফিসিয়াল ভার্সান বিশ্বাস করেছে। কোন পাকিস্তানী লিডার আর্মি এ্যাকশনকে চ্যালেঞ্জ করেনি। ওয়ালী খান আমাকে বলেছিলেন, আর্মি এ্যাকশনের

আগে, পশ্চিম পাকিস্তানে রিএনফোর্সমেন্টস আছে। তারা পলিটিক্যাল সলিউশনে আগ্রহী নয়।'

বোঝা যাচ্ছে সাক্ষাতকার ক্রমেই রোয়েদাদের জন্য অস্বত্তিকর হয়ে উঠছে।

'বাঙালীরা সব খারাপ করেছে, আর আপনারা পাকিস্তানের ঠিকাদারী নিয়েছিলেন,' বললেন মহিউদ্দিন ভাই, টের পেলাম তাঁর স্বর উষ্ণ হয়ে উঠছে। 'আপনার ফিলিংস কি ছিল?' বেশ উষ্ণ স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'শেখ, ভুট্টো, ইয়াহিয়া জিন্নাহর পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছে।' হঠাতে মন্তব্য করলেন রোয়েদাদ।

'কিভাবে এ তিন জন রেসপন্সিবল?' বিরক্ত স্বরে মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন। বোঝা গেল, প্রধানত, আমলাদের এ উত্তর শুনতে শুনতে তিনি বিরক্ত।

'পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে তিন জনই দায়ী। বেশি দায়ী ইয়াহিয়া, তারপর ভুট্টো এবং সবশেষে মুজিব।'

'নির্বাচনে কোন্ দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, যে দল জেতে তাকেই তো?' জিজ্ঞেস করি আমি, 'আওয়ামী লীগ জিতেছিল। তাহলে তাকে কেন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না?'

রোয়েদাদ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। গত আধ ঘণ্টা ধরে দেখছি, কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকছেন। প্রায় প্রশ্নের উত্তরেই বলছেন, না। এবারও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভুট্টো ২ নম্বর পজিশনে রাজি হলেন না।' বলতে পারতাম, একজনের আদ্দার মানতে গিয়ে ১৯৭১ সৃষ্টি করতে হলো? কিন্তু এর কোন উত্তর পেতাম না।

রোয়েদাদ খানের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করি। কিন্তু কথা এগোয় না। এক সময় অন্য অতিথিরা আসা শুরু করেন। আমরা স্বত্তির নিশ্চাস ফেলি। রোয়েদাদ বলেন, 'চলুন নিচে যাই।'

আমন্ত্রিত অতিথিরা অধিকাংশই প্রাক্তন আমলা। দু'জন আইসিএস অফিসার, প্রাক্তন সিএসপি। এঁদের একজন মুফতি মাহমুদ, ১৯৭১ সালে ছিলেন ঢাকায়। এখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। লেখালেখি করেন। আমরা ১৯৭১ সাল নিয়ে আলাপ করছিলাম। তিনি বললেন, এ নিয়ে একটা লেখা লিখেছি, আপনাকে পাঠাব। ঠিক ঠিকই পরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে পরে দেখেছি রোয়েদাদ খান থেকে তাঁর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট; কিন্তু অন্তিমে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সেই তিন জনই- ইয়াহিয়া- ভুট্টো- মুজিব।

রোয়েদাদ খানের বাসা থেকে ফেরার পথে আমরা দু'জন পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র নিয়ে আলাপ করছিলাম। বাংলাদেশে অনেক প্রাক্তন সিএসপি এবং পাকিস্তানেও জাঁদরেল সব প্রাক্তন সচিব, জেনারেলদের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং অবাক হয়েছি এ

ভেবে যে, এরাই আমাদের শাসন করত? এদের ডিকটেট আমরা দীর্ঘদিন মেনে নিয়েছি। দেশ ছিল তাদের কাছে নিজের বাড়ি ও সুদৃশ্য অফিস-ঘর, জগত সীমাবদ্ধ ছিল গাড়িতে করে যতটুকু পথ সরকারী খরচে যাওয়া যেত ততটুকুই। রোয়েদাদ খান, যিনি পাকিস্তানের প্রশাসনের প্রভাবশালী পদগুলিতে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে সেই ধারণা আরও দৃঢ় হলো।

আমরা রোয়েদাদ খানের সঙ্গে আলোচনার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলাম এক পর্যায়ে। কারণ করাচীতে যাঁদের সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম তাঁদের অনেকেই রোয়েদাদ খানের ভূমিকার কথা বলেছেন। রোয়েদাদ এখন সেগুলো অঙ্গীকার করছেন। ১৯৭১-এর সত্য যে ১৯৯৮-এ কলক্ষ—এ সত্যটুকুন যে তাঁরা অনুধাবন করছেন তাই যথেষ্ট।

## ॥ ৩৩ ॥

আমাদের সাক্ষাতকার পর্ব প্রায় শেষ। ইসলামাবাদে আমরা শুধু এখন দেখা করব জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সঙ্গে। তার পর ফিরব লাহোর। জেনারেল নিয়াজীর সাক্ষাতকার নিলেই আমাদের প্রকল্পের কাজ শেষ।

সাহেবজাদা ইয়াকুব আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতকার দিতে রাজি হননি। ১৯৭১ সালের পর এ পর্যন্ত '৭১ নিয়ে তিনি কোন বক্তব্য-বিবৃতি দেননি। ১৯৭১-এ পিডি ফিরে আসার পর তাঁর পদাবনতি ঘটে। প্রতিবাদ করেননি। পরে, আবার তাঁর মর্যাদা ফিরে পান এবং পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রদূত, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবেও কাজ করেন। এখন সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে ইসলামাবাদে থাকছেন। সাক্ষাতকার দিতে তিনি রাজি হননি, তবে বলেছেন, আমরা যদি তাঁর বাসায় এক কাপ চা খাই তাহলে তিনি খুশি হবেন। আমরা বলেছি, নিশ্চয়।

রোয়েদাদ পর্ব সেরে আমরা এই প্রথমবার তিন-চার ঘণ্টা বিশ্রাম নিলাম। কাজ যেহেতু প্রায় শেষ, টেনশনও তেমন নেই। সন্ধ্যায় আমেনা এলেন। আমরা তিন জন রওনা হলাম। খুঁজে পেতে জেনারেল ইয়াকুবের বাসাটা পেতে একটু সময়ই লাগল।

জেনারেল ইয়াকুবের বাড়িটা অন্যদের বাড়ির তুলনায় সাধারণই বলতে হবে। তবে ঘরোয়া এবং ভিতরটা কুচিসম্মতভাবে সাজানো। জেনারেল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। খবর পেয়েই এলেন। ফিটফাট। এখনও সুস্থ। খুব বিনয়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। দেখেই বোৰা যায় খানদানী পরিবারের লোক। শুনেছি, তাঁর চাচা ছিলেন পাকিস্তানের আরেক জেনারেল শের আলী খান, মন্ত্রীও হয়েছিলেন ইয়াহিয়া আমলে। পতৌদির নবাবও নাকি শের আলীর ভাইপো।

লাইব্রেরিতে আমাদের বসিয়ে নিচু স্বরে বাংলায় বললেন, ‘বাংলাদেশ থেকে আপনারা এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি।’

‘বা আপনি তো ভাল বাংলা জানেন।’ বললাম আমি।

‘এখনও মনে আছে খানিকটা, তবে ভুলে গেছি অনেক।’ বললেন ইয়াকুব। পাকিস্তানী জেনারেলদের মধ্যে ইয়াকুবের খ্যাতি আছে পড়াশোনা জানা লোক হিসাবে। বেশ ক'টি ভাষাও তিনি জানেন।

‘আপনি তো ইতিহাসের প্রফেসর,’ বললেন ইয়াকুব আমার দিকে তাকিয়ে, ‘আচ্ছা, বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে কি কিছু লেখা হয়েছে? বিষয়টি আসলে কি?’

আমি যা জানি বললাম। কারণ এ সময় বঙ্গ বিভাগের ওপর একটি পাঞ্জুলিপি তৈরি করছিলাম। এরপর শুরু হলো ইতিহাস নিয়ে আলোচনা। সে আলোচনা গড়াল উপমহাদেশ নিয়ে। এর মধ্যে চা এল। চা খেতে খেতেও নানান প্রসঙ্গে আলোচনা চলতে লাগল। লক্ষ্য করলাম, আন্তে আন্তে তিনি সহজ হয়ে উঠেছেন। জেনারেলের ফর্মাল খোলসটা আর থাকছে না। হাসি-ঠাট্টাও করছেন। এক পর্যায়ে মহিউদ্দিন ভাই আমাদের পরিকল্পনাটা খুলে বললেন। ইয়াকুব জিজেস করলেন, ‘১৯৭১ সম্পর্কে লেখা হয়েছে কেমন?’ কি লেখা হয়েছে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে বললাম, ‘আপনার সম্পর্কেই বাঙালীদের ধারণাটা ভাল।’ এ কথার সূত্র ধরেই মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘এ প্রসঙ্গে আপনি কিছু বললে ভাল হয়। কারণ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আপনি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।’ ইয়াকুব খান নীরব হয়ে গেলেন। তার পর মৃদু কঢ়ে বললেন, ‘কঠিন সময়। আমি আসলেই কিছু বলতে চাই না।’

‘আপনাকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় একটা বিতর্ক চলছে, দেখেছেন নিচয়?’ জিজেস করি আমি।

‘হ্যাঁ, নিয়াজীর বইটি বের হবার পরই এ বিতর্ক শুরু হয়েছে। আলতাফ গওহরও লিখেছেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে, নিয়াজীর বইটির আশ্রয় যে ডাস্টবিন সে সম্পর্কে আমি একমত। প্রশ্ন উঠেছে পূর্ব পাকিস্তানে যে সামরিক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তা আমার কি না? জেনারেল টিক্কা ও নিয়াজী সেই পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত করেছেন কি না? এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি আলতাফ গওহরকে পাঠিয়েছি, সঙ্গে পদত্যাগপত্রের কপিও। এ সব কিছু এর আগে প্রকাশিত হয়নি।’ বলে কিছু কাগজপত্র আমাকে দিলেন। সাক্ষাতকার নিলে হয়ত তিনি এ বিষয়গুলোই বলতেন। এখানে আমি সেই নথিপত্রের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তাহলে কিভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে সে বিষয়ে ১৯৭০-এর নবেবেরে জেনারেল ইয়াকুব জিওসি হিসাবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যার নাম দেয়া হয় ‘অপারেশন ব্লিংজ’। এবং আরও বলা হয়, এটি কার্যকর করতে হবে ‘Using minimum force.’

টিক্কা খানের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করেন তিনি ৭ মার্চ এবং ১১ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। আরও দু'সপ্তাহ পর সামরিক বাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং হতে পারে ২৫ মার্চের ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল 'অপারেশন ব্রিংজ'-এর পরিবর্তিত রূপ। ইয়াকুব জানাচ্ছেন, তাঁর সময় অপারেশন ব্রিংজ কখনও কার্যকর হয়নি এবং তিনি ও গবর্নর আহসান সব সময় প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছেন রাজনৈতিক মীমাংসার। ৫ মার্চ (১৯৭১) প্রেসিডেন্টকে তিনি একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন-

Only solution present crisis is a purely political one(.) Only President can take this far-reaching decision by reaching Dacca by 6th, which I have repeatedly recommended(.) Am convinced there is no military solution which can make sense in present situation(.) I am consequently unable to accept responsibility for implementing a mission, namely a military solution, which would mean civil war and large scale killing of unarmed civilians and would achieve no sane aim(.) It would have disastrous consequences(.) I therefore confirm tendering my resignation...(.)

গবর্নর হিসাবে ইয়াহিয়াকে তিনি আরও দু'টি চিঠি লিখেছিলেন যাতে সবিস্তারে ঐ সময়ের পরিস্থিতি ও তাঁর নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোও আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। চিঠি দু'টিতেও তিনি বার বার রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছেন, না হলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন। একটি চিঠিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"d.. W. Pak leaders must make up their mind regarding "the price" they are prepared to pay in the political and economic spheres for integration.

e. It should be our endeavour to place the responsibility for their failure on their shoulders or at worst they- at least the W. Pak leaders- must be made to share with us the responsibility for decisions which are bound to lead disintegration under the most unfavourable and bitter circumstances"

জেনারেল ইয়াকুব কাগজগুলি দিলেন বটে কিন্তু 'অন রেকর্ড' তেমন কিছু বলতে রাজি হলেন না। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, 'দেখুন, এ কারণেই তো আমরা ওরাল হিস্ট্রির এ প্রজেক্টটা নিয়েছি।'

'ঠিক আছে আমি লিখলে আপনারা ছাপবেন?' হালকা স্বরে জিজেস করলেন জেনারেল।

‘ইউপিএল অবশ্যই ছাপবে,’ বললাম আমি, ‘দেখেন, বাংলাদেশে যে এত বড় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে এখানের লোক তা জানেও না এবং জানলেও বোধ হয় বিশ্বাস করে না।’

জেনারেল ইয়াকুব হঠাতে আবেগাক্রান্ত হয়ে গেলেন। এতই আবেগাক্রান্ত যে, তাঁর চোখ প্রায় সজল হয়ে এল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে আপন মনে মন্তব্য করলেন, ‘সব দেশে মানুষ শেষ আশ্রয় হিসাবে সেনাবাহিনীর কাছে যায়। আর পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী দেখে মানুষ পালিয়ে গেছে। না, আমি কিছু বলতে চাই না। আমার বিষয়ে কিছু লিখবেনও না।’

## ॥ ৩৪ ॥

ইসলামাবাদে আমাদের কাজ শেষ। শ্রান্ত হলেও স্থিতি বোধ করি। আমাদের এখন আর একজনের সাক্ষাতকার নেয়ার বাকি, তিনি হলেন লে. জে. আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী। তাঁর বই ‘ব্রিটেয়াল অফ ইস্ট পাকিস্তান’ বেরিয়েছে কয়েক দিন আগে আর পাকিস্তানে তা সৃষ্টি করেছে বিতর্কের। প্রায় সবাই নিয়াজীর বিপক্ষে। তাঁর বইতে নানা অতিরঞ্জনের মাঝে কিছু সত্যও আছে যা কারো পছন্দ হয়নি। অবশ্য সে সত্য ছেঁকে বের করতে হয়। তা ছাড়া নিয়াজী হচ্ছেন পাকিস্তানের পরাজয়ের প্রতীক।

থবর পেয়েছি, নিয়াজী ফিরে এসেছেন লাহোর। আগামীকাল আমরা ফিরব লাহোর, পরদিন নিয়াজীর সাক্ষাতকার। তার পরদিন আমরা রওনা হব দিল্লী।

একই পথে লাহোর ফিরলাম। যোগাযোগ হলো অক্সফোর্ডের আমজাদের সঙ্গে। জানালেন, নিয়াজী প্রস্তুত। আমরা বললাম, রাও ফরমান আলীর সাক্ষাতকার যেমন ভিড়ও করেছি, নিয়াজীরটিও করতে চাই। আমজাদ বললেন, নিয়াজী তাতে রাজি হচ্ছেন না। ঠিক হলো, পরদিন বিকালে তিনি নিয়ে যাবেন আমাদের তাঁর ‘নিয়াজী আঙ্কলে’র বাসায়।

নিয়াজীর বাসা লাহোরের সেই ডিফেন্স-এর আবাসিক এলাকায়। পুরনো আমলের বাড়ি। না, নিয়াজীর বাসার ফটকে কোন শান্ত্রী দেখলাম না। বৈঠকখানায় নিয়াজী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

এ কোন নিয়াজী! সালোয়ার কুর্তা পরা এক বৃন্দ। মাথায় রঙিন পাগড়ি। দেখতে অনেকটা সঙ্গের মতো। কুশল বিনিময়ের পর জানালেন, আমরা আসব শুনে তিনি এ ফর্মাল ড্রেস পরেছেন। মিনিট পাঁচকের মধ্যে মধ্যবয়সী দুই মহিলা ঢুকলেন। নিয়াজী পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর বড় ও ছোট মেয়ে। তাঁরাও আসন গ্রহণ

করলেন। বোঝা গেল বাবাকে তাঁরা একা ছেড়ে দিতে রাজি নন। পাহারা দেয়ার জন্য এসেছেন। কারণ কে জানে, কখন অভ্যাসগত তিনি বেফাস কথা বলে ফেলেন।

নিয়াজী বেশ হাসিখুশিভাবেই আমাদের গ্রহণ করলেন। সাতাশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা যেন কিছু নয়। তাঁর হাতে ক্লিপ বোর্ড, কিছু ফটোকপি, আমরা ফটো নিতে চাইলাম। নিয়াজী কিছু বলার আগেই তাঁর বড় মেয়ে বললেন, ‘না, না, ছবি তুলবেন না।’ বললাম, ‘কেন?’

‘না, আমার মনে হয় ছবি তোলা বিপদ। বাবার ছবি দেখলে আপনাদের ওখানকার অনেকে তা ছিঁড়ে ফেলবে।’

‘কেন আপনার একথা মনে হলো?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘কয়েক বছর আগে আমরা দু’বোন ঢাকায় গিয়েছিলাম বেড়াতে। আমাদের ঢাকার বন্ধুরা বলেছিল, আমরা যেন কোথাও বাবার নাম না করি, তাহলে বিপদ। কিন্তু কেন বুঝতে পারছিলাম না। দেখেন আমরা ঢাকায় ছিলাম ছোটবেলায়। আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবও ছিল। কি সুন্দর ছিল দিনগুলি! আফসোসের সুরে কথা শেষ করলেন তিনি।

‘না, কিছু হবে না,’ আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি আমি। ইতোমধ্যে মহিউদ্দিন ভাই ক্যামেরার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আমিও ক্যামেরা ঠিক করে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে কিছু ছবি তুলে নিলাম। নিয়াজী কোন আপত্তি করলেন না, বরং মনে হলো, ফটো সেশনে তিনি খুশিই হয়েছেন।

আমরা তাঁর বই নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। তাঁর বই যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে এতে তিনি খুশি। এরই ফাঁকে মহিউদ্দিন ভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার বই পড়ে ইতোমধ্যে আমরা সব জেনেছি। তবুও আমাদের মনে হলো ১৯৭১-এ পাকিস্তানী নায়ক হিসাবে আপনার সাক্ষাতকার নেয়াটা উচিত।’

‘অবশ্যই অবশ্যই’, বললেন নিয়াজী, ‘কোন্ ভাষায় বলব?’

‘উদু, ইংরেজী যে কোন ভাষায়ই বলতে পারেন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে আপনার সাধারণ ধারণার কথাটা বলবেন?’

‘পশ্চিম পাকিস্তানীদের কখনও বাস্তব সত্য জানানো হয়নি,’ শুরু করলেন নিয়াজী, ‘এর কারণ, জেনারেল টিক্কা যখন বিদেশী সাংবাদিকদের বের করে দিলেন তখন সবাই আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেল এবং সব বানোয়াট খবর ছাপতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা তখন যাচ্ছিল ভারত, তারা যা বলছিল তাই লুক্ষে নিচ্ছিল সাংবাদিকরা। ফলে প্রকৃত সত্য কখনও বেরিয়ে আসেনি। আমি দায়িত্বভার নিয়ে পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা করি। ভুট্টো আর ইয়াহিয়া চাচ্ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করতে আর পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করতে। ফলে খবর চাপা দিয়ে রাখার জন্য তাঁরাও চেষ্টা করছিলেন।’

‘জেনারেল, আপনি এখন এসব বলছেন, কারণ আপনার তা সুযোগ হয়েছে,’  
বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘আপনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন, ভাল কথা। কিন্তু তার আগে  
আপনার চিন্তা-ভাবনা কি ছিল? তখন কি সব জানতেন?’

‘না, জানতাম না,’ নিয়াজীর উত্তর। ‘তখন আমি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত  
ছিলাম। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে লক্ষ্য করি, ওখানকার মানুষ জন কিছুই জানে  
না, কিন্তু জানতে চায়। জানতে চায়, পাকিস্তান ভাঙল কারা? এ ভাঙনের নায়ক  
ভূট্টো, এ ভাঙনের নায়ক মুজিব। এ নির্মম, নিষ্ঠুর যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হলে বাইরের  
জগতের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না।’

‘এ বাইরের, বিদেশী কারা?’

‘আমেরিকা, ভারত, আফগানিস্তান ও ইসরাইল। এদের দ্বারা তারা প্রভাবিত  
হয়েছিল। শোনেন, আমার বইতেই আমি সব ফাঁস করে দিয়েছি। পাঁচ-ছয় বছর  
লেগেছে আমার গবেষণা করে সত্য খুঁজে বের করতে।’

‘আপনি বইয়ে লিখেছেন, বাঙালীরা ২৫ মার্চের আগে প্রচুর সামরিক অফিসার  
হত্যা করেছিল। এ তথ্য কোথায় পেলেন আপনি?’

‘কেন, এখানেই তা আছে,’ বলে নিয়াজী আমাকে একটি ইংরেজী প্রবন্ধের  
ফটোকপি ধরিয়ে দিলেন। প্রবন্ধটি পাকিস্তানের সমর্থক ব্রিটিশ গবেষক রাশ্বরিক  
উইলিয়ামসের লেখা। পাকিস্তান যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিল তাতে এ লেখাটি ছিল।

‘আমরা ঢাকায় ছিলাম, এ রকম একটা ঘটনা আমাদের বা বিদেশী সাংবাদিকদের  
চোখে পড়ল না, এ কেমন কথা।’ প্রশ্ন করি আমি।

‘ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে আমি বলি,’ বললেন নিয়াজী, ‘১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের  
সময় ত্রাণ কাজের জন্য গবর্নর আহসান কিছু হেলিকপ্টার চেয়েছিলেন। কিন্তু জিওসি  
জেনারেল ইয়াকুব তা দেননি। এ সহযোগিতা করা ছিল ইয়াকুবের নৈতিক কর্তব্য।  
পূর্ব পাকিস্তানীদের বিপদের দিনে তিনি তাদের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হলেন না।  
ফলে ব্যাপারটা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যায়।’

‘এরপর আসে নির্বাচন। সেই সময় ইয়াহিয়া ছিলেন সেনাপতি। তিনি ছিলেন  
স্বার্থপর ও লোভী। আইয়ুবকে তিনি ক্ষমতা থেকে সরিয়েছিলেন। মুজিবের সঙ্গেও  
একটা সমরোতায় পৌছেছিলেন।’ আমরা তাঁর বাক্যস্মৃতে কোন বাধা দিলাম না।  
আমি হঠাতে নিয়াজী সম্পর্কে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। খুব ডিপ্রেসিং  
লাগছিল। বার বার মনে হচ্ছিল, এ লোকটির পাশে কিভাবে বসে আছি? নিয়াজী বলে  
চলেছেন, ‘পশ্চিম পাকিস্তানে একটা আশঙ্কা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে একটি শিক্ষিত হিন্দু  
সম্প্রদায় আছে। তারা সরকার গঠনে একটা বড় রকমের ভূমিকা পালন করবে এবং  
তাহলে তারা সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবে।’

‘হিন্দুদের সংখ্যা তখন বাংলাদেশে কত ছিল?’ জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘প্রায় এক কোটি।’ জানালেন নিয়াজী, ‘তারা সবাই ছিলেন শিক্ষিত। সবাই কায়েম ছিলেন ভাল সরকারী পদে। এন্দের অনেকে ছিলেন শিক্ষক, অধ্যাপক। এ রকম অবস্থায় দেশের জন্য কোন শাসনতন্ত্র রচনা ও অনুমোদন করতে হিন্দুরা জোর প্রভাব ফেলবে। পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তত এ ধারণাই কাজ করেছে।’

‘আপনার ধারণাও কি তাই ছিল?’

‘না না, আমি একজন সৈনিক,’ বললেন নিয়াজী, ‘আমি ঐ সবের মধ্যে নেই। আমাদের কালে আমরা যে প্রশিক্ষণ পেয়েছি তা ছিল অন্যরকম। আমাদের বলা হতো, কি ঘটে না ঘটে তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তোমরা বিশ্বস্ত থাকবে তোমাদের দেশ ও শাসনতন্ত্রের প্রতি। সেই সময় আমরা অসামরিক লোকজন সম্পর্কে একটা শৃঙ্খলা মেনে চলতাম। কোন রাজনীতিবিদকে সেনানিবাসে প্রবেশের অনুমতি দিতাম না। যা-হোক, সেখানে ‘৭০-এর নির্বাচনে কারচুপি হয়।’

‘আপনি কিভাবে জানলেন?’ প্রশ্ন করেন মহিউদ্দিন ভাই।

১৯৭০-এর নির্বাচনে এই কারচুপির কথা আমাকে বলেছেন ফজলুল কাদের চৌধুরী, মোনেম খান, মৌলভী ফরিদ আহমদ ও বেশ কিছু লোক, যাঁরা ছিলেন পাকিস্তানপন্থী। তাঁরা বলেছিলেন, একটি মাত্র লোক এখানে সব কিছুর পরিকল্পনা করছে, তাকে খামান দরকার। সামরিক আইন প্রশাসক যদি এ অবস্থায় ঐ লোককে আসতে না দিত তাহলে আমরা ৫০/৬০টি আসনে জয়ী হতে পারি। ঐ সময় আমরা ৫০/৬০টি আসন পেলে শেখ মুজিবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত না। সকল বিষয়ে তিনি প্রভাব খাটাতেও পারতেন না।

তবে এখানে বলে রাখা ভাল, সব ক্ষেত্রে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে নন্দযোষ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। আপনাদের হয়ত মনে আছে ফজলুল কাদের চৌধুরী একজন মাননীয় ব্যক্তি। সবুর খান, মোনায়েম খান, ফরিদ আহমদ- এঁরা সবাই ছিলেন পাকিস্তানপন্থী, তাঁরা সবাই আমার কাছে আসতেন।’

‘তারপর?’

‘তা মুজিব জিতলেন,’ বললেন নিয়াজী, ‘কথা ছিল তিনি ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট করবেন। জিতে বললেন, তা হবে না। ইয়াহিয়ার চৈতন্যেদয় হলো। এদিকে ভুট্টো বললেন, তাঁকে দুই নম্বর করতে। মুজিব রাজি হলেন না। ভুট্টো মন্ত্রিসভাতে তাঁর দলের অংশ চাইলেন, মুজিব তাতেও রাজি না। ভুট্টো তখন ইয়াহিয়াকে বললেন, আমি আপনাকে প্রেসিডেন্ট করব। কিভাবে? জানতে চাইলেন ইয়াহিয়া। পশ্চিম পাকিস্তান তো আমাদের থাকবে। বললেন ভুট্টো, সেখানে আপনি হবেন প্রেসিডেন্ট আর আমি প্রধান মন্ত্রী। এসব কথাবার্তা বলে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে লারকানায় নিয়ে যান। সেখানেই তাঁরা একটি মতলব আঁটেন যেটিকে বলা হয় লারকানা পরিকল্পনা।

প্ল্যানটি ছিল, স্থলবর্তী হবার মতো কোন সরকার না রেখেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরে পড়া।'

'এ পরিকল্পনা আপনি জানলেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'বিষয়টি গোপনীয়।' জানালেন নিয়াজী, 'কাজী আজম নামে এক ডিএসপি ছিল। সিকিউরিটির লোকেরা তাকে লারকানায় পাঠায়। আজম লারকানায় গিয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করে। ঐ সময়ে ইয়াহিয়া শিকারের সময় নৌকায় বসে এ প্ল্যান আঁটেন। ঐ আলোচনাকালে সেখানে এক লোক ছিল। আমি কাজী আজমের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারি। কাজী আজম জেনেছিল ঐ লোকের কাছ থেকে। এ পরিকল্পনা জানাজানি হয়ে যায়, কাগজেও ছাপা হয়।'

'কোনু সময়?'

'ধরেন ফেরুয়ারির দিকে। আরেকটি দিক ছিল। এটি আবার রাজনীতিবিদদের ব্যাপার। আমি যদি জয়ী হই এবং একটি নিষ্পত্তি করে ফেলি তাহলে তো তাদের প্ল্যান সফল হবে না। এ রকম কিছু হলে তারা ঠিক করে ইয়াহিয়াকে দোষী করবে।'

'আপনি ছিলেন পূর্বাঞ্চলের কমান্ডের অধিনায়ক। আপনি জানতেন যে, লারকানায় একটা চক্রান্ত হয়েছে?'

'না, জানতাম না,' বললেন নিয়াজী, 'এখানে ফিরে বই লেখার সময় আমি সেটা জানতে পারি।'

'ঐ সময়ে পত্র-পত্রিকায় সে খবর ছাপা হলো আর আপনি আদৌ তা জানলেন না, এ কেমন কথা?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'তখন ইয়াহিয়া মারা গেছেন, ভুট্টোও ক্ষমতা হারিয়েছেন। আর সে সময় বহু লোকের কাছ থেকে বহু তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে। সে যা-ই হোক, তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। তাদের ধারণা ছিল, আমি পরাজিত হব, তাদের ফায়দা হবে। কারণ গেরিলাদের বিরুদ্ধে কেউ জয় লাভ করতে পারে না, অথচ আমি মাত্র দুই মাসে গেরিলাদের পরাজিত করেছিলাম। ইন্দোনেশিয়ায় আমি গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়েছি, মালয়েশিয়ায় চীনা গেরিলাদের বিরুদ্ধে।'

'আপনার বইতে এসব বিষয়ে লিখেছেন', বললেন মহিউদ্দিন ভাই, 'অপারেশন সার্চলাইটে মনে করা হয়েছিল যে, বিস্তোভ দমন হবে এবং রাজনৈতিক সঞ্চাটের সমাধান হবে। কিন্তু আপনি যদি দু'মাসের মধ্যে সব কাজই করে ফেললেন তা হলে সঞ্চাটের সমাধান হলো না কেন? কেন আপনারা সামরিক ব্যবস্থার মতো বিকল্প বেছে নিলেন?'

'সে কথা আমি বলেছি আপনাকে', জানালেন নিয়াজী, 'ইয়াহিয়া ও সাহেবজাদা ইয়াকুব একটা পরিকল্পনা করেছিলেন যার নাম ছিল অপারেশন ব্রিংজ।'

'কখন সেটা করা হয়?'

'নির্বাচনের অনেক আগে। ১৯৬৯-এর দিকে।'

‘জেনারেল ইয়াকুব সে বিষয়ে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেছেন পত্র-পত্রিকায়।’  
বললাম আমি।

‘আমি সেটা দেখেছি। তা অন্য প্রশ্ন।’ বললেন নিয়াজী, ‘আমার বইতে সে সব লিখেছি। মুজিব ও তাঁর সহযোগীরা যখন ধৰ্মসংস্থক কার্যকলাপ শুরু করলেন তখন ইয়াকুব নীরব ছিলেন। তাঁর উচিত ছিল অংকুরেই সব বিনাশ করে দেয়া। এই সময় তাঁর সে ক্ষমতাও ছিল কিন্তু ছিলেন তিনি নীরব।’

‘কখন তাঁর সেই ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল?’ মহিউদ্দিন ভাই প্রশ্ন করেন।

‘মার্চেই তাঁর এ্যাকশনে যাওয়া উচিত ছিল, ‘দৃঢ় স্বরে বললেন নিয়াজী, ‘তিনি তা করলেন না, বিলম্ব করলেন এবং পদত্যাগ করলেন। এভাবেই তিনি পাখি উড়ে যেতে দেন। এরপর টিক্কা পূর্ব পাকিস্তানে এলেন। তখন বাঙালীরা দাঙ্গা-হঙ্গামা করছে, উর্দুভাষীদের বিরুদ্ধে হঙ্গামা চলছে। ইয়াকুবের কারণে এগুলো ঘটে। টিক্কা আসার পর গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেলেন মুজিব ২৫ তারিখ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। তাই টিক্কা কঠোর এ্যাকশন নেন।’

এরপর প্রায় মিনিট পনেরো নিয়াজী একটানা কথা বলে চললেন, প্রথমে জানালেন, ‘টিক্কা বলেছিলেন তিনি মানুষ নয়, মাটি চান। ইয়াহিয়া এসব দেখে শুনে ভড়কে টিক্কা খানকে দশ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে বলা দরকার, কোন জেনারেলকে যদি অপারেশনের মধ্যে সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা তার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানার মতো। পরে আমাকে বাছাই করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যদিও আমি জুনিয়র ছিলাম। আমি এখানে এসে দেখি, প্রাদেশিক সরকার, সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ। হিন্দুরা সীমান্ত পারাপার করছে অবাধে।’ তারপর তিনি তাঁর রণবিন্যাসের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে বললেন, সাফল্য অর্জন করে তখন তিনি ভারত সীমান্তে। তখন ‘আমি প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদকে বললাম, আমাকে সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি দিন। কিন্তু তারা তো আসলে আমার পরাজয় দেখতে চেয়েছিল। ফলে আমার সাফল্যে তারা আঁতকে ওঠে। এটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। এর দু’দিন পর জেনারেল হামিদ এলেন। বললাম, আমাকে অনুমতি দিন। আমি কলকাতা দখল করে নেব। আমি ভারতীয় সেনাবাহিনী চুরমার করে আসাম, বঙ্গ ও বিহার জয় করে নেব। আমি কাশ্মীরেও চুক্তে যেতে পারতাম।’

যতই নিয়াজীর কথা শুনছিলাম ততই একটা বিষয় আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিলাম, কেন ইয়াহিয়ারা জুনিয়র জেনারেল নিয়াজীকে ঢাকা পাঠিয়েছিলেন। কারণ বাংলাদেশে তাঁরা যা ঘটাতে চেয়েছিলেন তার জন্য অপেক্ষাকৃত নির্বোধ জেনারেলের প্রয়োজন যাকে সুবিধামতো ছুঁড়ে ফেলা যাবে। নিয়াজী যখন তাঁর বীরত্বের কাহিনী শোনাচ্ছেন তখন ভৃত্য নাস্তা নিয়ে চুকল। নাস্তা না বলে মধ্যাহ্ন ভোজই বলা যেতে পারে। সঙ্গে একটি কেক। নিয়াজী বললেন, ‘আপনাদের জন্য বিশেষ চকোলেট কেকের ব্যবস্থাও করেছি।’

এসব দেখে আরও ডিপ্রেসড বোধ করছিলাম। মহিউদ্দিন ভাই বললেন, ‘কি খবর, আপনি চুপ করে গেলেন কেন? কিছু বলছেন না?’ বললাম, ‘ইচ্ছে করছে না।’

‘আমারও কি ইচ্ছে করছে,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘কাজ, আমাদের কাজ শেষ করতেই হবে।’ আমি এক কাপ কফি নিলাম। নিয়াজীর বড় মেয়ে বললেন, ‘আপনাদের ওখানে হিন্দুরা নাকি এখনও বেশ জাঁকিয়ে আছে?’ জবাব দিলাম না আমরা কেউ। তিনি বেশ ব্যাকুল হয়ে বললেন, ‘ভাই, আপনারা যার সাথে ইচ্ছা বস্তুত্ব করেন, রাশিয়া আমেরিকা যার সঙ্গে খুশি। খালি ভারতের সঙ্গে না।’

‘আপনি কি মুসলমান?’ ছোট মেয়ে জিজেস করলেন মহিউদ্দিন ভাইকে।

‘আমার নাম মহিউদ্দিন আহমেদ,’ গম্ভীর কষ্টে জানালেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘উনি?’ আমার দিকে ইশারা করে ছোট মেয়ে জানতে চাইলেন।

‘তাঁর নাম মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন।’

‘তিনি পাঠান?’

‘না, তিনি মুঘল,’ অত্যধিক গম্ভীর হয়ে জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, যেন বিষয়টা বেশ শুরুত্বপূর্ণ।

‘ও,’ একটু চুপসে গেলেন নিয়াজী কন্যা। তাঁরা পাঠান। মুঘলদের স্থান আভিজাত্যের দিক দিয়ে তাঁদের ওপর।

‘না, শোনেন বাঙালীদের আমরা ভাল জানি।’ নিয়াজীও ঘাড় নেড়ে কন্যার কথা সমর্থন করলেন, ‘তাঁরা সাক্ষা মুসলমান। আর প্রত্যেক হিন্দু একজন শিবাজী। আমার একজন বাঙালী কুক ছিল। বড় ভাল। একদিন বেশ রাতে কিছু মেহমান এলে তাকে খানা পাকাতে বলি। সে রেগে মাংস কাটার ছুরি নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসে। তাকে ছাড়িয়ে দিতে হয়।’

‘আপনাদের এখানে একটা বিষয় আমার খুব খারাপ লেগেছে।’ জানাই আমি।

‘কি?’ জানতে চাইলেন জ্যেষ্ঠ কন্যা।

‘যেখানে যাই’, বলি আমি, ‘সেখানেই দেখি কাজল আর পূজা ভাট বা অক্ষয় কুমারের পোষ্টার। ভিড়ও সব ইতিয়ান। গান সব ইতিয়ান। এত হিন্দু ইন্দুয়েন্স আপনাদের ওপর। ডিসগাসটিং।’

‘না, না, সেগুলোতো অন্য ব্যাপার’, সমস্তের বললেন দু’কন্যা।

‘আমি পাকিস্তানী গানও শুনি না,’ কফির কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন নিয়াজী, ‘আমি হিন্দী গানও শুনি না। আমি ইংরেজী গান শুনি।’

প্রায় হেসে ফেলেছিলাম আমরা দুইজন। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘যে অবস্থার কথা বললেন তাতো বেশ চমৎকার! ভিতরের অবস্থা কি ছিল? আপনারা কি দরকারমতো সৈন্য-রসদ আনতে পারছিলেন নাকি সিভিল আর্মড লোকদের বেশি ব্যবহার করছিলেন?’

‘কিছু লোককে তো আমরা কাজে লাগিয়েছি।’

‘আল শামস, আল-বদর নাকি আপনার সৃষ্টি?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘হ্যাঁ, এই প্রক্রিয়াটা আমিই শুরু করি মে মাস থেকে। ওরা সরাসরি আমার কমান্ডেই ছিল।’

‘এখন সুনির্দিষ্ট একটা প্রশ্ন করি,’ বলি আমি, ‘১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়, এর জন্য দায়ী কারা? রাও ফরমান দাবি করেছেন যে, এসবের কোন কিছুর সঙ্গে তিনি জড়িত নন।’

‘বুদ্ধিজীবীরা আমার কাছে কোন বিষয় নয়,’ বললেন নিয়াজী, ‘আমার মাথা ব্যথা অন্তর্ধারী দুশ্মনদের নিয়ে। তবে, আলতাফ গওহর বলেছেন যে, তিনি দু’টি নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য ফরমানের কাছে এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন। ফরমান সে অনুরোধ রক্ষা করে সেই তালিকা থেকে নাম দু’টি কেটে দেন।’

‘তাহলে রাও ফরমান ছিলেন এর পিছে?’

‘থাকতেও পারে।’

‘আপনি বলছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভাল মুসলমান,’ জিজ্ঞেস করি আমি, ‘তাই যদি হয় তাহলে ‘বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান’ বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? এই বিশ্বাসঘাতকতার অর্থ কি?’

‘না, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিশ্বাসঘাতক ছিল না,’ বললেন নিয়াজী, ‘ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও। এজন্য দায়ী তারা যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতায় ছিল, সব কিছুর ছিল কর্ণধার- ইয়াহিয়া ও ভুট্টো; পাকিস্তানের সাধারণ মানুষজন নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ এখনও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের লোকজনকে পছন্দ করে, ভালবাসে, বরং নাটের শুরু হলো ঐ সব লোভী মানুষ যারা তাদের ওপর শাসন চালাতে চেয়েছিল। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে দোষ দেব না।’

‘আচ্ছা, এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কত লোক মারা গেছে বলে আপনার ধারণা?’ জিজ্ঞেস করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

‘আমাদের পক্ষে আনুমানিক ত্রিশ হাজার’, বললেন নিয়াজী, ‘হিন্দুরা অনেকে পালিয়েছে, মারা গেছে আর মুক্তি বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি।’

‘অসামরিক লোকজনের ক্ষেত্রে?’

‘টিক্কা খান যে রাতে এ্যাকশনের আদেশ দেন সে রাতে পঞ্চাশ হাজার লোক মারা যায়।’

‘বাকি সময়ে?’ জানতে চান মহিউদ্দিন ভাই।

‘তেমন বেশি নয়।’ নিয়াজীর উত্তর।

‘আপনি কি জানেন আল শামস, আল-বদর, রাজাকাররাও বিপুল সংখ্যক লোক হত্যা করেছিল?’

‘না, আমার ৩৮ হাজারের মতো সৈন্য ছিল,’ বললেন নিয়াজী, ‘ওরা অকাতরে মারা পড়ছিল। তাই আমাকে মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ করতে হতো। আমি এসব আলবদর ও আল-শামসদের বিভিন্ন সেনা ডিভিশনে নিয়োগ করতাম। সেনা ডিভিশনগুলো তাদের কাজে লাগত-সেটি অন্য কথা। এসব আল-বদর ও আল শামস অনেকে দলচুট হয়ে পালিয়ে গিয়ে তখন এটা-ওটা করেছে। তাদেরকে একটা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়োগ করা হয়। তাদেরকে ব্যবহারও করা হয় সেভাবে। এখন ওরা যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে সেটা নিশ্চিত করে বলার জন্য সময় লাগবে। তাছাড়া ওদের হাতে তো অন্ত্রও দেয়া হয়েছিল। দেখুন, আমি আগে যা বলেছি—ইয়াকুব যদি কাজটা ঠিকঠাক করতেন, টিক্কা আসতেন না। সামরিক এ্যাকশনের দরকার হতো না, আমিও সেখানে যেতাম না। মুজিবকে যদি ক্ষমতা দেয়া হতো যে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে এত সব ঘটনা ঘটত না। তিনি নির্বাচনে জিতেছিলেন, তাঁকে ক্ষমতা না দেয়াটা অন্যায় হয়েছে। ভুট্টো সে ক্ষমতা দিতে চাননি, যা একজনের প্রাপ্য ছিল।’

‘আপনি আপনার বই উৎসর্গ করেছেন রাজাকারদের উদ্দেশে, আপনার সৈনিকদের নয় কেন?’ জিজ্ঞেস করি আমি।

‘আমাদের একটা কর্তব্য ছিল ওদের প্রতি আর ওরা এসেছিল স্বেচ্ছায়।’

‘জেনারেল, সবশেষে আপনাকে একটা প্রশ্ন,’ বললেন মহিউদ্দিন ভাই, ‘১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আপনার অনুভূতি কি ছিল? আপনিতো বলেন দিনটি ছিল হিন্দুদের কাছে আত্মসমর্পণের দিন।’

‘উহ, সেদিন তো আমার আত্মসমর্পণের দিন,’ খানিকটা বিমর্শ কঠে বললেন নিয়াজী, ‘ম্যায় খামুশ থা। কেয়া করু! দেখুন, সেনাবাহিনী কার্যত একটা ঘোড়ার মতো। ইয়াকুবের অধীনে আমাদের সেনাবাহিনীর কোন কিছু করার ছিল না। সেই একই সেনাবাহিনী টিক্কার অধীনে মানুষ মারতে শুরু করে দেয়। সেই একই সেনাবাহিনী পরে যুদ্ধ লড়েছে লড়েছে কার্যত ক্লান্ত, শ্রান্ত ঘোড়ার মতো। এর আচরণ ছিল তারই সওয়ারের মতো। সওয়ার যদি দক্ষ না হয় তাহলে ঘোড়া লাথি মারে। যদি সওয়ার সুদক্ষ অশ্঵ারোহী হয় তাহলে সে ঘোড়া ছোটে তীর বেগে। শিকারী কুকুর শিকারকে আমন্ত্রণ করে পথ দেখিয়ে তাঁকে খাঁচায় ঢোকাতে, ওতে এক রকমের অস্তুত মজা আছে। একই কথা বলা যায় শাহীন বা শিকারী বাজপাখির বেলায়। একই কথা সেনাবাহিনীর বেলাতেও। শিকারীর জানা উচিত কখন সে বাজকে মুক্ত করে দেবে তার মুঠো থেকে। কখন সে শিকারী কুকুরকে ছেড়ে দেবে শিকারের পিছনে ’ কথা বলতে বলতে আনমনা হয়ে গেলেন, বাক্যটি শেষ হলো না।